মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

মানবতার মুক্তি সনদ

মহাগ্রন্থ আল- কোরআন

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৭৬৪৭৯

মানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল- কোরআন
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী
অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল
পঞ্চম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০৮
প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজর, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৭৬৪৭৯
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ নাবিল কম্পিউটার, ৫৩/২ পাঁচ তলা,
সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ০০৮৮-০২-৮৩১৪৫৪১
প্রচ্ছদ ঃ কোবা কম্পিউটার এন্ড এ্যাডভারটাইজিং
৪৩৫/এ-২ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭
মুদ্রণ ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা-১১০০
শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ ১০০ টাকা মাত্র

Bishaw Manobotar Mukti Sonad Mohagrantha Al-Quran, Moulana Delawar Hossain Sayedee, Co-Operated by Moulana Rafeeq bin Sayedee , Copyist : Abdus Salam Mitul, Published by Global Publishing Network, Paridas Road, Banglabazar, Dhaka-1100, Fifth Edition : November 2008, Price : Hundred Taka Only, US Doller Three Only.

পূর্বকথা

মহাপবিত্র আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে ১৩৯৮ বছর অর্থাৎ প্রায় ১৪০০ শত বছর পূর্বে ৬১০ খৃষ্টাব্দে। এ মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হবার সময়কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গবেষক, চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে পবিত্র কোরআন নিয়ে কৌতুহলের শেষ তো হয়ইনি, বরং পবিত্র কোরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কূল-কিনারাহীন অগাধ জ্ঞান-সমুদ্রের সন্ধান পেয়ে অজানাকে জানার কৌতুহল ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাচ্ছে। সেই সাথে এ কথা এখানে উল্লেখ করাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কোরআন অবতীর্ণ হবার যুগ থেকে বর্তমান শতাব্দীর চলমান যুগ পর্যন্ত মহাগ্রন্থ আল কোরআন নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে যে গবেষণা ও বিশ্লেষণ হয়েছে, এ পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ নিয়ে এর শতভাগের একভাগও গবেষণা হয়নি এবং হবার মতো কোনো গ্রন্থের অস্তিত্বও এই পৃথিবীতে নেই। কোরআন নিয়ে গবেষণার সমাপ্তি নেই এবং পৃথিবী ও মানব সভ্যতার অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত গবেষণা চলতেই থাকবে ইন্শাআল্লাহ। আর মানুষ লাভ করতে থাকবে নিত্য নতুন তথ্য ও তত্ত্ব।

নবী করীম (সাঃ) বলেন, কোরআন কোনদিন পুরাতন বা জীর্ণ হবে না, এর আশ্চর্য ধরনের বিস্ময়কারিতা কখনো শেষ হবে না, কোরআন হচ্ছে হেদায়াতের মশাল এবং এই কিতাব জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এক কূল-কিনারাহীন অগাধ জলধী। এর ভেতরে রয়েছে অফুরন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও অনায়ত্ব অসংখ্য দিক-দিগন্ত। মানবীয় অনুসন্ধিৎসা অফুরন্ত এই জ্ঞান-ভান্ডার থেকে নিত্য-নতুন তত্ত্ব উদ্ধার করতে সক্ষম। প্রত্যেক অনুসন্ধানেই প্রতিটি যুগের সুক্ষ্ম চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ মানব জীবনের জন্য যুগোপযোগী আইন-বিধান ও তত্ত্ব উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন, যদি তাঁরা প্রতিটি পর্যায়ে অভ্রান্ত পথে দৃঢ় থাকেন। নবী করীম (সাঃ) বলেন, কোরআনের কতকাংশ অপর কতকাংশের তাফসীর করে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কিতাব এমন যে, এর দ্বারা তোমরা দেখবে, কথা বলবে ও শুনবে। এই কিতাবের কতকাংশ অপর কতকাংশের সাহায্যে কথা বলে, কতকাংশ অপর কতকাংশের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ এই কোরআন মহান আল্লাহর এক চিরন্তন ও শাশ্বত কিতাব।

আল্লাহর কোরআন শুধুমাত্র আইন-কানুন ও সংবিধানের একটি সঙ্কলন এবং সেই বাক্যশ্রেণীভুক্ত, যা বুঝার জন্য বিশেষ কোনো মানসিক প্রচেষ্টা অথবা চিন্তা-গবেষণার আদৌ প্রয়োজন নেই- এই ধারণা করা মারাত্মক ভুল। এই কোরআনের দ্বারা উপকৃত হতে হলে প্রাথমিক শর্ত হলো, বুকের ভেতরে এমন একটি সজাগ হৃদয় থাকতে হবে, যা যাবতীয় জ্ঞানের উৎস। আর জাগ্রত হৃদয় যদি নাও থাকে, অন্তত এমন শ্রবণ শক্তি থাকবে যে, পরিপূর্ণ একাগ্রতা সহকারে মনোযোগ দিয়ে কোরআনের কথাতে নিবিষ্ট হয়ে যায়, যাতে কোরআন যেন কর্ণকুহরের মাধ্যমে অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতে পারে।

যদি এগুলোর কোনটিই না থাকে, তাহলে এমন লোকের পক্ষে কোরআন থেকে উপকৃত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কোরআন উপলব্ধি করার জন্য এ দুটি বিষয়ের একটির উপস্থিতি অপরিহার্য। একটি হলো, মানুষের হৃদয়ের দুয়ার উন্মুক্ত থাকবে এবং জ্ঞান-দর্শনের আলো তার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত থাকবে। আর দ্বিতীয়টি হলো, নিজের শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে সে এ জন্য উন্মুক্ত করে দেবে এবং পরিপূর্ণ আগ্রহের সাথে তাকে স্বাগত জানাবে। যারা এ দুটো বিষয় থেকে বঞ্চিত তারা কোরআনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবনেও বঞ্চিত।

আমি আশা করি এই গ্রন্থটি আল্লাহর কোরআন অনুধাবনে অনুপ্রেরণা যোগাবে। এই গ্রন্থটি মূলতঃ আমার লেখা কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়, মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে কোরআন সম্পর্কে এ যাবৎ পর্যন্ত আমি যা কিছু বলেছি, তারই সমষ্টি মাত্র।

আরব সমাজের যে মানুষগুলো ছিল চোর-ডাকাত, তারা হয়ে গেল মানুষের সম্পদের আমানতদার। যারা ছিল নারীর সতীত্ব হরনকারী, তারা হয়ে গেল নারীর সতীত্বের প্রহরী। যারা মানুষকে শোষণ করতো, তারাই নিজেদের সঞ্চিত ধনরাশি উন্মুক্ত হস্তে বিতরণ করে দিতে লাগলো দরিদ্র জনসাধারণের জন্যে। তাদের আদর্শ, চরিত্র ও আমানতদারিতার আমূল পরিবর্তন যে পরশ পাথরের ছোঁয়ায় সাধিত হলো, যে দর্শন দিয়ে তিনি সেই অধঃপতিত সমাজকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাজে পরিণত করলেন তার নাম মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় আল-কোরআন। পবিত্র কোরআন হচ্ছে পরশ পাথর। মৃতপ্রায়- ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে নবজীবন দান করলো এ পবিত্র কোরআন। এ মহাগ্রন্থ আল কোরআন মরুচারী রাখালদের দিগ্বিজয়ী সেনাপতি বানিয়ে দিলো, বেদুঈনদের ন্যায় বিচারক শাসক বানিয়ে দিলো, উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে পরিণত করলো শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী জাতিতে।

বর্তমানে মুসলিম জনগোষ্ঠী কোরআন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। যে উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, উক্ত উদ্দেশ্যের বিষয়টিই সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রায় ভুলে গিয়েছে। সমগ্র বিশ্বে বর্তমানে মুসলমানরা অত্যাচারিত হচ্ছে। প্রায় সকল মুসলিম দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন। প্রতিদিন পাখির মত গুলী করে শহীদ করা হচ্ছে মুসলমানদেরকে। এসবই ঘটছে পবিত্র কোরআনের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক না থাকার কারণে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে পুনরায় পবিত্র কোরআনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করে দুনিয়া- আখিরাতে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

মহান আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী

সাঈদী

আরাফাত মঞ্জিল

৯১৪ শহীদবাগ, ঢাকা।

পৃষ্ঠা	আলোচিত বিষয়
৭	আল কোরআন পরিচিতি
৯	অবিশ্বাসীদের প্রতি পবিত্র কোরআনের চ্যালেঞ্জ
১৫	আল কোরআন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর বাণী
১৮	কোরআন নিজেকে আল্লাহর বাণী বলে কেন দাবী করে
২৯	কোরআন শয়তান কর্তৃক অবতীর্ণ হতে পারে না
৪১	কোরআন বিরোধিদের ওপরে কোরআনের প্রভাব
৪৯	কোরআন দুর্বোধ্য ভাষায় অবতীর্ণ হয়নি
৫১	কোরআন আল্লাহর কিতাব-বাস্তবতা কি প্রমাণ পেশ করে
৫৬	কোরআন অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য
৬৫	কোরআন পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হবার কারণ
৬৯	ওহীর সূচনা ও অবতীর্ণ হবার পদ্ধতি
৭৫	প্রথম ওহীর তাৎপর্য
৮৪	কোরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়
৮৭	কোরআনের সম্মান ও মর্যাদা
৯০	কোরআন অধ্যয়নে সতর্কতা অবলম্বন
৯২	কোরআন শ্রবণে সতর্কতা অবলম্বন
৯৪	কোরআন কোন অবস্থায় স্পর্শ করা যেতে পারে
৯৫	রাসূল কিভাবে কোরআন পাঠ করতেন
৯৭	রাতের নির্জন পরিবেশে কোরআন তিলাওয়াত
৯৯	কোরআন তিলাওয়াতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপকারিতা
১০১	রাসূল কর্তৃক কোরআনে পরিবর্তন ঘটেনি
১০৩	কোরআনের বিকৃত ঘটানো অসম্ভব

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِىْ فِىْ قَبْرِىْ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً، اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَانَسِيْتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِىْ حُجَّةً يَّارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ-

হে আল্লাহ! আমায় কবরে আমার একাকীত্বের ভয়াবহতার সময় তুমি আমাকে কোরআনের আলো দিয়ে প্রশান্তি দান করো। হে আল্লাহ! কোরআন দিয়ে তুমি আমার ওপর দয়া করো, কোরআনকে তুমি আমার জন্যে ইমাম, নূর, পথপ্রদর্শক ও রহমত বানিয়ে দিয়ো। হে আল্লাহ! আমি এর যা কিছু ভুলে গেছি তা তুমি আমায় মনে করিয়ে দিয়ো, যা কিছু আমি–আমার জ্ঞান থেকে হারিয়ে ফেলেছি তার জ্ঞান তুমি আমায় প্রদান করো, তুমি আমাকে দিবানিশি এর তিলাওয়াতের তাওফীক দিয়ো- হে সৃষ্টিকুলের মালিক!

আল কোরআন পরিচিতি

সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাবের নাম হলো আল কোরআনুল কারীম। এ কিতাব মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়েছে। এ জন্য এর নাম হলো কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব। এই কোরআনকে অবতীর্ণের সময় কাল থেকে পৃথিবী ধ্বংস হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের জন্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কোরআনের পূর্বেও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনুল কারীমে সেসব আসমানি কিতাবের নাম তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন প্রধান ফেরেশ্তা হযরত জিবরাইল (আঃ) মহান আল্লাহর আদেশে নবী করীম (সাঃ) এর ওপরে অবতীর্ণ করেছেন। এ কিতাবকে সহীহ্ শুদ্ধভাবে পড়ে শুনানো এবং এর প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের ওপরে দেয়া হয়েছিল। এ কিতাব পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর বাণী এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হলেন এ কিতাবের সঠিক ব্যাখ্যাতা। সারা পৃথিবীর মানব মন্ডলীর পৃথিবীতে শান্তি এবং আলমে আখিরাতে মুক্তি এই কোরআনের শিক্ষা অনুসরণের ওপরে পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এ কারণেই পবিত্র কোরআন যে কোন ধরনের মানুষের পক্ষে বুঝতে পারা সম্ভব। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ-

আমি এ কোরআন উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়েছি। এখন উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সূরা ক্বামার-৪০)

মানুষের জন্য এ কোরআন হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হলেও সবার পক্ষে এ কোরআন থেকে হেদায়েত লাভ করা সম্ভব নয়। হেদায়েত লাভ করতে হলে যেসব শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন, সেসব শর্ত যাঁদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, কেবল তাঁরাই এ কোরআন থেকে হেদায়েত লাভ করতে সক্ষম হবেন। এ কোরআন একদিনে বা একই সময়ে অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে প্রয়োজন অনুসারে, ঘটিতব্য বা সংঘটিত কারণে, সময়ের বিভিন্ন পর্যায়ে অল্প অল্প করে রাসূলের ওপরে অবতীর্ণ করেছেন।

পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হলেও তার বর্ণনাশৈলী, বাচনভঙ্গী পৃথিবীতে প্রচলিত আরবী ভাষার অনুরূপ নয়। এই কিতাবের ভাষা প্রচলিত আরবী ভাষা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কোরআনের ভাষা নির্ধারণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহর রাব্বুল আলামীন। এই কোরআনের ভাষা যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তেমনি কোরআন যে ভাব প্রকাশ করে, সে ভাবও এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকেই। এ কোরআন যাঁর ওপরে অবতীর্ণ হয়েছে নিঃসন্দেহে তিনি মানব জাতির বাইরের কেউ ছিলেন না। তিনিও মানুষ ছিলেন, তবে

পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ থেকে তিনি ছিলেন ভিন্ন। কোরআনের বাহক মানুষ ছিলেন এ কথা স্বয়ং আল্লাহ তাঁকেই বলতে বলেছেন–

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ–

বলো, আমিও তোমাদের অনুরূপ একজন মানুষ। (সূরা আল কাহ্ফ-১১০)

কোরআনের বাহক মানুষ ছিলেন বলে এর ভাষা ও বাচনভঙ্গী, বর্ণনাশৈলী, শব্দ চয়ন, ভাব মানুষের রচিত কোন কিতাবের মতো নয়–বরং তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও আগত। এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ মানব জাতিকে অবগত করেছেন–

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ–

এটা সেই কিতাব যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। (সূরা আল বাকারা-২)

অর্থাৎ এটা সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর কিতাব, এটা এমন একটি কিতাব, যে কিতাবে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টিকারী একটি বাক্যও সংযোজন করা হয়নি। পৃথিবীর চিন্তাবিদগণ, গবেষকগণ নানা ধরনের গ্রন্থ রচনা করে থাকেন। তাঁদের গবেষণালব্ধ বিষয় বস্তু গ্রন্থাকারে মানব জাতির সামনে প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু তাঁরা গ্রন্থাকারে যেসব তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সে সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে এ কথা বলতে সক্ষম নন যে, 'তাঁদের বিবৃত বিষয় সম্পূর্ণ সংশয় মুক্ত'।

কিন্তু পবিত্র কোরআন তার বিবৃত বিষয়, তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে সকল সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত বলে স্পষ্ট ঘোষণাই শুধু দেয়নি, এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। কারণ এই কোরআন যাঁর বাণী তিনি সব ধরনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও অতিন্দ্রীয় তথ্য, তত্ত্ব ও নির্ভুল জ্ঞানের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি যে কোন ধরনের দুর্বলতা, দোষ-ত্রুটি, অক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং তিনি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সে কিতাবে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

মানুষ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী। দুর্বলতা, ভ্রান্তি, অজ্ঞতা ও অক্ষমতার বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। মানুষ সন্দেহ আর সংশয়ের আবর্তে আবর্তিত হয় এবং এটা মানুষের স্বভাবজাত। এ কারণে মানুষের চিন্তার জগতে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে যদি কোন সংশয় সৃষ্টি হয়, এ সংশয় মানুষেরই অজ্ঞতা আর অক্ষমতার প্রত্যক্ষ ফসল। এর সাথে আল্লাহর কোরআনের ন্যূনতম কোন সম্পর্ক নেই। গগন চুম্বী বিশাল অট্টালিকার সামনে একজন মানুষ যদি তার হাত মুষ্টিবদ্ধ করে চোখের সামনে তুলে ধরে, তাহলে সে মানুষের দৃষ্টির সামনে থেকে আকাশ চুম্বী সেই শততলা অট্টালিকা আড়াল হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে অট্টালিকার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। অট্টালিকা বিদ্যমান, এটা অটল বাস্তবতা। দুর্বলতা পরিবেষ্টিত সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী মানুষ নিজের অক্ষমতার কারণে যদি কোরআনের সততা নিরূপণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার যাবতীয় ব্যর্থতা মানুষের ওপরেই আপতিত হয়, আল্লাহর কোরআনকে তা স্পর্শ করতে পারে না।

অবিশ্বাসীদের প্রতি পবিত্র কোরআনের চ্যালেঞ্জ

মহাপবিত্র আল কোরআন যে মানব রচিত কোনো গ্রন্থ নয়, এ সত্যের স্বীকৃতি বহু সংখ্যক অমুসলিম চিন্তাবিদগণ দিয়েছেন। পৃথিবী বিখ্যাত গ্রন্থ On Heroes and Hero worship এর রচয়িতা টমাস কার্ললাইল, Muhammad and Muhama danism গ্রন্থের রচয়িতা রেভারেন্ড আর বসওয়ার্থ স্মিথ, Decline and fall of the Roman Empire এর রচয়িতা ইতিহাসবেত্তা গিবন, The Lord Jesus in the Koran এর রচয়িতা জে, শিল্লিডি, ডি, ডি, The Hundred এর রচয়িতা ডঃ মাইকেল এইচ হার্ট, দার্শনিক জর্জ বার্নাড'শ, জন ডেভেন পোর্ট, এ, জে, আরবেরী, ফিলিপ হিট্টি, মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীসহ বহু সংখ্যক চিন্তানায়ক, গবেষক, ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পবিত্র কোরআনকে ঐশী গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি দিলেও অনেকের ভাগ্যেই মহাসত্য কবুল করার সৌভাগ্য হয়নি।

পবিত্র কোরআনের সম্মোহনী শক্তি, গবেষণা ও ব্যাখ্যা, শৈল্পিক চিত্র, কোরআনে বর্ণিত মনোজাগতিক চিত্র, মানবিক চিত্র, বিধানাবলী, সংঘটিত বিপর্যয়ের চিত্র, শান্তি ও শাস্তির দৃশ্যাবলী, কোরআনে অঙ্কিত কল্পনা ও রূপায়ণ, শৈল্পিক বিন্যাস, শৈল্পিক বিন্যাসের ধরন, এর সুর ও ছন্দ, বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিল, কোরআনে বর্ণিত চিত্রের উপাদান, বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, বিশাল কাহিনীর সংক্ষেপ ও বিস্তৃতি, উপসংহার ও পরিণতি বর্ণনা, কাহিনী বর্ণনায় শৈল্পিক সংমিশ্রণ, কাহিনীর শৈল্পিক রূপ ও বৈশিষ্ট্য, বর্ণনার বিভিন্নতা, কাহিনী বর্ণনায় আকস্মিকভাবে রহস্যের দ্বার উন্মোচন, দৃশ্যান্তরে বিরতি, ঘটনার মাধ্যমে দৃশ্যাঙ্কন, আবেগ অনুভূতির চিত্র, কাহিনীতে ব্যক্তিত্বের ছাপ, কোরআনের বর্ণনা রীতি, মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরীক্ষা, ১৯ সংখ্যার অকল্পনীয় রহস্য ইত্যাদি মুযিজা বিজ্ঞানী ও চিন্তানায়কদের বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়েছে। ফলে তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, 'এ মহাগ্রন্থ অবশ্যই মানব রচিত নয়'।

পৃথিবীতে যে কয়টি গ্রন্থকে 'ধর্মগ্রন্থ' হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়, এর একটি গ্রন্থও 'নিজেকে নির্ভুল, এ গ্রন্থের একটি শব্দের প্রতি সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, যদি সম্ভব হয় তাহলে পৃথিবীর সকলে সকল শক্তি প্রয়োগ করে এমন একটি গ্রন্থ বা এই গ্রন্থে বর্ণিত ছন্দের অনুরূপ একটি ছন্দ রচনা করো আনো।'

এ ধরণের দুঃসাহসিক ও অনতিক্রম্য চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র আল কোরআন। পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং যে দেশে ও পরিবেশে তা অবতীর্ণ হয়েছিলো, সে যুগে আরবী সাহিত্য ছন্দ ও অলঙ্কারিক দিক থেকে সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করছিলো। যাদের সম্মুখে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিলো তাদের মধ্যে আরবী ভাষাসহ অন্যান্য ভাষায় পন্ডিত ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরাও ছিলো। বর্তমানেও জন্মসূত্রে আরবী ভাষী এবং আরবে বসবাস করেন চৌদ্দ মিলিয়নের বেশী খৃষ্টান। আরবী ভাষী ইয়াহুদীদের

সংখ্যাও কম নয়। সেই আরবী ভাষাতেই প্রায় চৌদ্দ শত বছর পূর্বে পবিত্র কোরআন অবিশ্বাসীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ–

আমি আমার বান্দার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তার সত্যতা সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ হয় তাহলে যাও, তার মতো করে একটি সূরা তোমরাও রচনা করে নিয়ে এসো, এক আল্লাহ্ ব্যতিত তোমাদের আর যেসব বন্ধুবান্ধব আছে প্রয়োজনে তাদেরকেও সহযোগিতার জন্য ডাকো, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও। (সূরা বাকারা-২৩)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ، قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ–

তারা কি এ কথা বলে, এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ স.) এ গ্রন্থটি রচনা করে নিয়েছে, (হে নবী) আপনি এদেরকে বলুন, তোমরা তোমাদের দাবীতে যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তোমরাও এমনি ধরনের একটি সূরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ছাড়া আর যাদেরকে তোমরা ডাকতে চাও তাদেরকে ডেকে সাহায্য নাও। (সূরা ইউনুস- ৩৮)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ–

অথবা এরা কি এ কথা বলে, (মুহাম্মাদ স. নামের ব্যক্তি) কোরআন নিজে নিজে রচনা করে নিয়েছে! (হে নবী) আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা যদি তাই মনে করো তাহলে নিয়ে এসো এর অনুরূপ মাত্র দশটি স্বরচিত সূরা এবং আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য যাদের তোমরা সাহায্যের জন্য ডাকতে পারো তাদের ডেকে নাও, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও। (সূরা হূদ- ১৩)

فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ–

তারা নিজেদের কথায় যদি সত্যবাদী হয় তাহলে তারাও এ কোরআনের মতো কিছু একটা রচনা করে নিয়ে আসুক না! (সূরা তুর- ৩৪)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا–

(হে নবী) আপনি তাদেরকে বলে দিন, যদি সকল মানুষ ও জ্বিন এ কাজের জন্য একত্রিত হয় যে, তারা এ কোরআনের অনুরূপ কোনো কিছু বানিয়ে আনবে, তাতেও তারা এর মতো কিছু বানিয়ে আনতে পারবে না, যদিও এ ব্যাপারে তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয় তবুও নয়। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৮৮) মহান আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর সকল অবিশ্বাসীদের প্রতি পবিত্র কোরআন সম্পর্কে এ ধরণের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, কিন্তু বিগত চৌদ্দ শত বছরেও কারো পক্ষেই এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কোরআনের অনুরূপ ছোট্ট একটি সূরাও কোনো অবিশ্বাসীর পক্ষে বানানো সম্ভব হয়নি। পৃথিবীতে যে কয়টি গ্রন্থ ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে বরিত হয়েছে আসছে, কেউ ইচ্ছে করলে উক্ত গ্রন্থসমূহ দেখতে পারেন, কোনো একটি গ্রন্থেও এ ধরণের কোনো চ্যালেঞ্জ নেই।

প্রশ্ন হলো, কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসী অসংখ্য আরবী ভাষী সাধারণ মানুষ এবং অসাধারণ মানুষ তথা পন্ডিতবর্গ থাকার পরও কেনো তারা পবিত্র কোরআনের ছুড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি?

এ প্রশ্নের জবাবও মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমেই দিয়েছেন–

وَ مَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ–

এ কোরআন এমন কোনো গ্রন্থ নয় যে, আল্লাহর ওহী ব্যতিরেকে কারো ইচ্ছামাফিক বানিয়ে নেয়া যাবে। (সূরা ইউনুস- ৩৭)

আল্লাহ তা'য়ালা বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন, তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী ব্যতিত এ ধরণের কোরআন বানানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ এ পবিত্র কোরআন নবী করীম (সাঃ) রচনা করেননি এবং কোনো মানুষের পক্ষেই তা রচনা করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের শিক্ষার জন্য যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, তা অতীতের বা বর্তমানের কোনো ইতিহাস গবেষকই ভুল প্রমাণ করতে পারেননি। নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্র মুখ উচ্চারিত এসব ঐতিহাসিক ঘটনা যাদের সম্মুখে উচ্চারিত হয়েছিলো, তাদের মধ্যেও বহু সংখ্যক ঐতিহাসিক উপস্থিত ছিলেন, যাঁরা হাজার বছর বা কয়েক শতাব্দী পূর্বের বর্ণিত ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। কোরআন বর্ণিত ইতিহাস শুনে তাঁরা সামান্যতম আপত্তিও করেননি। বর্তমানে অজানাকে জানার জন্য পৃথিবীর ভূগর্ভ, স্থল ভাগ, জল ভাগ ও মহাশূন্যের বিভিন্ন স্থানে ছুটে বেড়াচ্ছেন, তাঁদেরও কেউ কোরআন বর্ণিত ইতিহাস সম্পর্কে আপত্তি তোলার সাহস দেখাচ্ছেন না।

একমাত্র কোরআন ব্যতিত পৃথিবীর কোনো একটি ধর্মগ্রন্থেও 'গ্রন্থটি' সত্য বা মিথ্যা– তা প্রমাণের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোনো একটি ধর্মগ্রন্থে মূলনীতি হিসেবে বর্ণনা করা হলো, 'মাংসভোজী কোনো প্রাণী কখনো তৃণভোজী হবে না।' অর্থাৎ নিয়মটি অপরিবর্তনীয়। এখন কোনো মানুষ দীর্ঘ প্রচেষ্টায় মাংসভোজী প্রাণীকে তৃণভোজী বানালো। অথবা হঠাৎ করেই কিছু সংখ্যক মাংষাশী প্রাণী তৃণভোজী হয়ে উঠলো।

অবস্থা যদি এ রকম হয়ই, তাহলে উক্ত ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে সন্দেহের দানা বেঁধে উঠবে। অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ অপরিবর্তনীয় মূলনীতি হিসেবে যা কিছু বর্ণনা করছে বাস্তবে ঘটছে তার বিপরীত। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি মানব জাতির জন্য যে জীবন বিধান পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, তার মধ্যে সামান্যতম কোনো বৈপরীত্য নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন–

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا–

এরা কি কোরআন (ও তার সূত্র নিয়ে চিন্তা) গবেষণা করেনা? এ গ্রন্থটি যদি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে তাতে অবশ্যই তারা অনেক গড়মিল দেখতে পেতো। (সূরা আননিসা-৮২)

অনেক গড়মিল দূরে থাক, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গড়মিলও পবিত্র কোরআনে নেই এবং এ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে গত চৌদ্দশত বছর পূর্বে। কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি সামান্য গড়মিল বের করা। এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, 'গ্রন্থটি সত্য বা মিথ্যা' প্রমাণ করার ব্যবস্থা এক মাত্র কোরআন ব্যতিত কোনো গ্রন্থেই রাখা হয়নি।

কোরআন বিদ্বেষী কোনো গবেষক, চিন্তাবিদ বা বিজ্ঞানীও কোরআন বর্ণিত বৈজ্ঞানিক সূত্র অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছেন না। কারণ তিনি প্রকৃত সত্য অস্বীকার করলে অন্য কোনো বিজ্ঞানী তা গবেষণার মাধ্যমে সত্য বলে মত প্রকাশ করবেন। 'কোরআন' শব্দের অর্থ যা বার বার পড়তে হয়, পবিত্র কোরআনে 'কোরআন' শব্দটি ৬৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে। 'কোরআন' সার্থক এক নাম এবং এ নামকরণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কোরআনের তুলনায় পঠিত হয়েছে বা পাঠ করা হয় এমন গ্রন্থ সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় আরেকটি নেই। সমগ্র পৃথিবীতে এমন একটি মুহূর্তও অতিবাহিত হয় না, যে মুহূর্তে কোথাও না কোথাও কোরআন পাঠ করা হচ্ছে না। এ মহাগ্রন্থের আরেক নাম 'কিতাব' যার অর্থ লিখিত গ্রন্থ। এটিও পবিত্র কোরআনের আরেকটি সার্থক নাম এবং এ নামকরণও করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। গোটা বিশ্বে কোরআনের তুলনায় লিখা হয়েছে বা ছাপা হয়েছে এমন কোনো গ্রন্থের নাম কেউই উচ্চারণ করতে পারবে না। এ মহাগ্রন্থের আরো কয়েকটি নাম রয়েছে এবং এসব নামকরণও করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

পবিত্র কোরআনে কোনে বৈপরীত্য নেই, নেই কোনো দুর্বল সূত্র। জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখা এ কোরআনে প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। দুর্বল বা মহাকালের আবর্তন-বিবর্তনে পরিবর্তনীয় কোনো জ্ঞানসূত্রও এ কিতাবে বর্ণিত হয়নি। মানুষের সকল

প্রয়োজনে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা অকাট্য, অখন্ডনীয়, অপরিবর্তনীয়, মানব স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল, বিশ্ব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল, পালনে ও অনুসরণে সহজ সাধ্য, যুক্তিগ্রাহ্য ও অভ্রান্ত। পবিত্র কোরআন অবতীর্ণের কাল থেকে বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এ কথা চর্চা, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে, কোরআন যা কিছু বর্ণনা করেছে তাই অকাট্য সত্য, অভ্রান্ত এবং এ কোরআনই কেবল মাত্র অপরিবর্তনীয় ও অভ্রান্ত জ্ঞানের উৎস।

মানুষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে পবিত্র কোরআনের আয়াত সংখ্যা, রুকুর সংখ্যা, পারার সংখ্যা, সূরার সংখ্যা, অক্ষরের সংখ্যা, শব্দ সংখ্যা, বাক্য সংখ্যা কত ইত্যাদি। এ সকল কিছু কম্পিউটারে প্রবেশ করিয়ে কম্পিউটারকে প্রশ্ন করা হয়েছে এটা মানুষের বানানো কি না? মানুষের পক্ষে কি এটা তৈরি করা সম্ভব? কম্পিউটার উত্তর দিয়েছে, সংখ্যা তথ্যের দিক হতে ভারসাম্যপূর্ণ এমন কিতাব মানুষের দ্বারা তৈরি করা সম্ভব নয়।

সুতরাং পবিত্র কোরআন হলো মানুষের বেঁচে থাকার দলিল। এ কোরআন যেন নকল না হতে পারে সে জন্য কোরআনে কারীমকে মানুষের স্মৃতিশক্তির মধ্যে হেফাজত করার ব্যবস্থা করেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। পৃথিবীর মানুষ যাকিছু রেকর্ড করে রাখে, তার উপর যদি অন্য কিছু রেকর্ড করে তাহলে পূর্বের রেকর্ড করা সবকিছু মুছে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের স্মৃতির ভেতরে এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যাতে দুনিয়ার সকল কিছু যদি মুখস্থ করে রেকর্ড করে রাখা হয় তাহলে পূর্বেরটা মুছবে না।

এ পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ আছে, যেমন হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদ। সমগ্র পৃথিবীতে বেদের একজন হাফেজ পাওয়া যাবে না। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, তাদের মধ্যে বাইবেলের একজন হাফেজ খুঁজে পাওয়া যাবে না। পবিত্র কোরআন ব্যতিত এমন কোনো গ্রন্থ নেই, যে গ্রন্থের একজন হাফেজও খুঁজে পাওয়া যাবে। পবিত্র কোরআনুল কারীম মুখস্থ করার ও বুঝার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা সহজ করেছেন। পবিত্র কোরনানে বলা হচ্ছে-

اَلرَّحْمٰنُ، عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ-

পরম করুণাময় আল্লাহ এই কোরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন। (আর্ রাহমান-১ - ৪)

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ-

আমি আমার বাণী পৌছানোর জন্য যখনই কোন রাসূল প্রেরণ করেছি, সে নিজ জাতির জনগণের ভাষায়ই পয়গাম পৌছিয়েছে, যেন তিনি তাদেরকে অত্যন্ত ভালোভাবে স্পষ্টরূপে বুঝাতে সক্ষম হয়। (সূরা ইবরাহীম-৪)

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ

وَتُنْذِرَبِهٖ قَوْمًالُّدًّا-

হে রাসূল! এ বাণীকে আমি সহজ করে আপনার ভাষায় এ জন্য অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি মুত্তাকিদেরকে সুসংবাদ দিতে ও সীমালংঘনকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। (সূরা মারিয়াম)

কোরআনের বক্তব্যে বিন্দুমাত্র দুর্বোধ্যতা নেই। এ কিতাব যা বলে তা অত্যন্ত সহজ সরল ও স্পষ্টভাবে বলে দেয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ، اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّالَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ-

এটা সেই কিতাবের আয়াত, যা নিজের বক্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। আমি একে কোরআন রূপে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। (সূরা ইউসুফ-১-২)

وَكَذَالِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًاعَرَبِيًّاوَّصَرَّفْنَافِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ-

হে রাসুল! এভাবে আমি একে আরবী কোরআন বানিয়ে অবতীর্ণ করেছি এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সতর্কবাণী করেছি। (সূরা ত্বা-হা-১১৩)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ، قُرْاٰنًاعَرَبِيًّاغَيْرَذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ-

এ কোরআনের ভেতরে আমি মানুষের জন্য নানা ধরনের উপমা পেশ করেছি যেন তারা সাবধান হয়ে যায়, আরবী ভাষার কোরআন-যাতে কোন বক্রতা নেই। যাতে তারা নিকৃষ্ট পরিণাম থেকে রক্ষা পায়। (সূরা যুমার-২৭-২৮)

এ কিতাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট, এর ভেতরে না বুঝার মতো কোন জটিল বিষয়ের অবতারণা করা হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ، بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا، فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُوْنَ-

এটা পরম দাতা ও মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা জিনিস। এটি এমন এক গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরবী ভাষার কোরআন। সেসব

লোকদের জন্য যারা জ্ঞানের অধিকারী, সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী। (সূরা হামীম সাজদাহ-২-৪)

وَلَوْجَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلاَ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ءَ اَعْجَمِىٌّ وَّعَرَبِىٌّ-

আমি যদি একে অনারব কোরআন বানিয়ে প্রেরণ করতাম তাহলে এসব লোক বলতো, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি কেন? কি আশ্চর্য কথা, অনারব বাণীর শ্রোতা আরবী ভাষাভাষী! (সূরা হা-মীম-সাজদাহ-৪৪)

আল কোরআন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর বাণী

মানব জাতির সর্বকালের এবং সর্বযুগের জন্য যে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা কোন মানুষের রচনা করা কিতাব নয়। পবিত্র কোরআন যে যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল, তদানীন্তন যুগের বিভ্রান্ত লোকজন বলতো, 'এ কিতাব মানুষের রচিত।' এ ধরনের কথা প্রতিটি যুগেই বিভ্রান্ত লোকজন বলে থাকে। কোরআন অবতীর্ণের যুগে যারা ধারণা করতো যে, এটা মানুষের রচনা করা কিতাব-তাহলে যারা এ ধরনের ধারণা পোষণ করছে, তারাও মানব জাতির বাইরের কেউ নয়। তারাও তো মানুষ। সুতরাং মানুষ হিসেবে তারাও এ ধরনের কোরআন রচনা করতে সক্ষম, অতএব কোরআনের একটি সূরার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে তারা প্রমাণ করে দিক যে, নবী করীম (সাঃ) যে কোরআন আল্লাহর বাণী বলে দাবি করছেন, তা আল্লাহর বাণী নয়-বরং তা মানুষের রচনা করা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবিশ্বাসীদের লক্ষ্য করে বলেন, তোমাদের মনে যদি এ ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, এ কোরআন 'মানুষের কথা' তাহলে তো জ্ঞানী, বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ, পন্ডিত বলে দাবিদার সব মানুষেরই এ ধরনের কথা বলার ক্ষমতা থাকা উচিত যে, 'আমি এই কিতাব রচনা করেছি।' অথচ এ ধরনের কোন ক্ষমতা তোমাদের মধ্যে কারো নেই। তবুও তোমরা আমার কিতাবের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করছো। তোমাদের দাবি তো তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যখন তোমরা তোমাদের দাবির অনুকূলে আমার কিতাবের ন্যায় একটি কিতাব রচনা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু আমি উপর্যুপরি চ্যালেঞ্জ দিয়েছি, গোটা মানব মন্ডলী মিলিত হয়েও এমন ধরনের একটি কিতাব রচনা করতে অক্ষম। সুতরাং নিজেদের অক্ষমতার প্রতি স্বীকৃতি দিয়ে প্রকৃত সত্য গ্রহণ করে আমার প্রেরিত কিতাবের প্রতি অনুগত হয়ে যাও-এতেই তোমার জীবনের সার্বিক উন্নতি ও মুক্তি নির্ভরশীল।

কোরআন যাঁর বাণী সেই আল্লাহ বলেন, তোমরা যারা আমার দাসত্ব পরিত্যাগ পূর্বক নানা ধরনের অসার বস্তুকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছো। অথচ প্রভু হওয়ার যাবতীয় যোগ্যতা কেবল মাত্র আমারই রয়েছে। তোমরা যাদেরকে প্রভু মনে করে দাসত্ব করছো, তোমাদের

সেসব প্রভুদেরকে বলো, কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুক। কিন্তু তারা তোমাদেরকে কোন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আর এ থেকেই তো তোমাদের অনুভব করা উচিত যে, তোমাদের কোন দাবীর অনুকূলে যখন তারা এগিয়ে আসতে সক্ষম নয়, তখন তারা দাসত্ব লাভের যোগ্য হতে পারে না। দাসত্ব লাভের একমাত্র যোগ্য তো তিনিই–যিনি অনুগ্রহ করে তোমাদেরকে সত্য সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য কোরআনের মতো একটি অতুলনীয় কিতাব প্রেরণ করেছেন।

কোন কোন মানুষ এ ধারণা পোষণ করে যে কোরআনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা যে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন, সে চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র পবিত্র কোরআনের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য, সাহিত্যিক মান ও সৌন্দর্য এবং উচ্চাঙ্গের ভাষার ব্যাপারে প্রযোজ্য। এ ধরনের ভুল ধারণা যারা পোষণ করে, তারা মূলতঃ কোরআনের গভীরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারায় আবর্তিত হয়। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কোরআনের মর্যাদা এসব ক্ষুদ্র চিন্তা-চেতনা থেকে অনেক উর্ধ্বে। কোরআনের শব্দ, ভাষা এবং সাহিত্যিক মান, বর্ণনাশৈলীর দিক দিয়ে যে অনবদ্য, অতুলনীয় এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে যে কারণে এ কথা বলা হয়েছে যে, 'মানবীয় চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এ ধরনের কিতাব রচনা করা সম্ভব নয়' সে কারণগুলো পবিত্র কোরআনে আলোচিত বিষয়াদি, কোরআন কর্তৃক উপস্থাপিত জীবনাদর্শ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য ও তত্ত্বসমূহ। কোরআন যেসব বিষয়ে আলোচনা করেছে, যে শিক্ষা মানব জাতির সম্মুখে পেশ করেছে, যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার মানব সভ্যতার সামনে উন্মোচন করেছে, যে আদর্শের দিকে মানব জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছে, তা মানবীয় মন-মস্তিষ্ক কল্পনাও করতে পারে না।

শুধু মানব জাতিই নয়–জ্বিন ও মানব জাতি সম্মিলিতভাবে কিয়ামত পর্যন্তও চেষ্টা-সাধনা করতে থাকে তবুও কোরআনের অনুরূপ কোন কিতাব রচনা করতে সক্ষম হবে না। পবিত্র কোরআন যাঁর ওপরে অবতীর্ণ হলো, তিনি হঠাৎ করে আকাশ থেকে অবতরণ করে এ দাবী করেননি যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব নিয়ে এসেছি। বরং সেই পূত ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব জীবনের চল্লিশটি বছর সেই লোকগুলোর মাঝেই অতিবাহিত করেছেন, যে লোকগুলো এ অপবাদ দিচ্ছে যে, 'কোরআন তাঁর নিজের রচনা করা।' যারা এ অপবাদ দিচ্ছে, তারাও এ কথা ভালো করে জানতো, এই ব্যক্তির পক্ষে এমন ধরনের কোন কিতাব রচনা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয় এবং এই ব্যক্তির পক্ষে সামান্যতম মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। তবুও তারা যখন এই অপবাদের কালিমা আল্লাহর রাসূলের ওপরে লেপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করলো, তখন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে বলতে বললেন–

قُلْ لَّوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرٰكُمْ بِهٖ فَقَدْ

لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ-اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ-

হে রাসূল! আপনি ওদেরকে জানিয়ে দিন, আমি তোমাদেরকে এ কোরআন শুনাবো এটা যদি আল্লাহ্ না চাইতেন, তাহলে আমি কোন ক্রমেই তা তোমাদেরকে শুনাতে সক্ষম হতাম না এমনকি এই কোরআন সম্পর্কে কোন সংবাদও তোমাদেরকে জানাতে পারতাম না। আমি তো তোমাদের মধ্যেই আমার জীবনের সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করে আসছি। তোমরা কি এ বিষয়টিও অনুভব করতে সক্ষম হচ্ছো না?

যারা এ অপবাদ আরোপ করছিল যে, নিজের রচনা করা কিতাব তিনি আল্লাহর বাণী বলে চালিয়ে দিচ্ছেন, তাদেরকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেন, আমি যদি আমার রাসূলের ওপরে এ কোরআন অবতীর্ণ না করতাম তাহলে তিনি তোমাদেরকে এ কোরআন শুনাতে পারতেন না এমনকি এ কোরআন সম্পর্কে কোন সংবাদও তোমাদেরকে জানাতে পারতেন না। আমি না জানালে তিনি যে কোরআন শুনাতে সক্ষম হতেন না, এ কথা তোমাদের চেয়ে আর বেশী ভালো কে জানে? কেননা, তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কাল তোমাদের মাঝেই অতিবাহিত হয়েছে। যে ব্যক্তি তার জীবনের সুদীর্ঘকাল তোমাদের মাঝে অতিবাহিত করলো, সে ব্যক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে তোমরা তো পরিপূর্ণভাবে অবগত রয়েছো।

আমি যাঁর ওপরে আমার কোরআন অবতীর্ণ করেছি, সেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অদৃশ্য জগৎ থেকে হঠাৎ করে তোমাদের মাঝে আবির্ভূত হননি বা তিনি তোমাদের কাছে কোন অপরিচিত ব্যক্তিত্ব নন। তিনি যখন তোমাদেরকে শুনালেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে নবী নির্বাচিত করা হয়েছে, তার ক্ষণপূর্বেও কি তোমরা তোমাদের এই সুপরিচিত ব্যক্তিত্বের মুখে কোরআনের কোন আয়াত বা আলোচিত বিষয়বস্তু, কোরআন পরিবেশিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বক্তব্য শুনেছিলে? নিশ্চয়ই তোমরা তা ইতোপূর্বে তাঁর মুখ থেকে শোননি।

তাহলে কি তোমাদের মনে এ প্রশ্ন জাগে না, দীর্ঘকালের পরিচিত এই লোকটির মুখ থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত যে কালাম আমরা শুনছি, তা কোন মানুষের রচনা নয়? ক্ষণিকের মধ্যে এই লোকটির মধ্যে কিভাবে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হলো? এতকাল এই লোকটি যে ভাষায় ও ভঙ্গীতে কথা বলে এলো, সে ভাষা ও ভঙ্গীতে কোন অতিন্দ্রীয় শক্তির স্পর্শে পরিবর্তন ঘটলো? সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোকটির মুখ থেকে কিভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য সমৃদ্ধ কথা নির্গত হলো? এসব বিষয়ে কি তোমাদের মনে কোন প্রশ্ন সৃষ্টি হয় না?

এসব দিক চিন্তা করলেই তো তোমরা অনুভব করতে সক্ষম হবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কালাম তোমাদেরকে শুনাচ্ছেন, তা তাঁর নিজের রচনা করা নয়—বরং তা আল্লাহর কালাম। আমি যাঁর প্রতি আমার কোরআন অবতীর্ণ করেছি, তিনি

এমন নন যে, আমার কালাম তোমাদেরকে শুনিয়ে দিয়ে তিনি অন্য কোথাও চলে যান। বরং আমার কালাম তোমাদের সামনে পেশ করার পর তিনি তোমাদের মাঝেই পূর্বের ন্যায় বসবাস করতে থাকেন। তোমাদের সাথে আত্মীয়তা ও সামাজিকতা যেভাবে ইতোপূর্বে রক্ষা করতেন, এখনও তাই করছেন। তিনি কোন ভাষায় কথা বলেন, তাঁর বাচন ভঙ্গী কি ধরনের তা তোমরা সুদীর্ঘকাল শুনেছো এবং এখনও শুনছো। আবার তিনি আল্লাহর কালাম হিসেবে যা তোমাদেরকে শুনাচ্ছেন, তার ভাব ও ভাষা, বাচন ভঙ্গী, বর্ণনাশৈলী, প্রকাশ রীতি, শব্দ চয়ন এমন নতুন ধরনের যে, যা ইতোপূর্বে তোমরা কেউ শোননি। এই পার্থক্য নিশ্চয়ই তোমরা অনুভব করে থাকো। সুতরাং তোমরা তোমাদের অনুভূতি শক্তির মাধ্যমেই অনায়াসে বুঝতে পারবে যে, এটা আল্লাহর কালাম।

মহান আল্লাহর এই যুক্তি শুধুমাত্র সেই যুগের জন্যই প্রযোজ্য ছিল না, বরং আল্লাহর এসব যুক্তি অতীতকালে যেমন প্রযোজ্য ছিল, বর্তমান কালেও তেমনিভাবে প্রযোজ্য এবং অনাগত কালেও প্রযোজ্য হবে। আরবী ভাষা সম্পর্কে যারা প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেছে, তাদের সামনে যদি কোরআনের আয়াত ও হাদীস পেশ করা হয়, তারাও একবার মাত্র পাঠ করেই আল্লাহর বাণী এবং রাসূলের কথার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা অঙ্কন করতে সক্ষম হবেন। সুতরাং পবিত্র কোরআন যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব এবং এটা যে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর বাণী, এ কথার সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহর কোরআন। এই কিতাব এমন ধরনের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত যে, এই বৈশিষ্ট্যই মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে।

কোরআন নিজেকে আল্লাহর বাণী বলে কেন দাবী করে

নবীদের সমসাময়িক যুগের অবস্থা সম্পর্কিত ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, সেসব যুগে মানুষ যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও পারদর্শিতা অর্জন করেছিল, আল্লাহ তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলকে সে বিষয়ে যুগের সমস্ত মানুষের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মুসাকে যখন প্রেরণ করা হয়েছিল, তখন মানুষ যাদুবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। তারা যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে অস্বাভাবিক একটা কিছু প্রদর্শন করতে সক্ষম হতো। আল্লাহ তাঁর হযরত মুসা (আঃ) কে এমন ক্ষমতা দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন যে, তদানীন্তন যুগের শ্রেষ্ট যাদুকরদের যাবতীয় ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে প্রদত্ত ক্ষমতা ও শক্তির সামনে পানির বুদ্বুদের মতই মিলিয়ে গেল।

সাধারণ মানুষ অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করলো, যাদুকরবৃন্দ দীর্ঘ সাধনার ফলে যে শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করেছিল, তা মুহূর্তের ভেতরে হযরত মুসা (আঃ) এর শক্তি ও ক্ষমতার সামনে ম্লান হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, তারা এটাও স্পষ্ট অনুভব করলো যে, যাদুকরদের প্রদর্শনীমূলক ক্রিয়াকর্ম স্পষ্টতই যাদু–যা যে কোন ব্যক্তি সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে

সক্ষম হবে। আর হযরত মূসা (আঃ) যা প্রদর্শন করছেন, তা যাদু নয় এবং এ ক্ষমতা সাধনা করে অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং এ ক্ষমতা তিনিই দান করেছেন, যিনি এ আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং পালনকর্তা।

হযরত ঈসা (আঃ) কে যখন পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল, তখন মানুষ চিকিৎসা শাস্ত্রে এতটা উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিল যে, তারা দুরারোগ্য ব্যাধি চিকিৎসার মাধ্যমে উপশম করতে সক্ষম হতো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ঈসাকে সে যুগের সমস্ত মানুষের ওপরে যোগ্যতা, ক্ষমতা ও জ্ঞানের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। তিনি জন্মান্ধের চোখে হাত স্পর্শ করতেন আর জন্মান্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করতো। সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে হযরত ঈসার ক্ষমতা অবলোকন করতে বাধ্য হতো। সাধারণ জনগণ চিকিৎসকদের ক্ষমতা আর হযরত ঈসার ক্ষমতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হতো যে, চিকিৎসকগণ যে ক্ষমতা প্রয়োগ করছে, তা তাদের সাধনা লব্ধ ক্ষমতা। আর হযরত ঈসা (আঃ) যে ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন, তা সাধনালব্ধ কোন ক্ষমতা নয়–এ ক্ষমতা তিনিই দান করেছেন, যিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক।

নবী করীম (সাঃ) কে আল্লাহ সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য শেষনবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী-রাসূল আসবে না। তাঁকে যে যুগে এবং যেখানে প্রেরণ করা হয়েছিল, ইতিহাস সাক্ষী–সেখানের মানুষ ভাষা ও সাহিত্যে এতটা পারদর্শিতা অর্জন করেছিল যে তারা পরস্পরে সাধারণভাবে যেসব কথা বলতো, সে কথাগুলোও কাব্যাকারে বলতো। তাদের কথা ও রচিত পংক্তিমালার ভেতরে উচ্চমানের সাহিত্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল।

বর্তমান বিজ্ঞানের হিরন্ময় কিরণে উদ্ভাসিত পৃথিবীর সভ্যতাগর্বী মানুষ সে যুগের মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই তাদের প্রতি 'বর্বর, মূর্খ' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করে থাকে। অথচ তাদের রচিত কাব্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বর্তমানের ভাষাবিদগণ স্তব্ধ হয়ে পড়েন। সে যুগে রচিত কবিতাসমূহ বর্তমানেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে পঠিত হচ্ছে। মহিলা সাহাবী হযরত খান্সা (রাঃ) সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা মাত্র কিছুদিন পূর্বে বৈরুত থেকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ হয়ে গোটা পাশ্চাত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। হযরত হাছ্ছান (রাঃ) বিখ্যাত একজন কবি ছিলেন।

বর্তমানে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে ইসলাম বিদ্বেষীগণ যেমন খোদাহীন কবি ও সাহিত্যিকদেরকে ব্যবহার করে থাকে, সে যুগেও ইসলাম বিদ্বেষী গোষ্ঠী সে যুগের কবি ও সাহিত্যিকদেরকে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতো। এসব কবি আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিদ্রুপাত্মক ও বিদ্বেষমূলক কবিতা রচনা করে সারা আরব সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে দিত যেন সাধারণ মানুষের মনে আল্লাহর নবী ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ঘৃণার উদ্রেক হয়।

সাহাবায়ে কেরাম এসব কটুক্তিপূর্ণ কবিতা শুনে ব্যথিত হতেন। তাঁরা হযরত আলীকে অনুরোধ জানালেন তিনি যেন কবিতা রচনা করে ইসলাম বিদ্বেষী কবিদের জবাব দেন। হযরত আলী বললেন, আল্লাহর রাসূল যদি তাঁকে অনুমতি দেন তাহলে তিনি জবাব দেবেন। রাসূলের কাছে অনুমতি কামনা করা হলে তিনি বললেন, 'আলী এ কাজের উপযুক্ত নয়।' তারপর তিনি মদীনার আনসারদের লক্ষ্য করে বললেন, 'যাঁরা তলোয়ার দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে তাঁরা কি ভাষা দিয়ে এ বিদ্রূপের বাধা দিতে পারে না?'

আল্লাহর রাসূলের এ কথা শুনে বয়স্ক একজন আনসার সাহাবী উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জিহ্বা বের করে রাসূলকে দেখালেন। তারপর তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অনুমতি কামনা করে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এ কাজের জন্য আমি উপস্থিত। মহান আল্লাহর শপথ! আল্লাহর শত্রুদের কথার মোকাবেলা করার মতো বাক্যের থেকে বসরা, সিরিয়া এবং ইয়েমেনে আমার কাছে অন্য কোন বাক্য-ই প্রিয় নয়।' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আমি যে বংশ থেকে স্বয়ং উদ্ভূত সে বংশের লোকদের বিদ্রূপ তুমি কিভাবে করবে?' হযরত হাছ্ছান বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! তাদের মধ্য থেকে আপনাকে এমনভাবে পৃথক করবো যেভাবে আটার স্তুপ থেকে চুল বের করা হয়।'

নবী করীম (সাঃ) তাঁর সে প্রিয় সাহাবীর দিকে পরম মমতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং তাঁকে দায়িত্ব দিলেন, তিনি যেন ইসলাম বিদ্বেষী কবিদের জবাব কবিতা দিয়েই দেন। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী কবিতা রচনা করে শত্রুদের মুখ বন্ধ করে দিতেন। তিনিই দরবারে রেসালাতের সবচেয়ে বড় কবি হবার মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। হযরত বিলালের মতো একজন হাবশী গোলামও অতুলনীয় কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পরে প্রাথমিকভাবে মদীনার আবহাওয়া অনুকুল না হবার কারণে অনেকেই প্রচন্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। জ্বরের তীব্রতা এতটা ছিল যে, কারো কারো মাথার চুল পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। হযরত বিলাল(রাঃ) জ্বরে আক্রান্ত হলেন। প্রচন্ড জ্বরের কারণে কখনও কখনও তিনি অসামঞ্জস্যমূলক কথা বলতেন। এই অবস্থাতেও তাঁর হৃদয়ে সুপ্ত দেশ প্রেম জাগ্রত হয়ে উঠতো এবং যার প্রকাশ ঘটতো কবিতার মাধ্যমে। তিনি তাঁর শৈশব কৈশোর আর যৌবনের চারণভূমি মক্কার বিভিন্ন স্থানের স্মৃতি চারণ করতেন কাব্যাকারে।

প্রিয় জন্মভূমি মক্কার কথা মনে পড়লেই তাঁর চোখ থেকে ঝর্ণার মত পানি ঝরতো। মাতৃভূমি মক্কার কথা স্মরণ করে তিনি বিরহ গাঁথা রচনা করে গাইতেন। তখন তাঁর দু'নয়ন থেকে তপ্ত অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তো। তাঁর হৃদয়ের ক্ষত থেকে কবিতাকারে বের হয়ে আসতো, 'হায়! সেদিন কি আর আমি ফিরে পাবো না! যেদিন আমি মক্কার উন্মুক্ত প্রান্তরে নির্জনে একাকী রজনী অতিবাহিত করবো, আমার সঙ্গী হবে সেখানের সুগন্ধি ঘাস ইজ্খির আর রাতের শিশির। হায়! সেদিন কি আর আমার জীবনে দেখা দেবে! যেদিন আমি

মাজনার সরোবরে সাঁতার কাটতে সক্ষম হবো! প্রাণভরে আমি তাফীলের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য অবলোকন করবো!

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এমন একটি কিতাব দান করলেন, যে কিতাবের সামনে পৃথিবীর সমস্ত কবি-সাহিত্যিকদের কাব্য ও সাহিত্য প্রতিভা চিরদিনের জন্য ম্লান হয়ে গেল। আল্লাহ পবিত্র কোরআন সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করলেন–

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ-بَلْ لَّا يُؤْمِنُونَ-فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ-

এরা কি এ কথা বলে যে, এই ব্যক্তি কোরআন নিজে রচনা করে নিয়েছে ? প্রকৃত কথা হলো, এরা বিশ্বাস স্থাপন করতে চায় না। এরা যদি তাদের এই কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তারা এমন মর্যাদাপূর্ণ একটি কালাম রচনা করে নিয়ে আসুক না। (সূরা আত্-তুর–৩৩-৩৪)

পবিত্র কোরআন বিশ্বনবীর রচনা নয়–আল্লাহর চ্যালেঞ্জ শুধু এ ব্যাপারেই নয়, আল্লাহ তা'য়ালার চ্যালেঞ্জ হলো, আদৌ এ কিতাব মানব রচিত নয়। মানুষ যে জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও প্রতিভার অধিকারী, তা প্রয়োগ করে এ ধরনের মর্যাদাপূর্ণ একটি কিতাব প্রণয়ন করা আদৌ সম্ভব নয়। এ ধরনের একটি কালাম রচনা করা মানুষের শক্তি ও প্রতিভার সীমার বাইরের বিষয়। আল্লাহর এই চ্যালেঞ্জ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোন দেশের জনগণের জন্যই শুধু নয়–নয় তা কালের গন্ডিতে আবদ্ধ। আল্লাহর চ্যালেঞ্জ সারা পৃথিবীবাসীর জন্য এবং অনন্ত কাল ব্যাপী।

এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো সাহস সেই অতীতকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্তও কেউ প্রদর্শন করেনি, অনাগত কালেও কেউ প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এই চ্যালেঞ্জের প্রকৃত তাৎপর্য অনেক পন্ডিত ব্যক্তি অনুধাবন করতে অক্ষম হয়ে মন্তব্য করে থাকেন, 'বিষয়টি শুধুমাত্র কোরআনের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য গ্রন্থ প্রণেতা ও রচয়িতাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন যে ভাব-ভাষা ও ভঙ্গী, শব্দ চয়ন করে গ্রন্থ প্রণয়ন করে থাকেন, তা আরেকজন পারবেন না। কারণ কাব্য ও সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকেন। তাদের একের বৈশিষ্ট্য আরেকজনের অনুরূপ হয় না। যেমন একজন খ্যাতিমান বক্তার অনুরূপ আরেকজন বক্তা বক্তৃতা করতে সক্ষম হন না,হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে থাকে।'

আসলে এ ধরনের লোকজন আল্লাহর চ্যালেঞ্জের প্রকৃত তাৎপর্য ও স্বরূপ যথার্থভাবে অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে থাকে। এরা মনে করে, কোরআনে যেভাবে শব্দ চয়ন করা হয়েছে, যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, যে ভঙ্গী অনুসরণ করা হয়েছে, বর্ণনার ক্ষেত্রে যে অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে, আল্লাহর চ্যালেঞ্জ বোধহয় এসব ক্ষেত্রেই

করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর চ্যালেঞ্জের স্বরূপ হলো, পবিত্র কোরআন যে ধরনের সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চতর মু'জিযার অধিকারী গ্রন্থ, মান-মর্যাদার সুষমামন্ডিত উচ্চতর বৈশিষ্ট্য ও বিশাল মাহাত্মসম্পন্ন গ্রন্থ, অতুলনীয় শিক্ষাদর্শ প্রদানের ক্ষমতা সম্পন্ন গ্রন্থ, এমন ধরনের কোন গ্রন্থ রচনা করতে যদি সক্ষম হও, তাহলে সে ক্ষমতা প্রদর্শন করো। শুধুমাত্র আরবী ভাষাতেই নয়, সারা পৃথিবীর যে কোন ভাষায় কোরআনের সমকক্ষ মু'জিযা, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বসম্পন্ন গ্রন্থ রচনা করতে যদি সক্ষম হও তাহলে তা করো। এটাই আল্লাহর চ্যালেঞ্জের প্রকৃত স্বরূপ।

মহান আল্লাহ যখন কোরআন অবতীর্ণ করেন, তখনও এ কোরআন একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা ছিল, বর্তমান কালেও তা রয়েছে এবং অনন্ত কাল ধরেও তা অক্ষুন্ন থাকবে। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কোরআন এক অতুলনীয় ও অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এক মহাগ্রন্থ। আল্লাহ তা'য়ালা এই কিতাবে যে ব্যাপক ও সর্বাত্মক জ্ঞান সন্নিবেশিত করেছেন, সে জ্ঞানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও অতীত কালে যেমন কোন মনীষীর মধ্যে স্ফুরণ ঘটতে দেখা যায়নি, বর্তমানে এই বিজ্ঞানের যুগেও দেখা যায় না, অনাগত কালেও দেখা যাবে না।

বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ সমূহে কোন ব্যক্তি জ্ঞানের কোন একটি শাখায় পারদর্শিতা অর্জনের লক্ষ্যে গোটা জীবনকাল অতিবাহিত করার পরও জ্ঞানের সেই শাখার শেষ স্তর পর্যন্ত তার পক্ষে পৌঁছা সম্ভব হয় না। সেই ব্যক্তিই যখন তার আকাংখিত জ্ঞানের শাখায় বিচরণের লক্ষ্যে আল্লাহর কোরআনের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন সে দেখতে পায়–গোটা জীবনকাল সে যার অনুসন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল, তার স্পষ্ট জবাব ও সমাধান এ কিতাবে রয়েছে।

এই বিষয়টি শুধুমাত্র পরিচিত–অপরিচিত, আবিষ্কৃত–অনাবিষ্কৃত জ্ঞানের বিশেষ কোন একটি শাখার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়-গোটা বিশ্বলোক ও সৃষ্টি জগৎসমূহ, গোটা প্রাণীজগৎ এবং উদ্ভিত জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রথম স্তর থেকে শেষ স্তর পর্যন্ত পবিত্র কোরআনে বিবৃত হয়েছে। অথচ যে যুগকে বলা হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ, যে যুগে জ্ঞানের কোন একটি শাখাও বর্তমান কালের ন্যায় বিকশিত হয়নি, সেই সুর্যোত্তাপস্নাত মরুপ্রান্তরে মুর্খতার তিমিরাবৃত যুগে সম্পূর্ণ নিরক্ষর একজন ব্যক্তি কারো কোন সাহায্য ও গবেষণা ব্যতীত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা-প্রশাখায় অকল্পনীয় নির্ভুল ব্যাপক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা অর্জন করলেন এবং প্রতিটি মৌলিক বিষয়ের নির্ভুল স্পষ্ট জবাব রচনা করেছিলেন, এ কথা কি কারো পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব? সম্ভব নয় বলেই কোরআন নিজেকে আল্লাহর কালাম বলে দাবী করে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরবী ভাষায় পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। ভাষাবিদগণ বলেন, পৃথিবীর সমস্ত ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে আরবী ভাষা থেকে। অর্থাৎ সমস্ত ভাষার মা হলো আরবী, এই ভাষার গর্ভ থেকেই অন্যান্য সমস্ত ভাষা জন্ম গ্রহণ করেছে। এ

কারণে পৃথিবীর প্রতিটি ভাষার ভেতরেই আমরা দেখতে পাই, পরিবর্তিত রূপে বর্তমান সময় পর্যন্তও আরবী শব্দ বিদ্যমান রয়েছে।

এই আরবী ভাষার সর্বোন্নত এবং পূর্ণপরিণত যাবতীয় উচ্চাঙ্গের বৈশিষ্ট্যসহ সাহিত্য মানের চূড়ান্ত বাস্তব দৃষ্টান্ত হলো কিতাবুল্লাহ্ বা আল্লাহর কিতাব। পবিত্র কোরআনের ত্রিশ পারার মধ্যে কোথাও কোন একটি শব্দ অথবা কোন একটি ব্যাখ্যাও অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না, যা নিম্নমানের হতে পারে। যে সূরায় বা যে আয়াতে যে বিষয়েই বক্তব্য পেশ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত শোভন, উপযুক্ততম শব্দ চয়ন এবং বাচনভঙ্গীতে পেশ করা হয়েছে।

কোরআনে একই বক্তব্যের পুনরুচ্চারিত করা হয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই তা সম্পূর্ণ নতুন রূপে পরিবেশন করা হয়েছে এবং বলার ভঙ্গীতে অভিনবত্ব রয়েছে, ভিন্ন ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। এ কারণে কোথাও পুনরুচ্চারণের বা পুনরাবৃত্তির অশোভনতা অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না। কোরআনের সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নাছ পর্যন্ত শব্দ চয়ন ও সংযোজন এমনভাবে করা হয়েছে, যেন কোন অলঙ্কার শিল্পী তার সাধনালব্ধ কারিগরী কৌশল প্রয়োগ করে হীরক খন্ড একটার পরে আরেকটা সজ্জিত করে এক অনুপম সৌন্দর্যময় আভা ফুটিয়ে তুলেছে। কোরআনের কথার অলঙ্কার ও বর্ণনাশৈলীর প্রভাব এতটা মাধুর্যমন্ডিত যে, ভাষাশিল্পীগণ তা শোনার পরে নিজের অজ্ঞাতেই শ্রদ্ধা নিবেদনে বিরত থাকতে পারে না।

আল্লাহর কোরআনের প্রতি যাদের হৃদয়ে অবিশ্বাস, সন্দেহ-সংশয় রয়েছে, এ ধরনের ব্যক্তির কানে কোরআন তেলওয়াতের শব্দ প্রবেশ করলে তারা আভিভূত হয়ে পড়েন। প্রায় দেড় হাজার বছর অতিবাহিত হতে চললো, আল্লাহর কোরআনে জীর্ণতার স্পর্শ ঘটেনি, কিয়ামত পর্যন্তও ঘটবে না এবং কোরআন তার নিজ ভাষায় সাহিত্যের এক অতুলনীয় উচ্চতর নিদর্শন হিসেবে পৃথিবীবাসীর সামনে স্বীয় মাহিমা প্রকাশ করে আসছে। এই কোরআনের সমকক্ষ হওয়ার দাবি করা তো অনেক দূরের ব্যাপার, আরবী ভাষায় রচিত কোন একটি গ্রন্থও আল্লাহর কিতাবের উচ্চতর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য এবং তার মূল্যমানের প্রথম সীমা পর্যন্ত এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। বিষয়টি এখানেই শেষ হয়নি, আল্লাহর কোরআন আরবী ভাষাকে এমন দৃঢ় ভিত্তি দান করেছে যে, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্তও আরবী ভাষার বিশুদ্ধতা ও বিশিষ্টতার মান তাই অক্ষুন্ন রয়ে গিয়েছে, যা আল্লাহর কোরআন প্রথম থেকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল।

অথচ গত প্রায় দেড় হাজার বছরের ব্যবধানে পৃথিবীর প্রতিটি ভাষাতেই পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোন ভাষাই এতটা সুদীর্ঘকাল ব্যাপী শব্দ গঠন, উপমা প্রয়োগ, সংযোজন, রচনারীতি, বানান পদ্ধতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে তার আদি ও অকৃত্রিম রূপ-কাঠামোসহ টিকে থাকতে সক্ষম হয়নি। শুধুমাত্র কোরআনের মু'জিযা-অভ্যন্তরীণ অমিত দুর্জয় শক্তিই আরবী ভাষাকে তার সর্বোচ্চ মান ও বৈশিষ্ট্যের আসন থেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত করার প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেয়নি। যেসব কারণে কোরআন নিজেকে আল্লাহর বাণী বলে দাবী করে, উল্লেখিত কারণও তার ভেতরে একটি।

মহান আল্লাহ্ যে শব্দ, অক্ষর, বর্ণনাশৈলী, রচনারীতি, বাচনভঙ্গী সহযোগে যখন অবতীর্ণ করেছিলেন, বর্তমান কাল পর্যন্তও তার একটি অক্ষরও পরিত্যক্ত হয়নি, কিয়ামত পর্যন্তও হবে না। কোরআনের প্রতিটি বাকরীতি আরবী সাহিত্যে বর্তমান সময় পর্যন্তও অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। আল্লাহর কিতাবের সাহিত্য এখন পর্যন্তও আরবী ভাষায় সর্বোচ্চ মানের সাহিত্য হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি লাভ করে আসছে এবং কোরআনে যে বিশুদ্ধতম ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, বর্ণনায়, রচনায়, লিখনে–ভাষণে এখন পর্যন্তও তাকেই ভাষার বিশুদ্ধ রীতি বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছে। পৃথিবীতে এ যাবৎ কাল পর্যন্ত বহু পন্ডিত ব্যক্তি তাদের স্ব-স্ব ভাষায় কালজয়ী সাহিত্য নির্মাণ করে আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছেন। কিন্তু কোন একটি সাহিত্যই কি আল্লাহর কোরআনের উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের একটিকেও স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে? হয়নি এবং কখনো হবে না বলেই পবিত্র কোরআন নিজেকে আল্লাহর কিতাব বলে দাবী করে।

এই কোরআন কোন এক নির্দিষ্ট দিনে একত্রে অবতীর্ণ হয়নি। প্রথমে প্রাথমিক পর্যায়ের হেদায়েত অবতীর্ণ করা হলো। তারপর সেই হেদায়েতের মাধ্যমেই একটি সংস্কারমূলক আন্দোলন ও ভবিষ্যতের গর্ভস্থ দিনগুলোর জন্য সর্বব্যাপী বিপ্লবের সূচনা করে দেয়া হলো। বিশ্বনবীর নেতৃত্বে যে আন্দোলন পুনঃজাগরিত হলো, সে আন্দোলন দীর্ঘ তেইশ বছরে এসে সফলতা অর্জন করলো।

দীর্ঘ তেইশ বছরে আন্দোলন যেসব চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে সম্মুখে সফলতার সোনালী দ্বার প্রান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, তার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে কোরআনের বিভিন্ন অংশসমূহ নবী করীম (সাঃ) এর মুখ মোবারক থেকে কখনো নাতিদীর্ঘ ভাষণ কখনো বা সংক্ষিপ্ত ভাষণাকারে এ কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছিলো। পরবর্তীতে আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্বে দ্বীনি আন্দোলন সফলতা অর্জনের পর্যায়ে কোরআনের বিভিন্ন অংশসমূহকে পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থাকারে পৃথিবীবাসীর সামনে 'কোরআন' নামকরণ করে পেশ করা হয়েছে।

কোন ব্যক্তি যদি এই কোরআনকে রাসূলের স্বকপোলকল্পিত বলে দাবী করে, তাহলে তার এটা দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, সারা পৃথিবীর ইতিহাস একত্রিত করে তার ভেতর থেকে এমন একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যে, একজন মানুষ বছরের পর বছর ধরে একটি প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির মোকাবেলা করে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কখনো উপদেশ দানকারী হিসেবে, কখনো নৈতিকতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে, কখনো একটি মজলুম জনগোষ্ঠীর মুক্তির অগ্রনায়ক হিসেবে, কখনো একটি বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক হিসেবে, কখনো আইন প্রণেতা ও আইনদাতা হিসেবে, কখনো একটি বিশাল সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর সিপাহ্সালার হিসেবে, কখনো বিজয়ী নেতা হিসেবে, কখনো আধ্যাত্মিক জগতে পৌঁছার পথপ্রদর্শক হিসেবে এবং সে আসনে আসীন হয়ে যে বক্তৃতা ও

ভাষণ দান করেছেন, নানা উপলক্ষ্যে যেসব কথাবার্তা বলেছেন, তা একত্রে সংগ্রহ করে একটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ সুসংবদ্ধ বিপ্লবাত্মক সর্বব্যাপী চিন্তাদর্শ ও ব্যবহারিক জীবনে কর্ম বিধানে পরিণত করা হয়েছে এবং সে বিধানে কোন ক্রম-বিরোধ, অসামঞ্জস্য বা বৈষম্যের স্পর্শ ঘটেনি, তার সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত একই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও চিন্তা-শৃংখলার ধারা বাস্তবায়িত হয়ে টিকে থাকতে দেখা গিয়েছে, তা মানব গোষ্ঠীর সামনে প্রদর্শন করা। এ ধরনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা কারো পক্ষে কখনো সম্ভব হয়নি, অনাগত দিনেও সম্ভব হবে না বিধায় কোরআন নিজেকে আল্লাহর বাণী বলে দাবি করে।

কোরআন যাঁর ওপরে অবতীর্ণ হলো, সেই মহামানব বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিনই তাঁর মহান বিপ্লবী আন্দোলনের যে ভিত্তি স্থাপন করেছেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সেই ভিত্তির ওপর অটল অবিচল থেকে চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনে কর্মের এমন একটি সর্বাত্মক ব্যবস্থা নির্মাণ করে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, যার প্রতিটি স্তর অন্যান্য স্তরের সাথে পরিপূর্ণরূপে সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। রাসূলের পবিত্র জবান মোবারক থেকে কোরআন যে ভাষণাকারে প্রকাশিত হয়েছে, তা চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ সত্যানুসন্ধিৎসু মন-মানসিকতা নিয়ে পাঠ করলে এ কথার স্বীকৃতি দানে বাধ্য হবেন যে, রাসূল যে আন্দোলনের সূচনা করলেন, তার শেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পথের কোন বাঁকে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে, কোন ধরনের পরিস্থিতিকে স্বাগত জানাতে হবে, তার পরিপূর্ণ একটি চিত্র রাসূলের দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট ছিল। আন্দোলনের যাত্রাপথে পথিমধ্যে রাসূলের মন-মস্তিষ্কে এমন কোন নতুন চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে, যা বর্তমানে অনুপস্থিত ছিল অথবা থাকলেও সে চিন্তার পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, এমন কোন বিষয় অনুসন্ধান করে পাওয়া যায় না। এমন ধরনের বিস্ময়কর সৃজনশীল প্রতিভা প্রদর্শনকারী, অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী কোন ব্যক্তিত্ব সুদূর অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্তও পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করেনি, ভবিষ্যতের গর্ভে অপ্রকাশিত শতাব্দীসমূহেও কখনো পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না। যতগুলো কারণে কোরআন নিজেকে আল্লাহর বাণী বলে দাবী করে, এ কারণটিও তার মধ্যে অন্যতম।

আল্লাহর এই কোরআনে মহান আল্লাহ যে বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন, তা যেমন সর্বব্যাপী বিপ্লবাত্মক তেমনি ব্যাপক ও বিশাল। এর আলোচিত বিষয়ের পরিধি অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত গোটা সৃষ্টিলোকে পরিব্যাপ্ত এবং বিস্তৃত। সৃষ্টি জগতসমূহের অন্তর্নিহিত রহস্য, মহাসত্য, প্রকৃত তত্ত্ব; এর সূচনা ও সমাপ্তি, বিনাশ এবং সর্বশেষ পরিণতি; এর নিয়ম-শৃঙ্খলা, আইন-বিধান, পরিচালনা ইত্যাদির ব্যাপারে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এই মহা-বিশাল সৃষ্টিলোকের স্রষ্টা, পরিচালনাকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী, লালন-পালনকারীর পরিচয় কি, তিনি কি ধরনের গুণাবলীর অধিকারী, এসব গুণাবলীর ধরন কি, তাঁর ক্ষমতার পরিধি কতটা ব্যাপক, কর্মের সীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, কোন

মহাসত্যের ভিত্তিতে এই বিশাল বিশ্বলোক তার অস্তিত্ব নিয়ে টিকে রয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে, তা পবিত্র কোরআনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই বিশ্বলোকে অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষের সম্মান-মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে কোরআন সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা দিয়ে তা নির্ধারণ করে এ কথা জানিয়ে দিয়েছে যে, এটাই হলো মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব ও জন্মগত সম্মান-মর্যাদা। এতে সামান্যতম পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের যে সম্মান ও মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রেখে মানুষের জন্য চিন্তা ও কর্মের অভ্রান্ত পথ ও জীবনাদর্শ কি হতে পারে, যা স্রষ্টার সৃষ্টিপদ্ধতির সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল এবং মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা বিস্তারিতভাবে এই কোরআনে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর মানুষের জন্য অন্ধকার ও ধ্বংসের পথ কোনটি, যে পথ মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের সাথে সাংঘর্ষিক, মানুষের স্বভাব ও চিন্তা-চেতনার বিপরীত, সেটাও এই কোরআন সুস্পষ্টরূপে পার্থক্য নির্দেশ করেছে।

অভ্রান্ত পথ ও পদ্ধতি কেন অভ্রান্ত তা যেমন এ কোরআনে অখন্ডনীয় যুক্তির মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়েছে, তেমনি ভ্রান্ত পথ ও পদ্ধতি কেন ভ্রান্ত তা-ও নির্ভুল যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করার জন্য পবিত্র কোরআন গোটা বিশ্বলোকের প্রতিটি জিনিস, সৃষ্টি জগতের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম দিক, বিশ্ব-ব্যবস্থার এক একটি স্তর, মানুষের দেহাভ্যন্তরের নানা দিক, তার সত্ত্বার অস্তিত্ব, মানুষের ইতিহাস থেকে অসংখ্য ও অগণিত বাস্তব প্রমাণ ও নিদর্শনাদি পৃথিবীর সামনে পেশ করেছে। সেই সাথে এ কথাও মানুষকে এ কোরআন অবগত করেছে যে, মানুষ কি কি কারণে, কোন আকর্ষণে, কিভাবে ভ্রান্ত পথের পথিক হয় এবং এর পরিণতি কি, আর যা চিরসত্য, অনন্তকাল উত্তীর্ণ মহাসত্য, তা কিভাবে অনাদীকাল পর্যন্ত অবিকৃত ও অভ্রান্ত থাকবে এবং এ বিষয়টি মানুষ কি করে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, তা মানুষকে এই কোরআন নির্ভুল পদ্ধতির দিকে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দান করেছে।

কোনটি ভ্রান্ত পথ আর কোনটি অভ্রান্ত পথ তা এই কোরআন মানুষকে অবগত করেই ক্ষান্ত হয়নি, সেই অভ্রান্ত পথের একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার অনুপম চিত্রও মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছে। এই চিত্রে মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের যে বিভাগে যেখানে যা প্রয়োজন, তা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ বিধি-ব্যবস্থা ও মূলনীতিসমূহ অত্যন্ত বোধগম্য পদ্ধতিতে পেশ করেছে। সেই সাথে এ কথাও স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে, অভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে এবং ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করলে তার কি ফল ও পরিণতি এই পৃথিবীতে প্রকাশিত হবে, মানুষের চলমান জীবনে তার কি পরিণতি অনিবার্যভাবে দেখা দেবে, আখিরাতের জীবনেই বা কি ধরনের পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে, তা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

মানুষের জীবন ও এই পৃথিবীর সমাপ্তি কিভাবে ঘটবে এবং দ্বিতীয় আরেকটি জীবন ও জগৎ কিভাবে আত্মপ্রকাশ করবে তা এই কোরআনে অঙ্কিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই

পরিবর্তন কিভাবে কোন প্রক্রিয়ায় ঘটবে, তার প্রতিটি স্তরে কি ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হবে, এসবের প্রতিটি দিকের এক একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র কোরআন তার পাঠকের দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত করে তুলে দিয়ে ঘোষণা করেছে, এই পৃথিবীর পরবর্তী পৃষ্ঠায় মানুষ তার দ্বিতীয় জগতে কিভাবে অস্তিত্ব লাভ করবে; কোন প্রক্রিয়ায় মানুষ এই পৃথিবীতে করে যাওয়া যাবতীয় কর্মকান্ডের জবাবদিহি করবে; কোন ধরনের অনস্বীকার্য পরিস্থিতির ভেতরে তার কর্মের রেকর্ড তুলে দেয়া হবে; এই রেকর্ডের সত্যতা প্রমাণের জন্য কি ধরনের অখন্ডনীয় বলিষ্ঠ যুক্তি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে; শাস্তি ও পুরস্কার কি ধরনের হবে, কেন শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে তা মানুষের সামনে এই কোরআন স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে আর এসব কারণেই কোরআন নিজেকে আল্লাহর কিতাব বলে দাবী করে। এ দাবীর প্রতি চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা না অতীতে কারো ছিল, বর্তমানেও কারো নেই এবং ভবিষ্যতেও কারো হবে না।

এই পৃথিবীতে আল কোরআনই হলো একমাত্র গ্রন্থ যা মানব জাতির সমুদয় চিন্তা-চেতনা, চরিত্র-নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি এক কথায় মানুষের জীবন-যাপন পদ্ধতির ওপর যে ব্যাপকতর, সুগভীর ও বিপ্লবাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে, এ ধরনের সর্বব্যাপক ও সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তারকারী গ্রন্থের অস্তিত্ব পৃথিবীতে আর একটিও নেই। প্রথম পর্যায়ে এই কোরআন পৃথিবীর একটি জাতির ওপরে প্রভাব বিস্তার করে তাদের জীবন ধারার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। তারপর কোরআনের রঙে রঙিন সেই জাতি গোটা পৃথিবীর একটি বিরাট অংশের মানুষের জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতির ওপরে কম-বেশী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

এই কোরআন পৃথিবীতে যে বিপ্লবাত্মক ভূমিকা পালন করেছে এবং করছে, তা পৃথিবীর কোন একটি আদর্শ বা কোন একটি গ্রন্থের পক্ষে পালন করা সম্ভব হয়নি। কোরআন শুধুমাত্র সজ্জিত অক্ষরের আকারে কাগজের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ হয়ে থাকে না, বরং মানুষের বাস্তব কর্মের পৃথিবীতে এর এক একটি শব্দ, প্রভাব, শিক্ষা, চিন্তাদর্শ ও মতবাদের অনুপম রূপায়নে সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মাণ করে এক দৃষ্টান্তহীন কর্ম সম্পাদন করেছে এবং এখনো করছে। কোরআন যখন অবতীর্ণ হয়েছিল তখন তার যে প্রভাব ও বিপ্লবাত্মক ভূমিকা ছিল, আজও তা বিদ্যমান রয়েছে। সে যুগে কোরআনের শিক্ষা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে যে পাঠক পাঠ করতো, কোরআন তার পাঠককে সে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করতো, কোরআনের এই অতুলনীয় প্রভাব ও ক্ষমতা বর্তমানেও যেমন বিদ্যমান রয়েছে, অনাদিকাল পর্যন্তও বিদ্যমান থাকবে। কোরআন যে মহান আল্লাহর বাণী, এটাও তার একটি বড় প্রমাণ।

আল্লাহর এই কিতাব যাঁর ওপরে অবতীর্ণ হলো তিনি হলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পবিত্র জবান মোবারক থেকেই কোরআন উচ্চারিত হচ্ছিলো। তিনি হঠাৎ

করে আকাশ থেকে অবতরণ করেননি। তিনি সেই সমাজেই তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সোনালী দিনগুলো অতিবাহিত করেছেন। তিনি এমনও ছিলেন না যে, হঠাৎ কোন অদৃশ্যলোক থেকে এসে কোরআন জনসমাজে শুনিয়ে পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যেতেন। তিনি সর্বাত্মক বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা করার পূর্বেও যেমন মানব সমাজেই অবস্থান করেছিলেন, আন্দোলনের সূচনা করার পরও সেই সমাজেই উপস্থিত থাকতেন, আন্দোলন সফলতার সিংহদ্বারে উপনীত হবার সেই শুভ মুহূর্তেও মানব সমাজেই অবস্থান করছিলেন। তাঁর দৈনিন্দন জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম অভ্যাস ও কথা বলার ধরনের সাথে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সঙ্গী-সাথীগণ অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর সারা জীবনে বলা কথার সিংহ ভাগই বর্তমানেও হাদীস গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে।

আল্লাহর বাণী হিসেবে তাঁর পবিত্র জবান থেকে যা মানুষ শুনতো এবং তাঁর নিজের কথাগুলোও মানুষ শুনতো। তাঁর সমভাষাভাষী লোকজন স্পষ্ট অনুভব করতে সক্ষম হতো যে, কোনটা আল্লাহর বাণী আর কোনটা তাঁর নিজের কথা। পরবর্তী কালের আরবী ভাষাবিদগণও কোনটি রাসূলের কথা আর কোনটি আল্লাহর বাণী, তার পার্থক্য রেখা স্পষ্টভাবে অঙ্কন করতে সক্ষম হতেন। রাসূলের দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে কোথাও কোরআনের আয়াত ব্যবহৃত হলে, হাদীস আর কোরআনের বাকরীতিসহ অন্যান্য পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পার্থক্য এতটাই প্রকট যে, আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ যে কোন ব্যক্তি কোরআনের আয়াত আর হাদীস শুনলেই অঙ্গুলি সংকেত করতে সক্ষম হন, কোনটি রাসূলের বাণী আর কোনটি আল্লাহর কালাম। এই বিরাট পার্থক্যের কারণে কোরআন অবিশ্বাসীদের কাছে কতকগুলো বড় প্রশ্ন করা যায় যে, একই ব্যক্তির পক্ষে কি সম্ভব, বছরের পর বছর ধরে দুটো ভিন্নতর ধারায় ও ভাষায় কথা বলা? একই ভাষার দুটো স্বতন্ত্র ধারা রপ্ত করে তা অভ্যাসে ও বাকরীতিতে পরিণত করা কি একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব?

কোরআন ও হাদীসের ভাষা যে একই ব্যক্তির, এ ধরনের দাবী করা কি বর্তমান সময় পর্যন্ত কারো পক্ষে সম্ভব হয়েছে? পৃথিবীর কোন ব্যক্তিই কি এ ধরনের অসম্ভব স্বাতন্ত্র রক্ষা করে প্রতিদিনের জীবন পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছে? একজন মানুষ সাময়িকভাবে এ ধরনের অভ্যাস রপ্ত করে কৃত্রিমতার অভিনয় কিছু দিনের জন্য চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপী কারো পক্ষে কথা বলার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সতর্কতার সাথে দুটো ধারা বজায় রাখা সম্ভব? একজন মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া কালাম পাঠ করে শুনালে তার ভাষা-ভাব ও ভঙ্গী হবে ভিন্ন এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আর তার নিজের কথা ও বক্তৃতার ভাষা-ভাব ও ভঙ্গী পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে এবং এই নীতিদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে অবিকল অক্ষুন্ন থাকবে, এটা কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হতে পারে? পারে না বলেই এই কিতাব আল্লাহর বাণী হওয়ার দাবী পেশ করে।

কোরআন আল্লাহর বাণী–এ কথার ওপরে পাহাড়ের মতোই অটল অবিচল থেকে রাসূল দাওয়াতী কাজ ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেছেন এবং এ পথে অবর্ণনীয় সমস্যার মোকাবিলা তাঁকে করতে হয়েছে। কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসীগণ তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে, নির্যাতনের এমন কোন পদ্ধতি অবশিষ্ট ছিল না যা তাঁর ওপরে করা হয়নি। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তাঁর আন্দোলনের কর্মীগণ কষ্টার্জিত সহায়-সম্পদের মমতা বিসর্জন দিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। বছরের পর বছর তাঁকে ও তাঁর আন্দোলনের সাথীদেরকে অনাহারে থাকতে হয়েছে, বৃক্ষের পত্র-পল্লব ও শুকনো চামড়া খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবৃত্ত করতে হয়েছে। দরিদ্রতার কষাঘাতে নির্মমভাবে জর্জরিত হতে হয়েছে। প্রতিপক্ষ তাঁদের ওপরে এমন নির্যাতন করেছে যে, তাঁদের দেহের চর্বি-গোস্ত আগুনের তাপে গলে গলে পড়েছে। তাঁদের বুকের ওপরে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে, বন্য পশুর পায়ের সাথে তাঁদেরকে বেঁধে দিয়ে সে পশুকে দৌড়াতে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁদের গায়ের গোস্ত নির্মম কন্টকের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পথের ধুলোয় মিশেছে।

তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করার পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছে প্রতিপক্ষ। লড়াই-সংগ্রাম হয়েছে তাঁদের প্রতি মুহূর্তের সাথী। সংগ্রামের ময়দানে কখনো তিনি ও তাঁর সাথীগণ বিজয়ী হয়েছেন, আবার কখনো প্রতিপক্ষ বিজয়ী হয়েছে। তাঁর প্রাণের শত্রু যখন পরাজিত হয়েছে, তখন তাঁর মহানুভবতা অবলোকন করে শত্রু তার মাথা সেই পবিত্র কদম মোবারকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। প্রথম থেকেই তিনি আল্লাহ প্রদত্ত মহাক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, আবার অতিরিক্ত ক্ষমতা হিসেবে তিনি বিশাল রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। জনপ্রিয়তার সর্বশীর্ষে তিনি অবস্থান করছেন।

একজন মানুষের জীবনে যখন এতগুলো অবস্থার সমাবেশ ঘটে, তখন সে মানুষের মন-মানসিকতা কখনো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই ধরনের থাকতে পারে না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত কঠিন ব্যক্তিত্বশালী লোকের মধ্যেও হৃদয়াবেগের স্ফুরণ কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে ঘটে যায়। মানুষ হিসেবে আল্লাহর রাসূল যেসব কথা বলেছেন, সেসব কথা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর ভেতরে কোথাও কোথাও হৃদয়াবেগের প্রতিফলন ঘটেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কালাম হিসেবে যে কথাগুলো তাঁর জবান মোবারক থেকে মানুষ যা শুনেছে, তার মধ্যে মানবীয় হৃদয়াবেগের সামান্যতম চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতেও কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসী গবেষকগণ আল্লাহর কিতাবে মানবীয় হৃদয়াবেগ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

কোরআন শয়তান কর্তৃক অবতীর্ণ হতে পারে না

পবিত্র কোরআন যে যুগে অবতীর্ণ হচ্ছিলো, সে যুগে মানুষের মধ্যে একটি বিরাট গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল, যারা ছিল অশুভ শক্তির সাধক। এদের ভেতরে ছিল যাদুকর, গণৎকার,

ভবিষ্যৎবক্তা ইত্যাদি। এরা ছিল শয়তানের পূজারী। মহান আল্লাহ সূরা নাসের শেষ আয়াতে তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে শয়তান শুধু ইবলিসই নয়, মানুষের দেহসত্তার মধ্যে শয়তানি শক্তি নিহিত রয়েছে। আবার মানুষের ভেতরেও শয়তান রয়েছে এবং জ্বিনদের মধ্যেও শয়তান রয়েছে।

এই শয়তান জ্বিনদেরকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে এক শ্রেণীর লোক মানব সমাজে একটা উদ্ভট কিছু প্রদর্শন করে সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। সাধারণ মানুষ যখন কোন ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়তো, তখন তারা এসব গণৎকার আর জ্বিনের পূজারীদের কাছে গিয়ে সমস্যা মুক্ত হবার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে নিজেদের ভবিষ্যৎ জানার আগ্রহ ব্যক্ত করতো। এসব অশুভ শক্তির সাধক শয়তানের সহযোগিতায় এমন ধরনের আকর্ষণীয় কথা শুনায় যে, হতাশাগ্রস্ত মানুষ তাদেরকেই শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে গণ্য করে। এসব সাধকগণ অজ্ঞ মানুষদের কাছে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল।

সে যুগে এ ধরনের শয়তানি শক্তির পূজারীদের সমাজে প্রভাব ছিল ব্যাপক। কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসী লোকজন তখন ধারণা করেছিল মুহাম্মাদ (সাঃ) বোধহয় নিজেকে সমাজে একজন বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রচার করছেন যে, তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কালাম অবতীর্ণ হচ্ছে; আসলে তাঁর সাথে জ্বিনদের যোগাযোগ হয়েছে ও শয়তানের যোগসূত্র স্থাপন হয়েছে; আর তাদের কাছ থেকে তিনি যা শুনছেন-তাই আল্লাহর বাণী বলে দাবী করছেন। তাদের এ ধারণা ও কথার প্রতিবাদ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা স্পষ্ট ঘোষণা করলেন-

وَمَاتَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ-وَمَايَنْبَغِىْ لَهُمْ وَمَايَسْتَطِيْعُوْنَ-اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ-

এ (সুস্পষ্ট কিতাবটি) নিয়ে শয়তানরা অবতীর্ণ হয়নি। (কিতাব অবতীর্ণের) এ কাজটি তাদের শোভাও পায় না এবং তারা এমনটি করতেও সক্ষম নয়। তাদেরকে (শয়তানদেরকে) তো এ (কিতাব) শোনা থেকেও দূরে রাখা হয়েছে। (সূরা শুআরা)

কে এই কোরআন বিশ্বনবীর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করেছেন, সে কথাও মানুষকে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আশ্ শু'আরায় জানিয়ে দিয়েছেন-

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ-

এটি রাব্বুল আলামীনের নাযিল করা জিনিস। একে নিয়ে আমানতদার রুহ অবতরণ করেছে। (সূরা শুআরা)

নবী করীম (সাঃ) যখন দাওয়াতী কার্যক্রম ও আন্দোলন পরিচালিত করছিলেন, তখন মক্কার কুরাইশদের ভেতরে ইসলাম বিরোধী শক্তি এ আন্দোলনের বিস্তৃতি রোধ করার লক্ষ্যে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু মুহাম্মাদ (সাঃ) কে একজন জ্বিন প্রভাবিত ব্যক্তি হিসেবে সর্বত্র প্রচার ও প্রসার করে যাচ্ছিলো। এই ভোঁতা অস্ত্র ব্যতীত তাদের কাছে ইসলামকে প্রতিহত করার দ্বিতীয় কোন কার্যকরী অস্ত্র মওজুদও ছিল না। এ জন্য তারা প্রথমে আল্লাহর রাসূলকে সাধারণ মানুষের কাছে অগ্রহণীয় করে তোলার জন্য অপপ্রচারের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এই বিভ্রান্তি ছড়ানোর পশ্চাতে যে কারণসমূহ বিদ্যমান ছিল, তার ভেতরে কা'বা ঘরের নেতৃত্বের আসন হারানোর ভয় ছিল অন্যতম। কেননা, সৃষ্টির আদিকাল থেকেই পবিত্র কা'বাঘরের সম্মান ও মর্যাদা ছিল পৃথিবীব্যাপী।

সুতরাং যারা কা'বাঘরের তত্ত্বাবধায়ক ছিল, কা'বাঘরের কারণেই অন্যান্য মানুষের কাছে তাদের সম্মান ও মর্যাদা ছিল অনেক বেশী। কা'বার খাদেমদেরকে কেউ বলতো আল্লাহর প্রতিবেশী, কেউ বলতো আল্লাহর পরিবার, কেউ বলতো খোদার বংশধর। অর্থাৎ তারা ছিল পুরোহিত শ্রেণী। এ কারণে তারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করতো। অন্যান্য মানুষদেরকে তারা হীনতার দৃষ্টিতে দেখতো। ধর্মকর্মের বিভিন্ন দিক তারা কাটছাট করে নিজেদের জন্য অনেক বিধান পরিবর্তন করে সহজ করে নিয়েছিল।

কা'বার খাদেম হবার কারণে সমস্ত দিক দিয়ে তারা নানা ধরণের সুবিধা ভোগ করতো। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমাজের অন্য মানুষকে যে সব সমস্যার মোকাবেলা করে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হত, কুরাইশরা ছিল এর ব্যতিক্রম। কা'বাঘরকে কেন্দ্র করে তাঁরা নানাবিধ সুযোগ আদায় করতো। কা'বার সেবক ও পুরোহিত হবার কারণে গোটা সমাজে তাদের নেতৃত্ব ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত।

কুরাইশদের লোকজনই কা'বা এবং সমাজের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিল। অর্থ সংক্রান্ত দায়িত্ব ছিল হারেস ইবনে কায়েসের ওপর। পরামর্শ দানের দায়িত্ব ছিল ইয়াজিদ ইবনে রাবিয়া আসাদীর ওপর। কেউ নিহত হলে তাঁর রক্তপণের মীমাংসা করার দায়িত্ব ছিল হযরত আবু বকর (রাঃ) এর ওপর। পতাকা বহন করার দায়িত্ব ছিল আবু সুফিয়ানের ওপর। মানুষের ভাগ্য গুনে দেখার দায়িত্ব ছিল মাকওয়ান ইবনে উমাইয়ার ওপর। মক্কার গরীবদের সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল হারেছ ইবনে আমেরের ওপর। কা'বার চাবির এবং মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব ছিল উসমান ইবনে তালহার ওপর।

হাজীদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্ব ছিল হযরত আব্বাস (রাঃ) এর ওপরে। কারো সাথে কোন বিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসা করার দায়িত্ব ছিল হযরত ওমরের ওপর। তাঁবু এবং যান-বাহনের দায়িত্ব ছিল ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার ওপর। ওতবা ইবনে রাবিয়া, আবু সুফিয়ান ইবনে হরব, আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমী, আবু লাহাব, আবু জেহেল, আসওয়াদ ইবনে মুতালিব, ওতবা ইবনে আবু মুয়িত, উবাই ইবনে খালফ, নজর ইবনে হারেস,

আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস ও আখনাস ইবনে শুরাইক সাকাফী–এ সমস্ত লোকগুলোর প্রভাব ছিল গোটা মক্কায় সর্বাধিক। এদের নেতৃত্বও ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এই সমস্ত লোকগুলোর সবাই কোন না কোন দিক দিয়ে আল্লাহ্ রাসূলের সাথে আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা ছিল। কেউ কেউ ছিলেন রাসূলের আপন চাচা। সে সময়ে কুরাইশরাও জানতো একজন নবীর আগমন ঘটবে। তাদের ধারণা ছিল কুরাইশ গোত্রের কোন নেতাকেই নবী হিসাবে নির্বাচিত করা হবে। তদানীন্তন সমাজে যে ব্যক্তির প্রচুর অর্থ সম্পদ এবং সেই সাথে সবচেয়ে বেশী পুত্র সন্তান থাকতো, তাকেই শাসক হিসাবে বরণ করে নেয়া হত।

এটা ছিল সে সমাজের প্রথা এবং অধিক সন্তান থাকা ছিল সমাজে গর্ব ও মর্যাদার বিষয়। নানা ধরণের কুসংস্কারের মধ্যে এটাও প্রচলিত ছিল যে, যার পুত্র সন্তান যত বেশী সে ব্যক্তি মৃত্যুর পরের জগতে ততবেশী মর্যাদা লাভ করবে। আর যার পুত্র সন্তান থাকবে না বা পুত্র সন্তানের সংখ্যা অল্প থাকবে, পরকালে তার কোন সম্মান নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহর নবীর কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিল না বা তাঁর তেমন ধন ঐশ্বর্য ছিল না। সুতরাং, তাঁর মত মানুষ কী করে নবী হতে পারে বিষয়টি ছিল তাদের কাছে বোধের অগম্য ও অবিশ্বাসের বিষয়। তাদের কল্পনায় যে ধরনের লোক নবী হবার উপযুক্ত, সে ধরনের লোকের অভাব তাদের ভেতরে ছিল না। মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র ছিল তাদের কল্পনা ও চিন্তা-চেতনার বিপরীত।

সুতরাং, আল্লাহর রাসূলের দাওয়াত গ্রহণ না করে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বিস্তৃতি ঘটানোর এটাও একটা কারন। সে সময় পর্যন্ত মুসলমানগণ নামাজ আদায় করতো বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে। এ কারণে কুরাইশরা ধারণা করতো, মুহাম্মাদ (সাঃ) খৃষ্টানদের মত বাইতুল মুকাদ্দাসকে যখন নিজের আদর্শের কেবলা হিসাবে মনোনীত করেছে, তখন নিশ্চয়ই সে খৃষ্টানদের মতবাদ মক্কায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়–এই ধরনের ভ্রান্তিতেও তারা নিমজ্জিত ছিল।

কুরাইশদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উপগোত্র ছিল। তাদের মধ্যে দুটো গোত্র ছিল এমন যে তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। একে অপরকে মুহূর্তের জন্য সহ্য করতে রাজী ছিল না। তাঁর মধ্যে একটা গোত্র ছিল বনী হাশেম অপরটি ছিল বনী উমাইয়া। আব্দুল মুত্তালিব তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে বনী হাশেমকে সম্মান ও মর্যাদার অতি উচ্চ স্থানে আসীন করেছিলেন। তাঁর ভেতরে যেমন ছিল নেতৃত্বের গুনাবলী তেমন ছিল তাঁর অর্থ বিত্ত।

ফলে সমাজে বনী হাশেমের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিল না। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর সন্তানদের মধ্যে কেউ নেতৃত্বের সে আসন ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। আব্দুল মুত্তালিবের মত নেতৃত্বের গুণাবলীসম্পন্ন তাঁর কোন সন্তানই ছিল না। তাঁর এক সন্তান আবু তালিব যিনি ছিলেন দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। আরেক সন্তান আব্বাস যদিও সম্পদশালী ছিলেন কিন্তু পিতার ন্যায় তিনি দানবীর ছিলেন না, পিতার মত ব্যক্তিত্বও তাঁর ছিল না। আরেক সন্তান আবু

লাহাব ছিল সমাজে চরিত্রহীন নামে পরিচিত। সুতরাং, পিতার মত কোন সন্তানই নেতৃত্বের আসন ধরে রাখতে পারেনি।

ফলে বনী উমাইয়া গোষ্ঠী আব্দুল মুত্তালিব জীবিত থাকতেই অন্তরে যে আশা পোষণ করতো, তাঁর অবর্তমানে তাদের সে দীর্ঘকালের আশা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা সামনে এগিয়ে এলো। সমস্ত দিক থেকে বনী হাশেমকে কোণঠাসা করে নেতৃত্বের পদ দখল করলো। নবী করীম (সাঃ) ছিলেন বনী হাশেমের সন্তান। সুতরাং তাঁকে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দিলে বনী হাশেমের নেতৃত্ব মেনে চলতে হবে, এ কারণে তারা তাঁর আন্দোলনে বাধার সৃষ্টি করেছে, অপপ্রচার করেছে।

আর ইতিহাসে দেখা যায় এই বনী উমাইয়াগণই ইসলামের ইতিহাসে কলঙ্কজনক ঘটনার জন্মদান করেছে সবচেয়ে বেশী। এই উমাইয়া গোত্রের নেতা আবু সুফিয়ান ইসলামের বিরুদ্ধে একমাত্র বদর যুদ্ধ ব্যতীত সমস্ত যুদ্ধে নেতৃত্বদান করেছে। তাঁর স্ত্রী হিন্দা হযরত হামজা (রাঃ) এর কলিজা বের করে চিবিয়ে ছিল। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার জন্মদাতাও এই বনী উমাইয়াগণ। তিনজন খলীফার হত্যাকান্ড এবং ইসলামী শাসন অবসানে বনী উমাইয়াদেরই ষড়যন্ত্র অধিক কার্যকর ছিল।

আবু জেহেলের গোত্র ছিল বনী মাখজুম গোত্র। এই গোত্রের গোত্রপতি ছিল ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা। এরাও বনী হাশেম গোত্রের শত্রু ছিল। সুতরাং, হাশেম গোত্র থেকে কেউ নবীর দাবী করলে তারা তা গ্রহণ করবে না, এমন ঘোষনা স্বয়ং আবু জেহেল দিয়েছিল। বনী উমাইয়া গোত্রের ওতবা ইবনে আবু মুয়িত্ত ছিল আল্লাহর নবীর প্রাণের শত্রু। আল্লাহর রাসূল নামাজ আদায় করছিলেন আর ওতবা নবীর পবিত্র শরীর মোবারকের ওপর উটের পচা নাড়ি ভূড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত কুরাইশদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন ব্যক্তি ছিলেন সৎ এবং ভদ্র। তাঁরা কোন ধরনের দাঙ্গা পছন্দ করতেন না। যে কোন সমস্যাকেই তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে আগ্রহী ছিলেন। রাসূলকে কেন্দ্র করে তারা যে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, এ সমস্যাকে অন্যরা যেমন শক্তি প্রয়োগ করে সমাধান করতে আগ্রহী ছিল, ভদ্র ব্যক্তিগণ তাতে বাধা দিতেন।

কুরাইশ দাঙ্গাবাজ নেতৃত্বের মধ্যে চরিত্র বলতে কিছু ছিল না। স্বয়ং আবু লাহাব ছিল চোর, কা'বাঘরের স্বর্ণের পাত্র সে চুরি করেছিল। কেউ ছিল মিথ্যাবাদী, কেউ ছিল কুমন্ত্রণাদানকারী। নৈতিক দিক দিয়ে তারা সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর রাসূল একদিকে শিরক্ তথা অংশীদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কঠোর সমালোচনা করতেন অপর দিকে চারিত্রিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে বলতেন। ফলে নেতাদের প্রকৃত চরিত্র সাধারণ মানুষের কাছে উন্মোচিত হয়ে যেত। নেতাদের নেতৃত্ব সাধারণ মানুষ গ্রহণ করবে না, এ কারণে তারা বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে লেগেছিল। সে সমাজে যারা ছিল নেতা, নেতৃত্বের আসনে বসে যারা প্রভূত অর্থ বিত্তের মালিক হয়েছিল ও সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার

মাধ্যমে যারা গোটা জাতিকে শোষণ করছিল, নেতৃত্বের আসনে বসে যারা নিজেদেরকে সব ধরনের আইন-কানুনের উর্ধ্বে মনে করতো, তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে পবিত্র কোরআন জ্বালাময়ী ভাষণ পেশ করতো ও ক্ষেত্র বিশেষে তাদের নাম ঠিকানা আকারে ইঙ্গিতে সাধারণ মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দিচ্ছিল। নবী করীম (সাঃ) কঠোর বক্তব্য রাখতেন, ফলে স্বার্থান্বেষী নেতাগণ রাসূলের কার্যক্রমের মধ্যে নিজেদের মৃত্যু দেখে ছুটে গেল আবু তালিবের কাছে।

চাচা আবু তালিব সে সব নেতাদেরকে নানা ধরনের কথা বলে কোন রকমে শান্ত করে বিদায় করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল তাঁর আন্দোলনকে আরো গতিদান করলেন। এবারে আস ইবনে ওয়াইল, আবু সুফিয়ান, ওলীদ ইবনে মুগীরা, ওতবা ইবনে রাবিয়া, আবু জেহেল, আস ইবনে হিশাম প্রমুখ কাফের নেতৃবৃন্দ আবু তালিবের কাছে এলো। তারা হুমকির ভাষায় তাঁকে জানালো, 'তোমার আশ্রয় প্রশ্রয়ে মুহাম্মাদ আমাদের উপাস্য দেবতাদের সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করে, আমাদেরকে বলে আমরা নাকি জ্ঞানহীন মূর্খ। সে আমাদেরকে ভুল পথের পথিক বলে এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিল পথভ্রষ্ট এ কথাও বলে। তুমি তাকে বিরত করতে পারোনি। এখন তুমি তাঁর পেছন থেকে সরে যাও আর না হয় তুমিও তাঁর পক্ষাবলম্বন করে আমাদের সাথে লড়াইতে চলে এসো।'

আবু তালিব পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। তিনি অনুভব করলেন বিশ্বনবীর জন্য ময়দান কতটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। যে কোন মুহূর্তে পরিস্থিতি তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এবং একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সমস্ত দিক চিন্তা করে তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ) কে ডেকে বললেন, 'বাবা! এমন কোন ভারী বোঝা আমার কাঁধে আরোপ করো না, যা আমি বহন করতে পারবো না।'

ময়দানের প্রকৃত অবস্থা রাসূলের অজানা ছিল না। চাচার কথার যে কি তাৎপর্য তাও তিনি অনুভব করলেন। তাঁর কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পরিস্থিতি চাচা আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। পরম শ্রদ্ধাভরে তিনি তাঁর চাচাকে জানালেন, 'মহান আল্লাহর কসম করে আপনাকে জানাচ্ছি চাচাজান! যারা আমার বিরুদ্ধে আপনার কাছে অভিযোগ করছে, তারা যদি আমার এক হাতে আকাশের চন্দ্র আর আরেক হাতে আকাশের সূর্য ধরিয়ে দেয় তবুও আমি যে দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি তা থেকে বিরত হবো না। মহান আল্লাহ এ কাজের পূর্ণতা দান করবেন আর না হয় আমি এ পথে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে দেব।'

এই কথাগুলো বলার সময় আল্লাহর নবীর পবিত্র চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। তিনি চাচার কাছ থেকে উঠে চলে যেতে লাগলেন। কিছু দূর অগ্রসর হবার পরে আবু তালিব তাঁকে পুনরায় ডাক দিলেন। প্রাণপ্রিয় ভাতিজার কথাগুলো চাচা আবু তালিবের মর্মে স্পর্শ করেছিল। তিনি প্রিয় ভাতিজার দিকে মমতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'বাবা! তুমি

তোমার দায়িত্ব পালন করতে থাকো। এমন কোন শক্তি নেই যে তোমার ওপরে আঘাত করবে। তোমাকে আমি কারো হাতেই তুলে দেব না।'

আবু তালিব তাঁর ভাতিজাকে সহযোগিতা করা হতে বিরত হবেন না, এ কথা শুনে তারা এক অদ্ভূত পদ্ধতি আবিষ্কার করে পুনরায় আবু তালিবের কাছে গেল। তাদের সাথে ছিল উমারাহ ইবনে ওয়ালিদ নামক এক সুদর্শন যুবক। তারা আবু তালিবের কাছে ঐ ছেলেটিকে দেখিয়ে প্রস্তাব দিল, 'এই ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি সাহসী। আপনি একে গ্রহণ করে মুহাম্মাদকে আমাদের হাতে তুলে দিন, তাকে আমরা হত্যা করি। একজনের বিনিময়ে আপনি আরেকজনকে লাভ করছেন।'

আবু তালিব ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে তাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'খোদার শপথ! তোমরা একটি নোংরা প্রস্তাব আমার কাছে পেশ করছো। আমি কখনো তোমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি না। তোমরা তোমাদের সন্তানকে আমার কাছে দেবে আমি তাকে ভরণপোষণ করতে থাকবো, আর আমার সন্তানকে আমি তোমাদের হাতে তুলে দেব তোমরা তাকে হত্যা করবে। খোদার শপথ! তোমরা মনে রেখো, কোনদিন তা সম্ভব নয়।' তাঁর স্পষ্ট কথা শুনে কাফের নেতা মুতয়িম ইবনে আদী পুনরায় বললো, 'আবু তালিব! আপনার গোষ্ঠীর লোকজন আপনার কাছে যথাযথ প্রস্তাব দান করেছে। যে বিষয়ে আপনি নিজেও চরম অসুবিধার মধ্যে আছেন, এরা আপনাকে সেই অসুবিধা থেকেই মুক্তি দিতে এসেছে অথচ আপনি তা গ্রহণ করছেন না।' আবু তালিব জবাব দিলেন, 'খোদার শপথ! তোমরা আমার সাথে ন্যায় বিচার করোনি। তোমরা এসেছো আমাকে অপমান করতে। এ কারণে সমস্ত মানুষকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়েছো। তোমরা যাও, তোমাদের যা ইচ্ছা তা করতে পারো।'

নবী করীম (সাঃ) তাঁর কথায় অটল থাকলেন। তাঁর শত্রু পক্ষ অনেক চিন্তা ভাবনা করে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকলো। কেননা, গৃহযুদ্ধে তাদের সমস্ত শক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। তারপর মুহাম্মাদকে হত্যা করলে গোত্রে গোত্রে যে পুনরায় যুদ্ধ সৃষ্টি হবে এবং তার পরিণাম যে সমূলে ধ্বংস, এসব দিক তারা ভেবেছিল। সুতরাং, তারা নির্যাতনের পথ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলো। আল্লাহর রাসূলের নামাজ আদায়ের সময় গলিত আবর্জনা তাঁর পবিত্র শরীরে নিক্ষেপ করা, তাকে দেখে হৈ চৈ করা, বিদ্রূপ করা, তাঁর চলার পথে কাঁটা, আবর্জনা বিছিয়ে রাখা, তিনি নামাজে দাঁড়ালে তাঁর গলায় কাপড় জড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ করা, ইত্যাদি অত্যাচার শুরু করলো। যে সব গোত্রের দু'চার জন মুসলমান হয়েছিল তাদের ওপরে নির্যাতন আরম্ভ করলো।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, অবস্থা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন আবু তালিব বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব গোত্রে গমন করে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ওপরে কোন অত্যাচার হতে দেয়া যাবে না

এবং তা প্রতিরোধ করা হবে ও তাঁকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা হবে। বনী হাশিম এবং বনী মুত্তালিব গোত্র আবু তালিবের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানালো।

কিন্তু অভিশপ্ত আবু লাহাব সমর্থন দিলনা। সে এবং তাঁর স্ত্রী আল্লাহর রাসূলের সাথে বিরোধিতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখলো। আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর এত নির্যাতন সত্ত্বেও তাঁকে এ পথ থেকে বিরত করা গেল না, এ সম্পর্কে কাফের নেতাদের মনে ধারণা হলো নিশ্চয়ই মুহাম্মদ একটা কিছু অর্জন করতে চায়, এ কারণে সে এবং তাঁর অনুসারীরা এত নির্যাতন সহ্য করেও তাদের কার্যক্রমে বিরতি দিচ্ছে না এবং আদর্শ ত্যাগ করছে না।

এই অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে কাফের নেতা ওতবা ইবনে রাবিয়া নবীর কাছে এসে প্রশ্ন করলো, 'হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! বলো তো, প্রকৃত পক্ষে তোমার মনের ইচ্ছাটা কি? যদি মক্কার নেতৃত্ব কামনা করো তাহলে তা গ্রহণ করতো পারো। যদি আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মেয়ে কামনা করো তাহলে আমরা ব্যবস্থা করে দেব। গোটা মক্কার ধন রত্ন চাও আমরা তোমার সামনে এনে দিচ্ছি। তবুও তুমি যা বলছো তা থেকে বিরত হও।'

বিশ্বমানবতার মহান মুক্তির দূত নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা না বলে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত কাফের নেতাকে শুনিয়ে দিলেন। বিশ্বনবীর মুখে পবিত্র কোরআন শুনে কাফের নেতা ওতবা থরথর করে সেদিন কেঁপে উঠেছিল। তাঁর মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বের হয়নি। দ্রুত সে বিশ্বনবীর সামনে থেকে সরে পড়েছিল। পবিত্র কোরআন শুনে ওতবা ইবনে রাবিয়ার ভেতরের জগৎ কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে পড়েছিল। সে কুরাইশদের অন্যান্য নেতাদের বলেছিল, 'আমি নিজের কানে শুনে এসেছি, মুহাম্মাদ যা পড়েছে তা কোন কবির কবিতা নয়। সে যে কি পড়লো তা আমার বুঝে আসছে না। তোমাদের কাছে আমার পরামর্শ হলো, সে যা করছে তাতে তোমরা তাকে বাধা দিওনা। যদি সে তাঁর কাজে সফল হয়ে গোটা আরবের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে বিজয়ী হয় তাহলে তোমাদেরই সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আর তা করতে না পারলে সে নিজেই একদিন শেষ হয়ে যাবে।' কিন্তু ওতবার পরামর্শ কোন নেতা গ্রহণ না করে হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ইতিমধ্যে হজ্জের সময় উপস্থিত হলো। কুরাইশ নেতারা প্রবীণ ব্যক্তি ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার কাছে এলো পরামর্শের জন্য।

সে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্য করে বললো, 'হজ্জের সময় এসেছে। চারদিক থেকে লোকজন এখানে আসবে। তাদের কানে এর মধ্যেই মুহাম্মাদের কথা পৌছেছে। এখন তোমরা মুহাম্মাদ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে একমত হও। তাঁর সম্পর্কে সবাইকে একই কথা বলতে হবে। আমাদের পরস্পরের কথা যেন মানুষের কাছে দু'ধরনের হয়ে না যায়। তাহলে মানুষ আমাদের কথা মিথ্যা মনে করবে। আমরা সবাই তাঁর সম্পর্কে একই কথা বলবো।'

সমবেত লোকজন ওয়ালিদকে জানালো, 'কী কথা মুহাম্মাদ সম্পর্কে বলতে হবে তা আপনিই আমাদেরকে বলে দিন। আপনার শেখানো কথাই আমরা সবার সামনে বলবো।' কিন্তু রাসূলের সম্পর্কে কি কথা যে বলতে হবে দীর্ঘক্ষণের চেষ্টাতেও ওয়ালিদের মাথা থেকে বের হলো না। অবশেষে সে উপস্থিত নেতাদেরকে জানালো, 'তোমরাই পরামর্শ দাও তাঁর সম্পর্কে কী কথা বলা যায়?' কয়েকজন বললো, 'আমরা মানুষদের কাছে মুহাম্মাদ সম্পর্কে জানাবো সে একজন গণক।' ওয়ালিদ এ কথায় একমত না হয়ে বললো, 'মানুষ বহু গণককে দেখেছে, গণকদের কথা থাকে ইশারা ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। মুহাম্মাদের কোন একটি কথাও গণকের মত নয়।'এবার কয়েকজন পরামর্শ দিল,'তাঁকে পাগল হিসাবে পরিচিত করা হোক।'

ওয়ালিদ প্রতিবাদ করে বললো, 'অসম্ভব! তাঁকে পাগল বললে কেউ তা বিশ্বাস করবে না, বরং আমাদেরকেই মানুষ পাগল বলবে। মানুষ বহু পাগল দেখেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোন একটি কথাও পাগলের মত নয়। পাগলদের একটা কথার সাথে আরেকটি কথার কোন সামঞ্জস্য থাকে না, কিন্তু তাঁর প্রতিটি কথা একটার সাথে আরেকটার এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য রয়েছে।'

এবার কয়েকজন পরামর্শ দিল, 'তাঁকে কবি হিসাবে পরিচিত করা যায়।' ওয়ালিদ পুনরায় অস্বীকার করে বললো, 'না, তাকে কবি বলা যায় না। এদেশের মানুষ কবিদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ। নানা ধরনের কবিতার সাথে তারা পরিচিত। মুহাম্মাদের কোন একটি কথাও কোন কবির মত নয়।'

এবার অনেকে পরামর্শ দিল, 'তাঁকে যাদুকর হিসাবে সবার কাছে পরিচিত করা হোক।' ওয়ালিদ বললো, 'মানুষ নানা ধরনের যাদুকরের সাথে পরিচিত, যাদুর সাথে পরিচিত। যাদুকরেরা যেমন সুতার গিরায় ফুঁক দেয়, ঝাড়ফুঁক করে, তাবিজ কবজ দেয় মুহাম্মাদ সে ধরনের কোন কাজ করে না।'এবার সবাই বললো,'তাহলে আপনি যা বলতে চান তাই বলুন।'

ওয়ালিদ বললো,'মুহাম্মাদের কথার ভেতরে যে মাধুর্যতা আছে এ সম্পর্কে কারো মনে কোন দ্বিধা নেই। তাঁর কথার ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ় এবং তাঁর মর্মার্থ অতি গভীরে প্রথিত। তোমরা তাঁর সম্পর্কে মানুষকে যা বলবে মানুষ তার কোনটাই বিশ্বাস করবে না। আমার মতে মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে যাদুকর কথাটা বেশী উপযুক্ত। যদিও তিনি যাদুকর নন কিন্তু তাঁর কথার ভেতরে যাদুর থেকেও বেশী প্রভাব রয়েছে। তাঁর কথায় সংসারে বিভেদ সৃষ্টি হয়। স্বামীর কাছে থেকে স্ত্রী পৃথক হয়ে যায়, পিতার কাছে থেকে সন্তান পৃথক হয়ে যায়। সুতরাং, তাঁর কথা যাদুর থেকে অধিক কার্যকরী। তাঁর কথার কারণেই আজ আমাদের গোটা জাতির ভেতরে বিভেদের রেখা সৃষ্টি হয়েছে।'

মক্কার কাফের নেতৃবৃন্দ এই কথাই সর্বত্র প্রচার করতে থাকে যে, মুহাম্মদ একজন যাদুকর। এ ধরণের নানা প্রলাপ উক্তি তারা আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে করেছিল। সে যুগে যদি বর্তমান যুগের মত প্রচার মাধ্যম থাকতো, রেডিও, টেলিভিশন, ডিস এ্যান্টেনা, ইন্টারনেট, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি থাকলে এ সমস্ত প্রচার মাধ্যমে নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে মানুষ কত অর্থহীন, ভিত্তিহীন কথাই না শোনার দুর্ভাগ্য লাভ করতো। কার্টুনিষ্টগণ নবী করীম (সাঃ) এর কত বিকৃত ছবি এঁকে গোটা দেশ ছেয়ে দিত। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যখন ভিত্তিহীন প্রচার প্রপাগান্ডা চালানো হয় তখন ঐ ব্যক্তির নগদ লাভ যেটা হয় তাহলো, তার সম্পর্কে যাদের সামান্যতম কৌতুহল ছিল না তারাও কৌতুহলী হয়ে ওঠে। তার সম্পর্কে যারা কিছুই জানতো না, তারাও তার সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। তার নামটা সর্বস্তরের মানুষের কার্ণকুহরে পৌছে যায়, ঘরে ঘরে তার সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকে। তাদের এই অপপ্রচারের কারণে ব্যক্তি সম্যক পরিচিতি লাভ করে।

বিশ্বনবীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হলো না। মুহাম্মাদ নামটা এতদিন যারা শোনেনি, এবার তারাও নামটা শুনলো। সর্বত্র তাঁর সম্পর্কে একটা গুঞ্জন সৃষ্টি হলো। অন্ধানুকরণপিয়াসী যারা, তারা হয়তঃ অর্থহীন মন্তব্য করলো। কিন্তু যাদের হৃদয় জীবিত, যুক্তিতে যারা বিশ্বাসী, সত্য উদঘাটনে যারা আগ্রহী তাঁরা নীরবে প্রকৃত সত্য অবগত হবার লক্ষ্যে রাসূলের দরবারে এগিয়ে এলো। প্রকৃত সত্য অবগত হলো এবং যারা সৌভাগ্যবান ছিল তাঁরা মহাসত্য ইসলাম কবুল করে আল্লাহর বান্দায় পরিণত হলো। আর যারা ছিল হতভাগা তাঁরা প্রকৃত সত্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হলো।

ইতিহাসে দেখা যায় প্রতিটি যুগেই সমস্ত নবীদের সাথে, ইসলামের বাহকদের সাথে একই আচরণ করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার করা হয়েছে। কোন একজন নবীও বিরোধী শক্তির অপপ্রচারের কবল থেকে মুক্ত ছিলেন না। বর্তমানেও যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছে তাঁরাও অপবাদ মুক্ত নন। তাদেরকেও বিভিন্ন ধরণের অপপ্রচারের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীর ওপরে কাফের নেতৃবৃন্দ যে সমস্ত অপবাদ দিয়েছিল, সে সবের জবাব অখন্ডনীয় যুক্তির মাধ্যমে দিয়েছেন।

রাসূলের দাওয়াতকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছিল সেখানে তাদের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক যে সমস্যাটা দেখা দিয়েছিল, তাহলো রাসূল কোরআনের বাণী হিসেবে যা মানুষকে শোনাচ্ছেন তা মানুষের হৃদয় গভীরে প্রবেশ করছিল, সাধারণ মানুষের কাছে এই বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল, আল্লাহর কোরআনের বাণী মানুষের কাছে পৌছানোর পথ বন্ধ করার মতো শক্তি তাদের ছিল না। কোরআনের প্রভাব থেকে মানুষকে কিভাবে দূরে রাখা যায়, এ চিন্তায় তারা গলদঘর্ম হচ্ছিলো।

অবশেষে তারা লোক সমাজে রাসূলকে যাদুকর, গণৎকার হিসাবে পরিচিত করার অপপ্রয়াস গ্রহণ করেছিল যেন লোকজন এ ধারণা করে যে, গণৎকারদের মনে যেমন জ্বিন শয়তানরা

পরিচালনার ব্যাপারে কোন নীতিমালা পেশ করেনি। আর আমার রাসূলের মুখ দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বাণী প্রকাশিত হচ্ছে এবং তোমরা তা শুনছো, সেসব বাণী তো মানুষের জন্য কল্যাণকর নীতিমালায় পরিপূর্ণ। সুতরাং, এ বাণী কি করে শয়তান কর্তৃক সঞ্চারিত হতে পারে?

আর শয়তান যদি মানব জাতিকে কল্যাণের পথে নিয়ে আসার জন্য কোন শিক্ষামূলক আদর্শ পেশ করতে চায়-ও, তবুও তো সে তা পারবে না। কেননা, আল্লাহর কোরআনের তুলনায় কোন কল্যাণকর আদর্শ শয়তানের পক্ষে পেশ করা সম্ভব নয়। শয়তান যদি ক্ষণিকের জন্য কৃত্রিম শিক্ষকের আসনে আসীন হয়ে মানুষকে শিক্ষা প্রদান করতে চায়, তবুও তো সে শিক্ষা কোরআনের নির্ভেজাল মহাসত্য ও নৈতিকতার উচ্চতর সর্বব্যাপী বিপ্লবাত্মক নীতিমালার সাথে কোন দিক থেকেই তুলনীয় হতে পারে না।

প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করার লক্ষ্যেও শয়তান যদি সৎকাজের আহ্বায়ক হিসাবে অভিনয় করে, তবুও তো তার কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে তার স্বভাবজাত শয়তানী প্রকাশ পাবেই। যে ব্যক্তি শয়তানের অনুপ্রেরণায় নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে বসে, তার নিজের জীবনে ও তার শিক্ষার মধ্যে অনিবার্যরূপে উদ্দেশ্যের অবিশুদ্ধতা, ইচ্ছাশক্তির অপবিত্রতা প্রকাশিত হবেই। নির্ভেজাল সততা ও নির্ভুল সৎকর্মশীলতা কোন শয়তান মানুষের হৃদয় জগতে সঞ্চারিত করতে সক্ষম নয়। আর শয়তানের সাথে যারা সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তারা কখনো মহাসত্যের ধারক-বাহক হতে পারে না।

তদুপরি পবিত্র কোরআনের শিক্ষার উচ্চতর সম্মান ও মর্যাদা, পবিত্রতা, কোরআনের সুনিপুন বাগধারা, সাহিত্যালঙ্কার এবং সুগভীর তত্ত্বজ্ঞান, সৃষ্টিজগৎ ও প্রাণীজগৎ সম্পর্কে স্পষ্ট মৌলিক ধারণা যা গোটা কোরআনে বিস্তৃত রয়েছে যার ভিত্তিতে কোরআন বার বার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে যে, এ কোরআনের অনুরূপ কোন আয়াত শয়তান, জ্বিন ও সমস্ত মানুষ তাদের সমস্ত শক্তি একত্রিত করেও রচনা করতে সক্ষম নয়। শুধু তাই নয়, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম রাসূলের কাছে কোরআন নিয়ে আগমন করেন, তখন তাঁর আগমন পথের কোন একটি স্থানে শয়তান অবস্থান করা তো দূরের কথা, দূরে-বহুদূরে সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এমনটি কখনো ঘটেনি যে, ওহী নিয়ে আসা হচ্ছে আর শয়তান সেই পথে গোয়েন্দাগিরি করছিল এবং ওহীর বিষয়বস্তু কিছুটা সে জেনে নিয়ে তার পূজারীদের কাছে সে এ কথা জানিয়ে দিয়েছে, আজ মুহাম্মাদের ওপরে অমুক বিষয়বস্তু সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হবে। এটা যদি ঘটতো তাহলে তোমরা তোমাদের গণৎকারদের মাধ্যমে নিশ্চয়ই এতদিন শুনতে সক্ষম হতে।

সেই প্রাচীন কাল থেকেই কিছু সংখ্যক মানুষের ধারণা যে, উর্ধ্বজগতে মহান আল্লাহ যেসব সিদ্ধান্তের কথা তাঁর ফেরেশতাদেরকে অবগত করে থাকেন, ফেরেশতারা তা নিয়ে যখন

নানা ধরনের কথার সৃষ্টি করে দেয়, তেমনি মুহাম্মাদের মনেও শয়তান এসব কথার সঞ্চার করে দিচ্ছে আর তিনি তা আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করছেন। ইসলাম বিরোধী শক্তির এই অপবাদের জবাবে আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেন, এ কিতাব শয়তান অবতীর্ণ করতে সক্ষম নয় এবং শয়তানের মুখে কোরআনের বাণী শোভা পায় না।

কেননা কোরআন যে শিক্ষাদর্শ উপস্থাপন করছে, শয়তানের চিন্তা-চেতনা ও শিক্ষা তো সম্পূর্ণ এর বিপরীত। সুতরাং, কোরআন উপস্থাপিত শিক্ষা কি করে শয়তান পেশ করতে পারে? আল্লাহর কালামকে গণৎকারের কথা বলে তোমরা যারা প্রচার করছো, তোমরা যে দেশে, সমাজে বাস করছো, সেখানে যথেষ্ট গণৎকার অবস্থান করছে এবং তোমরা বহু গণৎকারের সঙ্গ লাভ করেছো, তাদের কথা শুনেছো। গণৎকারের বক্তব্য কি ধরনের হতে পারে এ ব্যাপারে তোমরা অভিজ্ঞ। আমার নবীর মুখ থেকে যে কোরআন তোমরা শুনছো, সে কোরআন আর গণৎকারের কথার মধ্যে সামান্যতম কোন সামঞ্জস্য রয়েছে কি? শয়তান কর্তৃক সঞ্চারিত কথার ভিত্তিতে এতকাল যাবৎ গণৎকারগণ তোমাদের মধ্যে যে শিক্ষাদর্শ প্রচার করে এসেছে, কোরআন তার ঠিক বিপরীত শিক্ষাদর্শ প্রচার করে, তাহলে এ কোরআন কি করে শয়তান কর্তৃক সঞ্চারিত কথামালা হতে পারে? তোমরা এবং তোমাদের কোন পূর্ব পুরুষ কি এ কথা কখনো শুনেছে যে, কোন শয়তান গণৎকারের মাধ্যমে মূর্তিপূজা ও সমস্ত ইলাহকে ত্যাগ করে এক আল্লাহর দাসত্ব করার শিক্ষা মানুষের সামনে পেশ করেছে? পৃথিবীতে মানুষ যা করছে, এসব কাজের জবাবদিহি আদালতে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে করতে হবে–এ কথা কি শয়তান বলেছে? যাবতীয় অন্যায় ও গর্হিত কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার কথা কি শয়তান কোনদিন বলেছে? ভ্রান্ত ও অসৎ পথ ত্যাগ করার কথা কি শয়তান বলেছে? শয়তানরা এসব সৎপ্রবৃত্তি লাভ করবে কিভাবে?

কেননা শয়তানের মূল স্বভাবই হলো, মানুষকে অসৎ পথপ্রদর্শন করা, তাদেরকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করা। সুতরাং শয়তান কি করে কোরআনের শিক্ষার ন্যায় অতুলনীয় আদর্শ প্রচার করতে পারে? কোরআনের আদর্শের প্রতি লক্ষ্য করেও কি তোমরা অনুধাবন করো না, এসব কথা শয়তান কর্তৃক অবতীর্ণ হতে পারে না?

শয়তানের সাধক ও তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী গণৎকারদের কাছে তোমরা তো এসব প্রশ্ন করতে যাও যে, আমার অমুক জিনিসটা হারিয়ে গিয়েছে, তার সন্ধান করে দিন। আমি অমুক একটি মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, তাকে আমার জীবন সাথী করার ব্যবস্থা করে দিন। আমি অমুক দিন অমুক কাজ শুরু করছি, তাতে সফল হবো কিনা বলে দিন। আমি অমুক ব্যাপারে বাজি ধরেছি, তাতে বিজয়ী হবো কিনা বলে দিন। আমার এই ক্ষতি হয়েছে, কে ক্ষতি করেছে তার সন্ধান বলে দিন। গণৎকারগণ তো চিরদিন তোমাদের এসব কাজ সফল করে দিতে পারে বলে তোমাদেরকে ধারণা দিয়ে এসেছে। তারা তো কোনদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দাসত্ব করার বিষয় শিক্ষা দেয়নি বা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র

আলোচনা করে, তখন জ্বিন ও শয়তান উর্ধ্বজগতে আড়ি পেতে তা শ্রবণ করে এসে তার পূজারীদেরকে জানিয়ে দেয়। এভাবেই গণৎকারগণ ভবিষ্যৎবাণী করে থাকে। পবিত্র কোরআন বলছে, মানুষের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে, শয়তান উর্ধ্বজগতে গমন করার ক্ষমতা সম্পন্ন। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, শয়তান অবশ্যই উর্ধ্বজগতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা সে জগতের ব্যবস্থাপনা এমনভাবে সুসম্পন্ন করেছেন যে, শয়তানের পক্ষে সেখানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। আল্লাহ উর্ধ্বজগতে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নিমার্ণ করেছেন। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে সে জগত থেকে উত্তপ্ত উল্কাপিন্ড নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। শয়তান সে জগতের আশেপাশে ঘুরঘুর করার চেষ্টা করলেই একটি মহাশক্তিশালী অগ্নিপিন্ড তাকে ধাওয়া করে। সুতরাং রাসূলের মুখ থেকে যে কোরআন প্রকাশিত হচ্ছে, তা পরিপূর্ণভাবে শয়তানের হস্তক্ষেপ বা প্রভাব মুক্ত।

এরপরেও বলা হয়েছে, এই কিতাব এমন এক সত্তার মাধ্যমে নবীর কাছে প্রেরণ করা হয়, যিনি যাবতীয় মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত। এ কোরআন নিয়ে কোন বস্তুগত শক্তি আগমন করেনি, যার মধ্যে পরিবর্তন ও অবক্ষয়ের সামান্যতম কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে। সেই সত্তা যাকে বলা হয়েছে 'রুহুল আমিন' তাঁর ভেতরে বস্তুবাদিতার কোন চিহ্ন নেই। মানব জাতির মধ্যে যেমন অবিশ্বস্ততার প্রবণতা বিদ্যমান, রুহুল আমিন বা জিবরাইল আলাইহিস্ সালাম এসব প্রবণতা থেকে মুক্ত। তিনি সম্পূর্ণরূপে আমানতদার। পৃথিবীর অতিবিশ্বস্ত মানুষও প্রলোভনে পড়ে ক্ষেত্র বিশেষে বিশ্বস্ততা হারিয়ে বসে।

কারণ মানুষের মধ্যে প্রলোভিত হওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু রুহুল আমিন সে প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত–তাঁকে সৃষ্টিই করা হয়েছে সেভাবে। এ কারণে তিনি যখন কোরআন নিয়ে আসেন, তখন শয়তান এর ভেতরে কোন মিশ্রণ ঘটাবে, এ সুযোগ শয়তান লাভ করা তো অনেক পরের ব্যাপার, রুহুল আমিনের আগমন পথ থেকে শয়তানকে শতকোটি যোজন দূরে অবস্থান করতে হয়। সুতরাং কোরআন শয়তান কর্তৃক সঞ্চারিত কোন বাণী নয়–এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে গোটা জগতের প্রতিপালক, স্রষ্টা ও পরিচালক, নিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে।

কোরআন বিরোধিদের ওপরে কোরআনের প্রভাব

পবিত্র কোরআন যখন অবতীর্ণ হচ্ছিলো, তখন যারা এর বিরোধিতা করেছে, তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল–এই কিতাবকে তারা না পারছিল আল্লাহর বাণী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে, না পারছিল এটাকে মানুষের রচনা করা কিতাব হিসাবে প্রমাণ করতে। এই কিতাবকে যদি তারা আল্লাহর বাণী হিসাবে স্বীকৃতি দান করে তাহলে তাদের নেতৃত্বের অবসান ঘটে এবং সেই সাথে আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বিষয়টি তাদের কাছে ছিল একেবারেই অসহনীয়। অপরদিকে নবীর বিরুদ্ধে তারা যে অপপ্রচার চালাচ্ছিলো, সে অপপ্রচারের ফল হচ্ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত।

জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ–যাদের অন্তরে ছিল সত্যানুসন্ধিৎসা, তারা ক্রমেই আল্লাহর কোরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দ্বীনি আন্দোলনের পতাকা তলে সমবেত হচ্ছিলো। প্রতিটি যুগে এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই চিরসত্যই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অস্ত্র যতই শানিত করা হয়েছে, সাধারণ মানুষ ততই এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

সে যুগে যারা কোরআন বিরোধিতার নেতৃত্ব দিচ্ছিলো, তারা এটা স্পষ্ট অনুভব করেছিল যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) কোরআনের যে বাণী প্রচার করছেন, তার প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। এ কারণে তারা সাধারণ মানুষকে এই কোরআন শোনা থেকে বিরত থাকতে বলতো। মক্কার ইসলাম বিরোধিদের ইসলাম নির্মূলের অগণিত পরিকল্পনার মধ্যে একটি পরিকল্পনা ছিল এই যে, রাসুল যখনই কোন সমাবেশে মানুষকে কোরআনের কথা শোনাবেন, তখনই সেখানে একটা শোরগোল সৃষ্টি করে কোরআন শোনানোর পরিবেশ নষ্ট করে দেয়া। নানাভাবে কোরআনের মাহফিলে বাধা সৃষ্টি করা, যেন মানুষের ওপরে এই কোরআন কোন প্রভাব সৃষ্টি করার সুযোগ না পায়।

ইসলাম বিরোধী শক্তি এই অস্ত্র শুধু সে যুগেই প্রয়োগ করেনি, বর্তমানেও তারা তাদের সেই পুরনো অস্ত্র প্রয়োগ করে কোরআন শোনা থেকে মানুষকে বিরত রাখার অপচেষ্টা করে। ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা কোরআনের মাহফিল অনুষ্ঠিত হবার পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করে থাকে। সে যুগে ইসলাম বিরোধিরা সাধারণ মানুষকে কোরআনের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য বলতো–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ–

এসব কাফেররা বলে, এ কোরআন তোমরা কখনো শুনবে না। আর যখন তা শুনানো হবে তখন শোরগোল সৃষ্টি করবে। হয়তো এভাবে তোমরা বিজয়ী হবে। (হামীম সেজদা-২৬)

কোরআন কী অসাধারণ প্রভাব ক্ষমতার অধিকারী কিতাব, এই কিতাবের দাওয়াত যিনি দিচ্ছেন তিনি কেমন অতুলনীয় সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাঁর এই ব্যক্তিত্বের সাথে উপস্থাপনার ভঙ্গি কেমন বিস্ময়করভাবে কার্যকর হচ্ছে, তা ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দ স্পষ্ট অনুভব করতে পারতো। তারা এ কথা বিশ্বাস করতো, এ ধরনের উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির জবান থেকে এমন চিত্তাকর্ষক-হৃদয়গ্রাহী মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে এই দৃষ্টান্তহীন কালাম যার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে, সে ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত কোরআনের আন্দোলনের প্রতি দুর্বল হবেই হবে। অতএব যে প্রকারেই হোক, কোরআনের মাহফিল অনুষ্ঠিত হতে দেয়া যাবে না। কিন্তু যারা এ ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতো, স্বয়ং তারাই নিজেদের অজান্তে আল্লাহর কোরআনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়তো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, সিজদার আয়াত সম্বলিত সূরা আন্ নাজম-ই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকেই এই হাদীসের যেসব অংশসমূহ হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ, হযরত আবু ইসহাক ও হযরত জুবাইর ইবনে মুয়াবিয়া (রাঃ) সুত্রে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, সূরা আন্ নাজম-ই কোরআনের প্রথম সূরা যা আল্লাহর রাসূল কুরাইশদের সমাবেশে (আর ইবনে মারদুইয়ার বর্ণনা মতে হারাম শরীফে) সর্বপ্রথম তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন। সমাবেশে কাফির ও মুমিন উভয় শ্রেণীর লোকজনই উপস্থিত ছিল।

শেষের দিকে আল্লাহর নবী যখন সেজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেন, তখন উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সেজদায় চলে গেল। ইসলাম বিরোধিদের বড় বড় নেতারা পর্যন্ত–যারা অন্যদের অপেক্ষা বেশী বিরোধী ছিল–সেজদা না করে পারলো না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি কাফিরদের মধ্যে মাত্র একজন–উমাইয়া ইবনে খালফ্‌কে দেখলাম, সে সিজদা করার পরিবর্তে কিছুটা মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বললো, 'আমার জন্য এটাই যথেষ্ট।' আর পরবর্তী সময়ে আমি এ দৃশ্যও দেখতে পেয়েছি যে, লোকটি কুফরি অবস্থায়ই নিহত হলো।

এ ঘটনার দ্বিতীয় প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হচ্ছেন হযরত মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদা'আ (রাঃ), তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেননি। হাদীস গ্রন্থ নাসায়ী ও মুসনাদে আহমাদে তাঁর নিজের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) যখন সূরা নাজম তিলাওয়াত করে সিজদা করলেন এবং উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সাথে সেজদায় পড়ে গেল, কিন্তু আমি সেজদা করলাম না। বর্তমানে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ আমি এভাবে করি যে, এ সূরা তিলাওয়াত কালে আমি কক্ষণ-ই সেজদা না করে ছাড়ি না।

নবুয়্যত লাভের পর পাঁচটি বছর পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল কেবলমাত্র গোপন বৈঠক-মজলিসে ও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে আল্লাহর কালাম শুনিয়ে লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন সাধারণ জনসমাবেশে কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত করে শোনানোর কেন সুযোগই তাঁর হয়নি। ইসলাম বিরোধিদের প্রবল প্রতিরোধই ছিল এর প্রধান অন্তরায়। নবীর ব্যক্তিত্বে, তাঁর প্রচারমূলক কার্যাবলী ও তৎপরতার কী তীব্র আকর্ষণ ছিল এবং কোরআনের আয়াতসমূহের কী সাংঘাতিক প্রভাব ছিল, সে বিষয়ে তারা ভালোভাবেই অবহিত ছিল।

এ কারণেই তারা নিজেরাও এই কালাম না শুনার এবং অন্যরাও যেন শুনতে না পারে সে জন্য চেষ্টার কোন ক্রটি করতো না। নবীর বিরুদ্ধে নানা ধরনের ভুল ধারণা প্রচার করে তারা দ্বীনি আন্দোলনের দাওয়াতকে অবরুদ্ধ ও দমন করতে চেয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে একদিকে তারা নানা স্থানে এ কথা রটিয়ে দিচ্ছিল যে, মুহাম্মাদ বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে এবং এখন অন্য লোকদেরকে বিভ্রান্ত-পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করছে। অপরদিকে তিনি যেখানেই কোরআন শুনানোর জন্য চেষ্টা করতেন সেখানেই হট্টগোল, কোলাহল ও চিৎকার করা তাদের একটা

স্থায়ী নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁকে কী কারণে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত বলা হচ্ছে, লোকেরা যাতে তা জানতেই না পারে, এই শোরগোল করার মূলে এটাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই পরিস্থিতিতে একদিন আল্লাহর রাসূল হারাম শরীফের মধ্যে কোরাইশদের একটি বড় সমাবেশে আকস্মিকভাবে ভাষণ দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এ সময় আল্লাহর পক্ষ হতে বিশ্বনবীর মুখে যে ভাষণটি পরিবেশিত হয়েছে, তা-ই পবিত্র কোরআনে সূরা আন্ নাজম রূপে বিদ্যমান। এ কালামের প্রভাব এত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, আল্লাহর নবী যখন এ সূরা তিলাওয়াত করছিলেন, তখন তার বিপরীতে ইসলাম বিরোধিগণ এতটাই মোহিত হয়ে পড়েছিল যে, তারা হৈ-চৈ হট্টগোল করবে–এমন কোন চেতনাই তাদের ছিল না। ভাষণ শেষে নবী যখন সেজদায় পড়ে গেলেন, তখন তাঁর সাথে সাথে উপস্থিত ইসলাম বিরোধিগণও সেজদায় পড়ে গেল।

এটা ছিল কোরআনের প্রতি তাদের একটা বড় দুর্বলতা। তারা এ দুর্বলতা প্রদর্শন করে পরে বিব্রত বোধ করছিল। সাধারণ লোকজন তাদেরকে তিরস্কার করতে লাগলো যে, 'যে কালাম শুনতে তারাই নিষেধ করে আর সে কালাম শুনে স্বয়ং নিষেধকারী নেতাগণই সেজদায় পড়ে যায়। নেতাবৃন্দ মনোযোগ দিয়ে মুহাম্মাদের কোরআনও শুনেছে এবং সেজদাও করেছে।' এই পরিস্থিতিতে ইসলাম বিরোধী নেতাগণ নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

হযরত ওমরের মতো কঠিন হৃদয়ের মানুষও কোরআনের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোরআনের প্রভাব তাঁকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। আল্লাহর রাসূলকে বিব্রত করার উদ্দেশ্যে একদিন রাতে তিনি রাসূলকে অনুসরণ করছিলেন। গভীর রাতে আল্লাহর নবী কা'বাঘরে নামাজ আদায় করার জন্য গিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল নামাজে দাঁড়িয়ে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন।

হযরত ওমর তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি অন্ধকারে অদূরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নবীর পবিত্র জবান মোবারক থেকে কোরআন শুনছিলেন। কোরআনের বাণীর অপূর্ব সামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করে তাঁর মনে এ কথার উদয় হলো যে, 'এই মুহাম্মাদ সম্ভবত উচ্চমানের কবি হয়ে গিয়েছেন।' তিনি মনে মনে এ কথাগুলো বলছিলেন, আর সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মুখ থেকে উচ্চারিত করালেন–

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ-قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ-

এটা কোন কবির কথা নয়, তোমরা খুব কমই ঈমান এনে থাকো। (হাক্কাহ্-৪১)

বিস্ময়ের ধাক্কায় স্তব্ধ অনড় হয়ে গেলেন হযরত ওমর। অবাক দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে

রইলেন আল্লাহর রাসূলের দিকে। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই তিনি মনে মনে বললেন, 'এই লোকটি শুধু উচ্চমানের কবিই হননি, সেই সাথে একজন উচ্চ পর্যায়ের গণৎকারও হয়ে গিয়েছেন। তা না হলে তিনি আমার মনের কথা জানলেন কেমন করে?' তাঁর মনে এ কথা উদিত হবার সাথে সাথে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীবের মুখ থেকে সূরা হাক্কার আয়াত উচ্চারিত করালেন–

وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ-قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ-

এটা কোন গণৎকারের কথা নয়, তোমরা খুব কমই চিন্তা-বিবেচনা করে থাকো।

হযরত ওমর বিস্ময়ের দ্বিতীয় ধাক্কা খেলেন। তিনি মনে মনে যা বলছেন, আর তার জবাব রাসুল দিয়ে দিচ্ছেন। বিষয়টি তাঁকে সত্য গ্রহণের পথে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিল। তাঁর মনে পুনরায় প্রশ্ন জাগলো, 'মুহাম্মাদ (সাঃ) যা পাঠ করছেন, তা কোন কবির কথা নয়, কোন গণৎকারের কথাও নয়। তাহলে তিনি এ কালাম কোথা থেকে লাভ করলেন?' তাঁর মনের এ প্রশ্নের উত্তরও রাসূলের মুখ থেকে শোনা গেল–

تَنْزِيْلٌ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

এটা রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা আল-হাক্কাহ্-৪৩)

ঐতিহাসিক বালাযুরী হযরত ওমর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, যে সময়ে নবী করীম (সাঃ) নবুয়্যত লাভ করেন সে সময়ে গোটা কুরাইশদের মধ্যে মাত্র সতেরজন লোক লেখা পড়া জানতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন একজন। তদানীন্তন যুগের ইতিহাস থেকে জানা যায় তিনি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ বীর এবং বিখ্যাত কুস্তিগীর, পাহলোয়ান। উকাযের মেলায় তিনি কুস্তি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। সমকালীন বিখ্যাত কবিদের সমস্ত কবিতা ছিল তাঁর মুখস্থ, এ থেকে ধারণা করা যায় তিনি কতটা ব্যাপক কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আরবী কাব্য সমালোচনার বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতির আবিষ্কারক ছিলেন তিনি। বংশ তালিকা বিদ্যায় তিনি ছিলেন পারদর্শী।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, তাঁর জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির সুনাম চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কোন গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটলে তাঁকেই দূত হিসাবে প্রেরণ করা হত। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী এবং সে কারণে তাকে বিদেশ ভ্রমণ করতে হত। ফলে বিদেশের নেতৃবৃন্দ এবং শাসক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশার কারণে তাঁর জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি বিশেষ এক স্তরে উন্নীত হয়েছিল। নেতৃত্বের যাবতীয় গুণাবলী ছিল তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। সেই মূর্খতার যুগেও তিনি ছিলেন নেতা। আবার ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তিনিই ছিলেন নেতা। দ্বীনি আন্দোলনের জন্য তাঁর মত ব্যক্তিত্বের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) তাঁর মত ব্যক্তিত্বের জন্য দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আমর ইবনে হিশামকে ইসলামে দাখিল করে তুমি ইসলামকে শক্তিশালী করো।'

তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা ছিল বড়ই অপূর্ব। তিনি ছিলেন আদী গোত্রের লোক, তাঁর এই গোত্রে তাওহীদের আলো নতুন কিছু ছিল না। আল্লাহর রাসূলের আগমনের পূর্বেই তাওহীদবাদী ছিলেন হযরত যায়েদ, আর বিশ্বনবীর হাতে হাত দিয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন ঐ যায়েদেরই সৌভাগ্যবান সন্তান হযরত সাঈদ এবং তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতিমা বিনতে খাত্তাব। হযরত সাঈদ একদিকে ছিলেন হযরত ওমরের চাচাত ভাই এবং আরেকদিকে ছিলেন তাঁর আপন বোনের স্বামী। হযরত ওমরের বংশের আরেকজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁর নাম ছিল হযরত নুয়াইম ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে তেমন কোন সংবাদ রাখতেন না।

কেননা, ইসলামী কার্যক্রমের গোপনীয়তার কারণে অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে জানতেন না। তাছাড়া যারা শুনেছিল, তারা হয়তঃ ভেবেছিল মুহাম্মাদের এই নতুন আদর্শ সমাজে তেমন প্রভাব বিস্তার করবে না। দু'চারজন লোকের কাছেই সে আদর্শ সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় কেউ যদি তা শুনেই থাকে ব্যাপারটাকে তাঁরা তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু হযরত ওমর যে সময় ইসলামের কথা শুনলেন তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়লেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন যারা ইসলাম কবুল করেছিল, তিনি তাদের প্রাণের শত্রু হয়ে পড়লেন।

তিনি যখন শুনলেন তাঁর এক দাসীও ইসলাম কবুল করেছে, তখন তিনি সেই দাসীর ওপরে চরম নির্যাতন করলেন। দাসীকে যখন তিনি ইসলাম ত্যাগ করাতে সক্ষম হলেন না, তখন তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, ইসলাম যার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে তাকেই তিনি এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিবেন। তারপর শানিত তরবারী কাঁধে ঝুলিয়ে তিনি নবী করীম (সাঃ) এর সন্ধানে বের হলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, পথে তাঁর সাথে কথা হয়েছিল বনী যুহরার এক নব্য মুসলমানের সাথে, আবার কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল হযরত নুয়াইম ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে। ধারণা করা হয় সে পথিক ছিল নও মুসলিম। সে ব্যক্তি হযরত ওমরকে জিজ্ঞাসা করলো, 'হে ওমর! তুমি এমন ক্রোধের সাথে কাঁধে তরবারী ঝুলিয়ে কোথায় যাচ্ছো?'

লোকটির প্রশ্নের জবাবে হযরত ওমর ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'মুহাম্মাদের সাথে একটা শেষ বোঝাপড়া করতে।'

লোকটি তাঁকে সাবধান করে দেয়ার জন্য বললো, 'মুহাম্মাদের কোন ক্ষতি করলে তাঁর গোত্রের লোকজনের হাত থেকে তুমি নিস্তার পাবে কি করে? লোকটির একথায় হযরত ওমর সন্দেহের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি বোধহয় মুহাম্মাদের আদর্শ গ্রহণ করেছো?'

লোকটি হযরত ওমরের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য দ্রুত কণ্ঠে বললো, 'একটা সংবাদ শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে, তোমার বোন এবং তাঁর স্বামী ইসলাম কবুল করে মুহাম্মাদের দলে শামিল হয়েছে।'

এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত ওমর ক্রোধে ফেটে পড়লেন। হিতাহিত জ্ঞান শুন্যের মত তিনি ছুটলেন তাঁর বোনের বাড়ির দিকে। তাঁর বোন-ভগ্নিপতি ঘরের দরজা বন্ধ করে সে সময়ে হযরত খাব্বাবের কাছে সূরা ত্বা-হা শিখছিলেন। হযরত ওমর বোনের বন্ধ দরোজার কাছে যেতেই তাঁর কানে কোরআনের মধুর বাণী প্রবেশ করে তাঁর অন্তরের পূঞ্জিভূত বরফ গলানো শুরু করে দিয়েছিল। তিনি গর্জন করে বোনের দরোজায় আঘাত করলেন। হযরত ওমর এসেছেন এ কথা জানার পরে হযরত খাব্বাব আত্মগোপন করলেন। দরজা খুলে দেয়ার পরে হযরত ওমর ঘরে প্রবেশ করে তাদের কাছে ধমকের স্বরে জানতে চাইলেন, 'তোমরা কি পড়ছিলে? আমি পড়ার শব্দ শুনেছি।'

তাঁরা জবাব দিলেন, 'আমরা পরস্পরের মধ্যে কথা বলছিলাম।'

হযরত ওমর বললেন, 'তোমরা আমাদের আদর্শ ত্যাগ করে মুহাম্মাদের আদর্শ গ্রহণ করেছো।' হযরত ওমরের ভগ্নিপতি বললেন, আমাদের আদর্শের তুলনায় অন্য আদর্শ যদি উত্তম হয় তাহলে তুমি কি করবে ওমর? তাঁর মুখের কথা শেষ না হতেই হযরত ওমর ভগ্নিপতির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে অমানবিকভাবে প্রহার করতে লাগলেন। স্বামীকে বাঁচাতে এসে তাঁর বোনও ভাইয়ের হাতে রক্তাক্ত হলেন। বোনের শরীরে রক্ত দেখে হযরত ওমর যেন চমকে উঠলেন। ইতিপূর্বেই তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল, শত নির্যাতনের মুখেও তাঁর দাসী এই ধর্ম ত্যাগ করেনি। তাঁর বোন এবং ভগ্নিপতির অবস্থাও তেমনি। তাহলে কি আছে মুহাম্মাদের আদর্শের ভেতরে?

প্রশ্নটা তাঁর ভেতরের পৃথিবীটা সম্পূর্ণ ওলট-পালট করে দিল। তিনি কেমন যেন বিহবল হয়ে পড়লেন। অনুশোচনার কণ্ঠে তিনি তাঁর বোন ভগ্নিপতিকে বললেন, 'তোমরা কি পড়ছিলে আমাকে দেখাও!'

হযরত ওমরের কণ্ঠের পরিবর্তন শুনেই তাঁরা অনুভব করলেন, ওমরের ভেতরে পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছে। তাঁরা জানালেন, 'আমরা যা পড়ছিলাম তা মহান আল্লাহর বাণী, অপবিত্র অবস্থায় তা স্পর্শ করা যায় না।'

সুবোধ বালকের মতই হযরত ওমর পবিত্র হয়ে এসে আল্লাহর কোরআন পড়তে লাগলেন। মূহূর্তে তাঁর হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়ে সেখানে তাওহীদের জান্নাতি শিখা দেদীপ্যমান হয়ে উঠলো। কিছুটা পড়েই তিনি করুণ কণ্ঠে আবেদন জানালেন, 'কোথায় আল্লাহর রাসূল! আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।'

হযরত ওমরের এই কথা শুনে হযরত খাব্বাব (রাঃ) গোপন স্থান থেকে বের হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আনন্দিত কণ্ঠে বললেন, 'হে ওমর! আনন্দের সংবাদ গ্রহণ করো, তোমার জন্য আল্লাহর রাসূল দোয়া করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের দোয়া কবুল করেছেন। তিনি এখন সাফা পাহাড়ের ওপরে আরকামের বাড়িতে অবস্থান করছেন।'

হযরত ওমর তখন ভিন্ন এক জগতের মানুষ। তিনি আল্লাহর রাসূলকে এই পৃথিবীতে

ইসলাম প্রচার হতে বিরত করতে এসেছিলেন। এসেছিলেন তওহীদের জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে, এখন স্বয়ং তিনিই সে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। দারে আরকামের দিকে তিনি চলেছেন। আগের মতই তাঁর কাঁধে তরবারী ঝুলানো রয়েছে, তবে সে তরবারী এখন ব্যবহার হবে খোদাদ্রোহী বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে নবী করীম (সাঃ) এর আদর্শের পক্ষে। হযরত হামজা ও হযরত তালহা (রাঃ) সে সময়ে দারে আরকামের দরজায় কিছু সংখ্যক মুসলমানসহ প্রহরা দিচ্ছিলেন। হযরত ওমরকে কাঁধে তরবারী ঝুলিয়ে আসতে দেখে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

হযরত হামজা (রাঃ) সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'তাকে আসতে দাও, আল্লাহ যদি ওমরের কল্যাণ করেন তাহলে সে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করবে, আর যদি সে অন্য উদ্দেশ্যে আসে তাহলে তাঁর তরবারী দিয়েই তাকে হত্যা করা হবে।'

আল্লাহর রাসূল সে সময়ে আরকামের বাড়ির ভেতরে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে হযরত ওমরের আগমনের কথা জানালে তিনি প্রশান্ত চিত্তে বলেছিলেন, 'তাকে আসতে দাও।'

এরপর হযরত ওমর এসে পৌছলে আল্লাহর রাসূল বাইরে এসে তাঁর তরবারীর গোড়ার দিক এবং পরনের কাপড় নিজের হাতে ধরে মমতাভরা কণ্ঠে বললেন, 'হে ওমর! তুমি কি বিরত হবে না? হে আল্লাহ! ওমর আমার সামনে, হে আল্লাহ ওমরের মাধ্যমে তুমি তোমার ইসলামকে শক্তিশালী করো।'

হযরত ওমর আল্লাহর নবীর হাতে হাত রেখে ঘোষনা দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনার জন্য আপনার কাছে এসেছি।'

হযরত ওমরের কণ্ঠে এমন ব্যাকুল আবেদন শুনে আল্লাহর রাসূলের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বলেন, 'বিশ্বনবী সে মুহূর্তে উচ্চ কণ্ঠে আল্লাহ আকবার বলে তাকবির দিয়েছিলেন। বর্তমান কালের গবেষকগণ যাকে বিজয়ের শ্লোগান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। উপস্থিত সাহাবাগণও সেদিন নীরব ছিলেন না, তাঁরাও আল্লাহর নবীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাওহীদের বিজয় ঘোষনা করেছিলেন। নবী ও সাহাবাদের সম্মিলিত শ্লোগানে সেদিন পৃথিবীর সমস্ত বাতিল শক্তির ভিত্তি ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়েছিল, যা শুধু ধ্বসে পড়ার অপেক্ষায় ছিল।

ইসলামের বিপ্লবী কাফেলায় শামিল হয়েই হযরত ওমর ঘোষনা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আর লুকোচুরি নয়, আল্লাহ বিরোধী মিথ্যে শক্তি প্রকাশ্যে তৎপরতা চালাবে, আল্লাহর ঘর তারা নিয়ন্ত্রণ করবে আর আমরা যারা কা'বার মালিকের দাসত্ব করি তারা কা'বায় নামাজ আদায় করতে পারবো না, গোপনে নামাজ আদায় করবো তা হতে পারে না। চলুন আমরা প্রকাশ্যে কা'বায় মহান আল্লাহকে সিজদা করবো।' হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুসহ এমন অসংখ্য মানুষের এ ধরনের পরিবর্তন শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছিল পবিত্র কোরআনের প্রভাবের কারণে।

কোরআন দুর্বোধ্য ভাষায় অবতীর্ণ হয়নি

পৃথিবীতে মানব জাতির হেদায়াতের জন্য যত নবী ও রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে, তাঁকে সেই জাতির মধ্য থেকেই নির্বাচিত করা হয়েছে। নবী ও রাসূলদের ইতিহাসে কখনো এমনটি দেখা যায়নি যে, নবী এক ভাষায় কথা বলেন আর তিনি যে জাতিকে হেদায়াতের জন্য আগমন করেছেন, সে জাতি ভিন্ন ভাষায় কথা বলে। এমন যদি হতো তাহলে সে জাতি এই অজুহাত সৃষ্টি করতো যে, 'এমন একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের হেদায়াতকারী রূপে প্রেরণ করেছেন, যাঁর ভাষার সাথে আমরা পরিচিত নই।' জাতি যে ভাষায় কথা বলেছে, তাঁদের জন্য প্রেরিত নবী ও রাসূলও সেই একই ভাষায় কথা বলেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ-

আমি আমার বাণী পৌছানোর জন্য যখনই কোন রাসূল প্রেরণ করেছি, সে নিজ জাতির জনগণের ভাষায়ই পয়গাম পৌছিয়েছে, যেন তিনি তাদেরকে অত্যন্ত ভালোভাবে স্পষ্টরূপে বুঝাতে সক্ষম হয়। (সূরা ইবরাহীম-৪)

নবী করীম (সাঃ) এর পূর্বে এ পৃথিবীতে যত নবী ও রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল, তাঁরা ছিলেন জাতি ভিত্তিক বা দেশ ভিত্তিক নবী। আর মুহাম্মদ (সাঃ) ই হলেন বিশ্বনবী। তিনি সমস্ত যুগের, কালের সমস্ত দেশের তথা গোটা মানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর আদর্শ বিশেষ কোন জাতি গোষ্ঠী বা দেশের জন্য নয়-তাঁর আদর্শ গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। রাসূল ছিলেন আরবী ভাষী এবং তিনি যে জনগোষ্ঠীর ভেতরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তারাও ছিলেন আরবী ভাষী। আরবী ভাষাতেই তাঁর কাছে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আরবী ভাষাভাষীদের কাছে অনারব কোন ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ হলে তারা কোরআন বিরোধিতার আরেকটি অস্ত্র লাভ করতো এবং সত্য গ্রহণ না করার অজুহাত হিসাবে দাবী করতো, আমাদের বোধগম্য ভাষায় কিতাব নিয়ে এলে আমরা তা বুঝতাম এবং গ্রহণ করতে পারতাম। এ জন্য আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করে এ কথা তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মাতৃভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে-যেন তোমরা কোরআনের শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে পৃথিবীর মানুষদেরকেও এ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত পেশ করতে সক্ষম হও।

এ কিতাব আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হলেও এর নিজস্ব কতকগুলো পরিভাষা নির্দিষ্ট রয়েছে। অসংখ্য শব্দকে তার মূল আভিধানিক অর্থ থেকে স্থানান্তরিত করে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং অনেকগুলো শব্দ তাতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা এমন কোন জটিলতা ও বক্রতা দিয়ে এ কোরআন প্রেরণ করেননি যে, তা অনুধাবন করতে মানুষের অসুবিধা হবে। বরং এ কোরআনে পরিষ্কারভাবে সহজ-সরল কথা উচ্চারিত হয়েছে। প্রতিটি মানুষ অবগত হতে পারে, এ কিতাব কোন কোন মতাদর্শ,

মতবাদ, নিয়ম-পদ্ধতিকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা দেয় এবং কেন দেয়। কোন কোন জিনিসকে সঠিক বলে এবং কিসের ভিত্তিতে বলে। মানুষকে এ কিতাব কিসের প্রতি স্বীকৃতি দিতে বলে এবং কিসের প্রতি অস্বীকৃতি দিতে বলে। এ কিতাব কোন কাজের আদেশ দেয় এবং কোন কাজ থেকে মানুষকে বিরত থাকতে বলে। এ কিতাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট, এর ভেতরে না বুঝার মতো কোন জটিল বিষয়ের অবতারণা করা হয়নি।

কোন আদর্শ গ্রহণ করার ইচ্ছা না থাকলে তা অস্বীকার করার জন্য অজুহাতের অভাব হয়না। নানা ধরনের দোষ-ত্রুটি, বক্রতা ও অজুহাত প্রদর্শন করতে থাকে এক শ্রেণীর মানুষ। রাসূলের ওপরে তারা ঈমান আনবে না বিধায় তারা বিভিন্ন ধরনের অজুহাত দাঁড় করাতো। রাসূলকে তো নানা মিথ্যা বিশেষণে বিশেষিত করলো, সেই সাথে তারা এ দাবী করেছিল যে, 'কি অদ্ভুত ব্যাপার! তিনি নিজে আরবী ভাষী, আর কোরআনও নিয়ে এসেছেন আরবী ভাষায়। তিনি যদি অন্য কোন ভাষায় কোরআন নিয়ে আসতেন, তাহলে বুঝতে পারতাম, তিনি সত্যই আল্লাহর রাসূল। আরবী তাঁর মাতৃভাষা, তিনি সেই ভাষাতেই কোরআন পেশ করছেন, তাহলে এ কথা কি করে বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি এ কোরআন নিজে রচনা করেননি? কোরআনকে তখনই আল্লাহর বাণী হিসাবে বিশ্বাস করা যেত, যদি তা আরবের বাইরের কোন ভাষায় নিয়ে আসা হতো এবং তিনি তা অনর্গল পাঠ করে আমাদেরকে শুনাতেন।

আসলে এরা কখনো ঈমান আনতো না, এ জন্যই এরা অজুহাত সৃষ্টি করেছে। এদের সামনে যদি অন্য কোন ভাষাতেই কোরআন আসতো, তখন এরা বলতো, এমন কোরআন আমাদের কাছে পেশ করা হলো যে, আমরা তার ভাষাই বুঝি না। আমরা যা বুঝি না, তাই আমাদের সামনে পেশ করে বলা হচ্ছে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আসলে এটা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেননি।

আরবী ভাষায় এ কোরআন এ জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, কোরআন আরবী ভাষাভাষীদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর ভাষার ব্যাপারেও তখন সেই জনগোষ্ঠী উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছিল। এ জন্য তাদের বোধগম্য ভাষায় তা অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যেন তারা এ কিতাব সম্পর্কে গবেষণা করে দেখতে পারে, এ কিতাব কি কোন মানুষের রচনা করা না আল্লাহর বাণী। কোরআনের এসব আয়াত পাঠ করে অনেকেই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, কোরআন যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তা আরববাসীর জন্যই প্রযোজ্য। আমাদের জন্য তা অনুসরণের কোন প্রয়োজন নেই। এসব যুক্তি হলো খোঁড়া যুক্তি। কোন আদর্শ গ্রহণ করা ও বর্জন করার ক্ষেত্রে ভাষা তার মাধ্যম হতে পারে না। এটাই সর্বসম্মত প্রথাসিদ্ধ নিয়ম যে, একটি আদর্শ বিশেষ কোন একটি ভাষায় তা রচিত হবার পরে প্রথমে সে ভাষাভাষীদের মধ্যে তা প্রচারিত হবে। সেসব লোক তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে সে আদর্শ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে অনুবাদকৃত ভাষায় প্রচার শুরু করবে।

পৃথিবীর সমস্ত আদর্শের ক্ষেত্রে এই নিয়মই অনুসরণ করা হয়েছে। পুঁজিবাদ রচিত হয়েছে ইংরেজী ভাষায়, সমাজতন্ত্র রচিত হয়েছে জার্মান ভাষায়, বর্তমান কালের যাবতীয় নীতি পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক দর্শন রচিত হচ্ছে ইংরেজী ভাষায়। পরে তা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। আল্লাহর কোরআনও একই নিয়মে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই ধারা চলতে থাকবে। অন্যান্য আদর্শ এই নিয়মে প্রচারিত হওয়ার ও অনুসরণ করার ব্যাপারে যদি কোন আপত্তি উত্থাপন করা না হয়, তাহলে কোরআনের ব্যাপারে কেন আপত্তি উত্থাপন করা হবে? আরবী কোরআন আরব জাতির জন্যই প্রযোজ্য–এ দাবী যারা করে, তারা বিশেষ এক দুরভিসন্ধি গোপন করেই এ ধরনের অমূলক দাবী করে।

কোরআন আল্লাহর কিতাব-বাস্তবতা কি প্রমাণ পেশ করে

মক্কার কুরাইশদের দাবী ছিল, এই কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়-স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রচনা করেছেন, এর রচয়িতা স্বয়ং তিনি। পক্ষান্তরে কোরআন যে স্বয়ং আল্লাহর বাণী, এর বাস্তব প্রমাণ ছিলেন স্বয়ং নবী করীম (সাঃ)। তিনি সেই অবিশ্বাসীদের সামনেই উপস্থিত ছিলেন। নবুয়্যত লাভ করার পূর্বে দীর্ঘ চল্লিশটি বছর তিনি তাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। তাদের সম্মুখে তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবনের বিদায় লগ্নে প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করেছেন।

তাঁর জীবনের সমস্ত কিছুর সম্পর্ক ঐ লোকগুলোর সাথেই বিদ্যমান ছিল, যারা দাবী করছিল, এ কোরআন স্বয়ং তিনি রচনা করেছেন। অথচ তাঁর জীবনের কোন একটি দিকও কোরআন অবিশ্বাসীদের কাছে অস্পষ্ট ছিল না। সুতরাং আল্লাহর রাসুল ছিলেন অবিশ্বাসীদের কাছে পরীক্ষিত সত্যবাদী ব্যক্তিত্ব। কোরআনের প্রতি সন্দেহ পোষণকারী লোকগুলো জানতো, তিনি নবুয়্যত দাবি করার পূর্বে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবনে এমন কোন শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ পাননি বা এমন কোন গবেষক-চিন্তাবিদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেননি যে, তিনি তাদের কাছ থেকে কোন নতুন ধরনের জ্ঞান-তথ্য আয়ত্ব করে আজ নবুয়্যত দাবী করে তা প্রয়োগ করছেন।

যিনি কখনো অক্ষর জ্ঞান লাভ করার কোন সুযোগ লাভ করেননি, তাঁর মুখ থেকে কিভাবে হঠাৎ করেই জ্ঞানের সরোবর প্রবাহিত হতে থাকলো। কোরআন যেসব বিষয়বস্তুসহ অবতীর্ণ হচ্ছিলো, সেসব বিষয়ে ইতিপূর্বে মক্কার কোন লোক তাঁকে কোনদিন আলোচনা করতে শুনেনি বা এসব বিষয়ে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল বলেও কেউ প্রমাণ দিতে পারেনি। দীর্ঘ চল্লিশ বছরে তাঁর কোন আপনজন, নিকটাত্মীয়, প্রিয় বন্ধু, স্ত্রী তাঁর কোন কাজে কর্মে, কথাবার্তায়, গতি-বিধিতে এমন কোন পূর্বাভাষ পাননি যে, এই লোকটি হঠাৎ করে নিজেকে নবী হিসাবে দাবী করতে পারে বা তাঁর মুখ থেকে এমন জ্ঞান গর্ভ কথা বের হতে থাকে, যে কথা পৃথিবীর নানা ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। পবিত্র কোরআন যে

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা কিতাব, এটাই তো তার বাস্তব প্রমাণ। কারণ মানুষের মন-মস্তিষ্ক নিজের জীবন কালের কোন এক অধ্যায়েও এমন কোন জিনিস হঠাৎ করে পেশ করতে সক্ষম নয়, যার উন্মেষ ও বিকাশ লাভের সুস্পষ্ট নিদর্শন জীবনের পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে পরিলক্ষিত হয় না।

কালক্রমে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী হিসাবে খ্যাতি লাভ করে, তার জীবনে শুরু থেকেই সে নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং মানুষ অনুমান করতে পারে তার ভবিষ্যৎ জীবনে সে কি ধরনের খ্যাতি অর্জন করবে। যেমন একটি শিশু পরিণত বয়সে পৌছে কি ধরনের পান্ডিত্য অর্জন করবে, তা তার শৈশব কালে বিদ্যার্জনের প্রতি আকর্ষণ দেখেই অনুমান করা যায়। তেমন কোন নিদর্শন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রে, স্বভাবে, চলাফেরায়, কথাবার্তায় চল্লিশ বছর বয়স পূর্ণ হবার পূর্বে তাঁর একান্ত আপনজনরাও অনুমান করতে সক্ষম হননি যে, তিনি নবী হচ্ছেন এবং তাঁর মুখ থেকে কোরআন উচ্চারিত হবে।

এ কারণেই মক্কার লোকজন ইসলাম বিরোধিতার এক পর্যায়ে অপবাদ উত্থাপন করলো যে, 'কোরআন মুহাম্মদের রচনা করা নয়, কারণ তাঁর ভেতরে আমরা কোরআন রচনা করার মতো কোন যোগ্যতা কখনো দেখিনি। বরং এই কোরআন তাঁকে কেউ শিখিয়ে দেয় আর তিনি তা মুখস্থ করে এসে আমাদের সামনে পেশ করে তা আল্লাহর বাণী বলে দাবী করেন।'

ইসলাম গ্রহণ না করার অজুহাতে হতভাগারা এতটাই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, এই অপবাদ আরোপ করার পূর্বে সামান্য একটি কথা চিন্তা করার অবকাশ তারা পেলো না, শুধু মক্কা ও আরব সাম্রাজ্যই নয়-সারা পৃথিবীতে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন কোন লোকের অস্তিত্ব ছিল না, যিনি কোরআনের মতো সর্ববিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন কিতাব রচনা করতে সক্ষম এবং তা অন্য কোন মানুষকে শিক্ষা দিতে পারেন। আর এই ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন কোন লোকের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকলেও তার পক্ষে তো আত্মগোপন করে থাকা ছিল একেবারে অসম্ভব। সুতরাং কোরআন যে, কোন মানুষের রচনা নয় বরং তা আল্লাহর বাণী-এটাই তো অব্যর্থ প্রমাণ। এ কথা তারা অনুভব করেই পরবর্তীতে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।

আরেকটি বিষয় ছিল অলংঘনীয়, আল্লাহর রাসূলের নবুয়্যাত পূর্ববর্তী জীবনের অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ। তাঁর দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবনে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তেও একান্ত আপনজনও প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ও অসভ্যতা বা অন্যান্য নৈতিক কদর্যতার কোন চিহ্ন তাঁর চরিত্রে মুহূর্তের জন্যেও প্রকাশ হতে দেখেনি। গোটা আরব সাম্রাজ্যে তাঁর পরিচিত-অপরিচিত এমন একজন লোককেও অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না, যিনি আল্লাহর রাসূলের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবনে অশোভন কিছু দেখেছে বলে দাবি করতে

পারে। বরং যে কোন লোক তাঁর সংস্পর্শে এলেই তাঁকে সত্যবাদী, আমানতদার, সত্যদর্শী, অতিবিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, দয়ালু, মেহেরবান ইত্যাদি অনুপম গুণাবলী প্রত্যক্ষ করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁর মতো সমস্ত দিক দিয়ে মহৎ ব্যক্তি আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পায়নি।

খোদ মক্কার লোকজন-পরবর্তীতে যারা প্রাণের দুশমনে পরিণত হয়েছিল, তারাও তাঁকে 'এই ব্যক্তি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য' বলে সর্বমহলে প্রচার করেছিল। নবুয়্যত লাভ করার মাত্র পাঁচ বছর পূর্বে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু হলো। তারপর নির্মাণ কাজ ঐ স্থান পর্যন্ত গিয়ে উপনীত হলো, যে স্থানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তান হযরত ইসমাঈলের সহযোগিতায় কালো পাথর বা হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ স্থাপন করেছিলেন।

কথিত আছে, এ পাথর হযরত আদম (আঃ) জান্নাত থেকে এনেছিলেন। এই পাথর স্থাপন করা নিয়ে সমস্ত গোত্রের মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হলো। প্রতিটি গোত্রেরই আকাংখা, এই জান্নাতী পাথর স্থাপন করার দুর্লভ সম্মান তারাই অর্জন করবে। এ তর্কবিতর্ক শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হলো যে, প্রতিটি গোত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। পাঁচদিন পরে তাঁরা একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য কা'বার প্রঙ্গণে উপস্থিত হলো।

এ সময়ে বনী মখজুম গোত্রের সব থেকে বয়স্ক ব্যক্তি ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার ভাই আবু উমাইয়া (এ নামের বিষয়ে মতানৈক্য আছে) উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করেলা, 'হে কুরাইশগণ! তোমরা এই একটা বিষয়ে এ ধরণের ঝগড়া না করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হও যে, কাল সকালে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কা'বার দরোজা দিয়ে প্রবেশ করবে, তিনি যে সিদ্ধান্ত দেবেন তোমরা তা সবাই গ্রহণ করবে।'

বয়স্ক ব্যক্তির এ কথা সবাই গ্রহণ করলো। সেদিনের মত তাঁরা বিদায় নিল এবং পরদিন তাঁরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলো যে, তাদের আল আমীন মুহাম্মাদ (সাঃ) কা'বায় প্রবেশ করছে। সমবেত জনতা আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, 'হাযাল আমীন রাদিনা, হাযা মুহাম্মাদ! আতা কুমুল আমীন! অর্থাৎ এ তো আমীন ! আমাদের অমত নেই, তোমাদের কাছে আমীন এসেছে !'

বিষয়টা তাঁরা নবী করীম (সাঃ) এর কাছে প্রকাশ করলো। তিনি জানতে পারলেন, তাকেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। তখন তিনি বললেন, 'আমাকে তোমরা একটা বড় কাপড় এনে দাও।' একজন একটা বড় কাপড় এনে দিল। তিনি সে কাপড়টা বিছিয়ে কাপড়ের ওপরে নিজের হাতে পাথরটা রাখলেন। তারপর তিনি সমস্ত গোত্র প্রধানদেরকে বললেন, 'আপনারা সবাই এই পাথরসহ কাপড় ধরে ওঠাতে থাকুন।' তারা সবাই কাপড়ের বিভিন্ন অংশ ধরে উঁচু করতে থাকলো। যে স্থানে পাথর স্থাপন করার সিদ্ধান্ত সে পর্যন্ত

কাপড় পৌঁছলে তিনি কাপড় থেকে পাথর উঠিয়ে যথাস্থানে তা স্থাপন করলেন। এভাবে তাঁকে নবী ও রাসূল নির্বাচিত করার পূর্বেই মক্কার কুরাইশদেরকে দিয়ে তাঁকে একজন 'বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি' হিসাবে স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলেন।

সুতরাং, যে মানুষটি নিজের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবনে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম কোন ব্যাপারেও কখনো অসততা, প্রতারণা, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেননি, সেই তিনিই হঠাৎ করে এতবড় একটা মিথ্যা ও প্রতারণামূলক দাবীসহকারে দন্ডায়মান হবেন, নিজের রচনা করা অথবা কারো শিখানো কল্পিত জিনিসকে পূর্ণ শক্তিতে ও প্রবলভাবে, দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর নামে প্রচারিত করবেন, এই ধারণা বা অবকাশই কিভাবে থাকতে পারে? সুতরাং পারিপার্শ্বিকতা ও বাস্তবতাই প্রমাণ করে দেয় যে, কোরআন মহান আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিতাব।

তিনি স্বয়ং নিরক্ষর ছিলেন। তিনি যদি অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হতেন, কিছু লিখতে ও পড়তে সক্ষম হতেন, তাহলে ধারণা করা যেত যে, তিনি নিজে হয়ত কিছু রচনা করতে পারেন। এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা সাক্ষী দিচ্ছেন–

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَّلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِنِكَ اِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ-

(হে রাসূল) ইতোপূর্বে তুমি কোন কিতাব পড়তে না এবং স্বহস্তে লিখতেও না, যদি এমনটি হতো, তাহলে অবিশ্বাসীরা সন্দেহ পোষণ করতে পারতো। (আনকাবূত)

আল্লাহর রাসূলের স্বদেশবাসী, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুমহল, পরিচিতজন–যাদের মধ্যে তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর অতিবাহিত করলেন, তারা সবাই এ কথা অত্যন্ত ভালোভাবে অবগত ছিল যে, লোকটি লিখতে জানে না, পড়তে জানে না, জীবনে কোনদিন কোন কিতাব পাঠ করেনি।

অথচ এমন এক ব্যক্তির মুখ থেকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সত্য ইতিহাস, জ্ঞান বিজ্ঞানের অকল্পনীয় তথ্যাবলী, মানব জীবন বিধানের পরিপূর্ণ দিকসমূহ; ধর্মবিশ্বাসের মূলনীতিসমূহ উচ্চারিত হচ্ছে, তা কোন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ থেকে আল্লাহর ওহী ব্যতীত প্রকাশ পেতে পারে না। যদি তিনি অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হতেন, মানুষ যদি তাঁকে কখনো লিখতে-পড়তে এবং অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে দেখতো, তাহলে অবিশ্বাসীদের এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ থাকতো যে, এসব জ্ঞান ওহীর ভিত্তিতে নয় বরং জাগতিক মেধা নিয়োগ করে অর্জন করা হয়েছে–এসব জ্ঞান সাধনালব্ধ জ্ঞান।

পক্ষান্তরে তাঁর নিরক্ষরতা তাঁর সম্পর্কে এসব বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় পোষণ করার কোন অবকাশই রাখেনি। সুতরাং, একজন নিরক্ষর মানুষকে কোরআনের রচয়িতা বলে অপবাদ দিয়ে ঈমান আনা থেকে বিরত থাকা, আর ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন

পার্থক্য নেই। একজন সম্পূর্ণ নিরক্ষর মানুষের পক্ষে পবিত্র কোরআনের মতো একটি অতুলনীয় কিতাব মানুষের সামনে পেশ করা এবং এমনসব অভূতপূর্ব বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রদর্শন করা, যেগুলোর জন্য বহু পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করার কোন উদ্যোগ কারো দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি, এসব বিষয় তো অটল বাস্তবতা।

এই বাস্তবতাই প্রমাণ করে দেয় যে, তিনি সত্য নবী এবং কোরআন তাঁর ওপরে আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিতাব। সারা পৃথিবীতে যারা খ্যাতি অর্জন করেছে, তাদের কারো জীবনী পাঠ করলেই এসব উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায় যে, তার ব্যক্তিত্ব গঠনে ও স্ফুরণে এবং তার অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশের জন্য তাকে প্রস্তুত করার ব্যাপারে পরিবেশ সক্রিয় ছিল। তার পরিবেশ ও তার ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদানসমূহের ভেতরে একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়।

পক্ষান্তরে নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব গঠনের উপদানের সাথে কোন ধরনের ন্যূনতম সম্পর্ক থাকতে পারে, এমন সব উপাদান সে যুগে গোটা পৃথিবীতে কোথাও অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না। এই অটল বাস্তবতার ভিত্তিতেই এ কথার স্বীকৃতি দিতে বিশ্বের চিন্তাবিদগণ বাধ্য হয়েছেন যে, বিশ্বনবীর সত্তা শুধুমাত্র একটি নিদর্শনের নয়–বরং তা অসংখ্য নিদর্শনের সামষ্টিকরূপ।

এ শ্রেণীর লোক এ দাবী করে যে, রাসূল সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন এবং রাসূলের সাক্ষর জ্ঞান থাকা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। এ কথা যারা বলেন, তারা চরম দুঃসাহস প্রদর্শন করেন। কেননা, পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ই ঘোষণা দিয়েছে, তিনি নিরক্ষর ছিলেন এবং এই নিরক্ষরতাই তাঁর নবুয়্যতের এবং কোরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার একটি শক্তিশালী প্রমাণ। রাসূল অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন, এর স্বপক্ষে কিছু সংখ্যক লোক, হাদীস থেকে প্রমাণও পেশ করে থাকে। অথচ যেসব হাদীসের ভিত্তিতে রাসূলের অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া প্রমাণ করা হয়েছে, সেসব হাদীস–হাদীস হিসাবে যোগ্য হওয়ার প্রথম মানদন্ডেই পরিত্যক্ত বলে গণ্য হয়। কারণ কোরআনের বর্ণনার বিপরীত কথাকে হাদীস বলে গ্রহণ করা যাবে না।

একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হোদাইবিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার পর যখন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা হবে, তখন মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ সংযোজন করতে প্রতিপক্ষ প্রবলভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। অবশেষে আল্লাহর নবী চুক্তির লেখক হযরত আলী (রাঃ) কে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন, 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি কেটে দেন। তিনি 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি নিজের হাতে কেটে দিতে অস্বীকার করলে আল্লাহর রাসূল স্বয়ং নিজের হাতে কলম নিয়ে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি কেটে দিয়ে সেস্থলে 'মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ' অর্থাৎ নিজের নামটি লেখেন। এ হাদীসটি বোখারী ও মুসলিম শরীফে ভাষা, বর্ণনা ও শব্দের পার্থক্যসহ বেশ কয়েক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব হাদীস পাঠ করে অনেকে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, নবী করীম (সাঃ) লিখা পড়া জানতেন না। তিনি ছিলেন উম্মী নবী। অতএব নিজের নাম তিনি কিভাবে লেখলেন এবং কিভাবে এটা সম্ভব হলো? এ সম্পর্কে আল্লামা শিবলী নোমানী (রাহ) ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, 'লেখা পড়ার কাজ কর্ম যখন দৈনন্দিন জীবন ধারার একটা অংশ হয়ে দাঁড়ায়, তখন লেখা পড়া না জানা একজন মানুষ অন্যের লেখা দেখে নিজের নামের অক্ষর বিন্যাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, নিজের নাম কোন্ কোন্ অক্ষরে লেখা যায়, এ সম্পর্কে সেই অক্ষরের সাথে পরিচিত হওয়া অসম্ভবের কিছুই নয়।'

প্রকৃত ব্যাপার ছিল এটাই। আল্লাহর রাসূল ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে প্রতি নিয়ত তাঁকে লেখার সাথে পরিচিত হতে হয়েছে। বর্তমানেও তিনি অনেকের সাথে লিখিত সন্ধি করেছেন, এ সমস্ত লেখার সাথে তাঁকে পরিচিত হতে হয়েছে। প্রতিটি কাজই লিখিতভাবে হয়েছে। সুতরাং লেখালেখির পরিবেশে থেকে বিভিন্ন অক্ষরের সাথে পরিচিত হওয়া একজন নিরক্ষর লোকের পক্ষে অসম্ভব নয়। নবী করীম (সাঃ) হয়ত এভাবেই নিজ নামে ব্যবহৃত বর্ণের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। অথবা সেটা ছিল তাঁর শত সহস্র মু'জিযার একটি।

কোরআন অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য

পৃথিবীতে মানুষ পশুসুলভ জীবন-যাপন করতে পারে না। মানুষের জন্য প্রয়োজন হয় তার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবন পরিচালনার রীতিনীতি। জীবনের এসব দিক পরিচালিত করার জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া হয় বিশেষ কোন চিন্তাদর্শ বা মতবাদকে। যে মতাদর্শকে মানুষ অনুসরণ করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সে মতবাদ ত্রুটিপূর্ণ হলে মানুষ নিশ্চিত ধ্বংস গহ্বরের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে থাকে। মানুষের গোটা জীবন থেকে শান্তি ও স্বস্তি তিরোহিত হয়। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই মানুষের জন্য নির্দিষ্ট একটি আদর্শের প্রয়োজন হয়। মানুষ যে কোন কাজের মুখোমুখি হলেই তার সামনে প্রথম যে সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়, তাহলো সে কোন নিয়মে তার সামনে উপস্থিত কর্মটি সম্পাদন করবে। কে তাকে নিয়ম পদ্ধতি শিখিয়ে দেবে। এ থেকে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই নিয়মের মুখাপেক্ষী। এখন এই নিয়ম বা আদর্শ কে রচনা করবে অথবা কে এই আদর্শ দান করবে—এই প্রশ্ন মানুষের সামনে এসে উপস্থিত হয়।

প্রথম মানব হযরত আদমকে যখন এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হলো, তখন তাঁর মনে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, তিনি কোন আদর্শ অনুসরণ করে এই পৃথিবীতে জীবন-যাপন করবেন। বিষয়টি তাঁকে অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। তাঁর এই সমস্যার সমাধান আল্লাহ তা'য়ালা দিয়ে দিলেন—

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

আমার পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের কাছে পৌছবে, যারা আমার সেই বিধান অনুসরণ করবে, তাদের জন্য ভয়ভীতি এবং চিন্তার কোন কারণ অবশিষ্ট থাকবে না। (সূরা বাকারা-৩৮)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ কথা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষের জন্য যাবতীয় নিয়ম-পদ্ধতি ও আদর্শ বা জীবন পরিচালনার জন্য যে বিধান প্রয়োজন, তা তিনিই দান করবেন। মানব জীবনের এ জটিল বিষয়টি আল্লাহ কোন মানুষের হাতে সোপর্দ করেননি, স্বয়ং তিনিই এ বিষয়টি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। প্রশ্ন আসতে পারে মানুষের জীবন বিধান দেয়ার বিষয়টি কেন তিনি নিজের এখ্তিয়ারে রাখলেন এবং এ দায়িত্ব স্বয়ং মানুষের ওপরে অর্পণ করলেন না কেন?

এর জবাব হচ্ছে, মানুষ নিজেকে যতই বুদ্ধিমান, যোগ্যতা সম্পন্ন ও যাবতীয় জ্ঞানের অধিকারী বলে ধারণা করুক না কেন–প্রকৃত পক্ষে মানুষ চরম অসহায়, অক্ষম এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী। মানুষের অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে পূঁজি করে মানুষের পক্ষে ভারসাম্যমূলক ও ইনসাফপূর্ণ কোন জীবন বিধান রচনা করা সম্ভব নয় বিধায় স্বয়ং আল্লাহ এ দায়িত্ব কোন মানুষের ওপর অর্পণ না করে নিজের এখ্তিয়ারে রেখেছেন। কেননা, এ পৃথিবীতে অসংখ্য বাঁকা পথের অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক নিয়ম-নীতি ও আদর্শের অস্তিত্ব রয়েছে। যা অনুসরণ করলে মানুষ নিশ্চিত ধ্বংস গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। মানুষ যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংসের অতল তলদেশে তলিয়ে না যায়, এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ-

আর আল্লাহরই দায়িত্বে রয়েছে সকল পথপ্রদর্শন, যখন বাঁকা চোরা পথও অনেক রয়েছে। (সূরা নাহ্ল)

পথপ্রদর্শনের এই দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা কোন নবী-রাসূলের ওপরেও অর্পণ করেননি। তিনি নবী ও রাসূল প্রেরণ করে তাঁদেরকে যে পথ ও আদর্শের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতে নির্দেশ দান করেছেন, তাঁরা তাঁদের ওপরে অর্পিত দায়িত্ব সর্বশক্তি নিয়োগ করে পালন করেছেন। সর্বশেষ এ দায়িত্ব পালন করেছেন মুহাম্মাদুর (সাঃ)। তাঁর ওপরে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে এ কোরআনকে মানব জাতির জন্য জীবন বিধান হিসাবে মনোনীত করেছেন। এক কথায় মানব জাতির জীবন বিধান হিসাবে এই কোরআনকে অবতীর্ণ করে বলা হয়েছে–

كِتَابٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَبِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ-اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ-

এটা একটি কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। তোমার হৃদয়ে এর জন্য যেন কোন ধরনের কুণ্ঠা না জাগে। এটা অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্যে এই যে, এর মাধ্যমে তুমি (অমান্যকারীদেরকে) ভীতি প্রদর্শন করবে এবং বিশ্বাসীদের জন্য এটা হবে স্মরণ ও স্মারক। (হে মানবমন্ডলী) তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা-ই অনুসরণ করো এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোন পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ ও অনুগমন করো না। (সূরা আল-আ'রাফ-২-৩)

অর্থাৎ কোরআন যাঁর ওপরে অবতীর্ণ করা হলো, তাঁকে এটা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হলো, এটা মানব জাতির জীবন বিধান এবং উদ্দেশ্যেই এটা অবতীর্ণ করা হয়েছে। কোন ধরনের ভীতি ও কুণ্ঠা ব্যতীতই এই বিধান প্রচার ও প্রসার করতে থাকো। যারা এটা অস্বীকার করবে, তারা তোমার সাথে কি ধরনের ব্যবহার করবে, এ চিন্তা কারার কোন প্রয়োজন নেই। এটা অবতীর্ণ করার কারণ হলো, ভীতি প্রদর্শন করা। অর্থাৎ রাসূল যেদিকে মানবজাতিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, সে আহ্বানকে উপেক্ষা করার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সজাগ করে দেয়া এবং অচেতন ও উদাসীন লোকদেরকে সচকিত ও সতর্ক করা। আর অবিশ্বাসীদেরে যখন সতর্ক করা হয়, তখন বিশ্বাসীগণ স্বাভাবিকভাবেই অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করেন।

অমানিশার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল মানব জাতি। এই অন্ধকার থেকে মানব মন্ডলীকে আলোর দিকে আনার লক্ষ্যেই আল্লাহ্ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে রাসূল প্রেরণ করে তাঁকে কিতাব দান করেছেন এবং কিতাব কেন অবতীর্ণ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হয়েছে-

كِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ-

(হে রাসূল!) এটা একটি কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি মানুষদেরকে অমানিশার নিচ্ছিদ্র অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসো।

অর্থাৎ মানুষকে বাঁকাচোরা, ক্ষতিকর, শয়তানি পথ থেকে কল্যাণের পথের দিকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। মানুষ জানে না তাঁর প্রকৃত মালিক কে। কে তার প্রতিপালক। কোন শক্তির দাসত্ব তাকে করতে হবে এবং কেন করতে হবে। কার আইন-কানুন সে পৃথিবীতে অনুসরণ করবে এবং কেন করবে। এসব

বিষয় পরিপূর্ণরূপে অবগত করানোর লক্ষ্যেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْابِهٖ وَلِيَعْلَمُوْا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّ كَّرَاُولُوا الْاَلْبَابِ–

প্রকৃত পক্ষে এটা (কোরআন) একটি পয়গাম সমস্ত মানুষের জন্য আর এটা প্রেরণ করা হয়েছে এ জন্য যে, এই কিতাবের মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হবে এবং তারা এ কথা অবগত হবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ্ শুধু একজন আর জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে সচেতন হবে। (সূরা ইবরাহীম-৫২)

মানুষ কার দাসত্ব করবে এবং কে মানুষের জন্য জীবন বিধান রচনা করে দেবে, এ বিষয় নিয়ে মানুষের ভেতরে চরম মতপার্থক্য অতীতে যেমন চলেছে, বর্তমান কালেও চলছে। এক শ্রেণীর মানুষ নিজের মন-মস্তিষ্ক প্রসূত আইন-কানুন মানব গোষ্ঠীকে অনুসরণ করার কথা বলছে। রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে কিছু সংখ্যক মানুষ আল্লাহর দেয়া বিধানের বিপরীত আইন-কানুন দিয়ে দেশ ও জাতিকে পরিচালিত করছে। আইন প্রণয়নের অধিকার কে সংরক্ষণ করেন এবং কেন করেন, এ বিতর্কের সমাধানের লক্ষ্যেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ কথা সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছে যে, আইন রচনা করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালা সংরক্ষণ করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَااَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ–وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ–

আমি তোমার প্রতি এ কিতাব এ জন্য অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি এ মতভেদের তাৎপর্য এদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরো। যার মধ্যে এরা ডুবে রয়েছে। এ কিতাব পথনির্দেশ ও রহমত হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে তাদের জন্য যারা একে মেনে নেবে। (সূরা আন্ নাহ্ল-৬৪)

কল্পনা, ভাব-বিলাস, অন্ধানুকরণ ও কুসংস্কারের এবং জড়বাদ আর বস্তুবাদের ভিত্তিতে যে অসংখ্য মতবাদ, ধর্মমত রচনা করা হয়েছে এবং মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়েছে, এসবের অবসান কল্পে একটি মহাসত্যের স্থায়ী বুনিয়াদের ওপরে যেন মানব গোষ্ঠী দাঁড়াতে সক্ষম হয়, এ জন্য এই কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। যারা এ কোরআনকে স্বীকৃতি দিয়ে অনুসরণ করবে এবং আনুগত্যের পথ অবলম্বন করবে, এ কিতাব জীবনের প্রতিটি বিভাগ ও ক্ষেত্রে তাদেরকে পথপ্রদর্শন করবে। একে অনুসরণ করে চলার কারণে তাদের ওপরে মহান আল্লাহ্ রহমত অবতীর্ণ করবেন।

এই কোরআন তাদেরকে এ সুসংবাদ প্রদান করে যে, আদালতে আখিরাতে তারা সফলতা অর্জন করবে। আর যারা এ কিতাব অনুসরণ করবে না, তারা সমস্ত দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কিতাব আল্লাহর অনুগত বান্দাদেরকে সুসংবাদ ও রহমতের সংবাদ এবং সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত স্পষ্ট জ্ঞান দেয়ার জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ–

আমি এ কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যা সব জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে এবং যা সঠিক পথনির্দেশনা, রহমত ও সুসংবাদ বহন করে তাদের জন্য যারা আনুগত্যের মস্তক নত করে দিয়েছে। (সূরা আন্ নাহ্ল-৮৯)

অজ্ঞ, নির্বোধ, অসচেতন, উদাসীন, অমনোযোগী, অসতর্ক, বিদ্রোহী মানুষদেরকে সজাগ সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে এ কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا–

আমি এ কোরআনে নানাভাবে মানুষদেরকে বুঝিয়েছি যেন তারা সজাগ হয়।

এই কোরআনে এমন কোন কথা নেই যা বুঝতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আবার সত্য ও ন্যায়ের সরল রেখা থেকে বিচ্যুত হতে পারে এমন কোন কথাও এ কোরআনে নেই। এ কোরআন স্পষ্ট এবং সোজা কথা বলার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা কাহ্ফ-এ বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا–

প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এর মধ্যে কোন বক্রতা রাখেননি। একেবারে সোজা কথা বলার কিতাব।

যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করে তাদের জন্য সুসংবাদ এবং যারা মানুষের বানানো বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করে, তাদের ঘৃণ্য পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করার লক্ষ্যে এ কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا–

(হে রাসূল!) এই বাণীকে আমি সহজ করে তোমার ভাষায় এ জন্য অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পারো এবং হঠকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারো।

রাসূল এবং তাঁর অনুসরণকারীদের ওপরে এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি যে, যারা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়–তাদের ওপরে শক্তি প্রয়োগ করে তা অনুসরণ করাতে হবে। যারা ঈমান আনবে না, শক্তির মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করাতে হবে। এ দায়িত্ব রাসূলের বা তাঁর অনুসারীদের নয়। কোন অসাধ্য সাধন করার জন্য রাসূলকে প্রেরণ করা হয়নি অথবা এমন কোন দায়িত্ব তাঁর ওপরে অর্পণ করে তাঁকে বিপদগ্রস্ত করা হয়নি। যারা ঈমান আনতে আগ্রহী নয়, ইসলামী আন্দোলন যারা জেনে বুঝে পছন্দ করে না, তাদেরকে সত্য পথে নিয়ে আসার জন্য অযথা সময় নষ্ট করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা কারো ওপরে অর্পণ করেননি। আবার এ কোরআন এ জন্যও প্রেরণ করেননি যে, এই কিতাব যাঁর ওপরে অবতীর্ণ করা হলো তিনি এবং এ কিতাবের অনুসারীগণ পৃথিবীতে অবহেলিত ও লাঞ্ছনাময় জীবন-যাপন করবে। মহান আল্লাহ বলেন–

طه-مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى-

আমি এ কোরআন তোমার প্রতি এ জন্য অবতীর্ণ করিনি যে, তুমি লাঞ্ছিত থাকবে।

ভুল করা মানুষের স্বভাব–মানুষ ভুল করবেই। সে ভুল করে ভ্রান্ত পথ ও মত অনুসরণ করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আবার অসচেতনতার কারণে মানুষ ধ্বংস গহ্বরের দিকে এগিয়ে যায়। মানষের এ অবস্থা থেকে তাকে সচেতন করার লক্ষ্যে এ কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا-

(আর হে রাসূল !) এভাবে আমি একে আরবী কোরআন বানিয়ে অবতীর্ণ করেছি এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সতর্কবাণী করেছি হয়তো এরা বক্রতা থেকে নিরাপদ থাকবে এবং তাদের মধ্যে সচেতনতার নিদর্শন দেখা দেবে। (ত্বাহা-১১৩)

মানুষকে সতর্ক করা এবং সৎপথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ، اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ، بَلْ هُوَالْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ-

এ কিতাবটি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। এরা কি বলে, এ ব্যক্তি নিজেই এটি রচনা করে নিয়েছে? না, বরং এটি সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো এমন একটি জাতিকে যাদের কাছে তোমার পূর্বে

কোন সতর্ককারী আগমন করেনি, হয়তো তারা নিজেদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবে। (সূরা সাজ্দাহ্-২-৩)

যারা আল্লাহ্র একত্ববাদকে অস্বীকার করে; পরকালীন জীবনকে যারা খেল-তামাসার বিষয় বলে মনে করে; আল্লাহর ফেরেশ্তা, জান্নাত-জাহান্নম ও আদালতে আখিরাতে হিসাব গ্রহণের বিষয়কে যারা রূপকথার গল্প এবং কবিদের কল্পনা বলে হেসে উড়য়ে দেয়, তাদের এসব ধারণা খন্ডন করে মহাসত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোরআনকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُ، اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ، لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ –

আমি (নবী)–কে কাব্য কথা শিক্ষা দেইনি এবং কাব্য চর্চা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। এ তো একটি উপদেশ এবং পরিষ্কার পঠনযোগ্য কিতাব, যাতে সে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতে পারে এবং অস্বীকারকারীদের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। (সূরা ইয়াছিন)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করে তাঁর সামনে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু একত্রিত করে সেসব বস্তু নিচয়ের নামসমূহ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারপর সেসব বস্তুর নাম ফেরেশ্তাদেরকে বলতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করে আল্লাহকে বলেছিলেন–

قَالُوْا سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَا–

সমস্ত দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত একমাত্র আপনিই, আমরা তো শুধু ততটুকুই অবগত আছি যতটুকু আপনি আমাদের অবগত করেছেন। (সূরা বাকারা-৩২)

কিন্তু আল্লাহর প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) ঠিকই সমস্ত বস্তুর নাম ও তার গুণাগুণসহ বর্ণনা করেছিলেন। বিষয়টি কেমন ছিল তা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যাক। ধরা যাক, সে সময় ফেরেশতার সংখ্যা ছিল পাঁচ শত কোটি। তাদের শরীরের আয়তন যদি বর্তমান মানুষের শরীরের আয়তনের মত হয়ে থাকে, তাহলে তাদের সহজভাবে বসার জন্য যদি একবর্গ গজ করে স্থানেরও প্রয়োজন হতো, তবে তাদের বসার জন্য পাঁচশত কোটি বর্গ গজ স্থানের প্রয়োজন হতো। অর্থাৎ ফেরেশতাদের বসার জন্য প্রায় দশলক্ষ একরেরও বেশী জমির প্রয়োজন হতো। তার মানে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির মত বিরাট একটি মাঠের প্রয়োজন হতো। আমরা পৃথিবীতে যদি এই ধরনের কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করি, তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে? প্রথমে সাহারা মরুভূমিতে বিরাট একটি মঞ্চ প্রস্তুত করতে হবে। তারপর তার ভেতরে বিশাল আকৃতির একটি গ্যালারী প্রস্তুত করতে হবে। এরপর সেই গ্যালারীতে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর অংশ সাজিয়ে পৃথিবীর

সমস্ত মানুষকে সেখানে উপস্থিত করে যদি প্রশ্ন করা হয়, কে পারবে এই সমস্ত বস্তুর নাম গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি বলতে। তাহলে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে কল্পনা করা যায়?

সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে সমস্ত বস্তুর নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁরা তা বলতে পারেনি এবং আদম (আঃ) সেসব বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি বলেছিলেন। এ থেকে আমরা ধারণা করতে পারি, এই ধরনের একটি বিশাল কিছুর আয়োজন মহান আল্লাহ্ তাঁর কুদরতি ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করেছিলেন। এবার ধারণা করা যাক, পৃথিবীতে যদি এই ধরনের কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তাহলে তার নাম কি দেয়া হবে? ধরে নেয়া যাক, পদার্থ বিজ্ঞান মেলা বা মহাপদার্থ বিজ্ঞান মেলা একটা কিছু নাম দেয়া হলো।

এখন কোন মানুষকে যদি সেখানের সমস্ত বস্তুর নাম, ব্যবহার পদ্ধতি ও গুণাগুণ বলতে বলা হয়, কোন মানুষ তা বলতে পারবে? মানুষের ব্যবস্থায় এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতের কাছে এটা কোন বিষয়ই নয়। তিনি তা মুহূর্তের ভেতরেই সম্পন্ন করেছিলেন। আবার মনে করা যাক, মানুষের পক্ষে এমন একটি বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হলো। তারপর সেখানে কোন মানুষকে যদি প্রশ্ন করা হয়, এ সমস্ত জিনিষের নাম, ব্যবহার পদ্ধতি ও গুণাগুণ বর্ণনা করতে হবে। কোন মানুষের পক্ষে কি তা বর্ণনা করা সম্ভব? পদার্থ বিজ্ঞানে যারা একাধিক নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন, তারাও কি বলতে পারবেন? কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতে হযরত আদম (আঃ) তা পেরেছিলেন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আদমকে যদি আমরা বলি, বস্তু বিজ্ঞানী, প্রাণী বিজ্ঞানী, রসায়ন বিজ্ঞানী পদার্থ বিজ্ঞানী এক কথায় সমস্ত বিষয়ে তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন, তাহলে কি তা ভুল হবে? সে বিজ্ঞানীর শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রথম ছাত্র ছিলেন হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম এবং আল্লাহ তায়ালা হলেন তাঁর শিক্ষক।

হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁকে বিজ্ঞান শিক্ষা দান করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ। সৃষ্টির শুরুতেই বিজ্ঞান, সৃষ্টির প্রথম মানুষ একজন বিজ্ঞানী। কি ধরনের বিজ্ঞানী তা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। হযরত আদম নবী ছিলেন, রাসূল ছিলেন, পৃথিবীতে আসার পূর্বে তাঁকে নবুয়্যত দান করা হয়েছিল না পরে দান করা হয়েছিল, সাপ ময়ুরের অস্তিত্ব সেখানে ছিল কিনা, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ গবেষণা করেন, বিতর্ক করেন। কিন্তু আফসোস, তিনি যে বিজ্ঞানী ছিলেন, তা নিয়ে গবেষণা করেন না। এ সম্পর্কে গবেষণা তো করেনই না, যারা বিজ্ঞান গবেষণা ও চর্চা করেন তাদেরকে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করেন এবং তাদের প্রতি নির্দয় মন্তব্য করেন।

এই পৃথিবীতে আল্লাহ যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন তা সবই মানুষের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য। পৃথিবীর বস্তু নিয়ে মানুষ গবেষণা করে তা মানব জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করবে। এসব বিষয়ে মানুষ যেন চিন্তা-গবেষণা করে সে লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কোরআনে

উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

كِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ-

এটি একটি অত্যন্ত বরকতপূর্ণ কিতাব, যা (হে রাসূল!) আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন এরা তার আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে এবং জ্ঞানী ও চিন্তাশীলরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। (সূরা সা-দ–২৯)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনকে মানব জাতির জন্য বরকতপূর্ণ কিতাব বলেছেন। বরকতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, কল্যাণ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি। এই কিতাবকে বরকতপূর্ণ কিতাব বলার কারণ হলো, এ কিতাব অসংখ্য বাঁকা পথের ভেতর থেকে সত্য-সহজ-সরল পথ কোনটি তা মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে। এ কিতাব যারা সঠিকভাবে অনুসরণ করে, তাদেরকে সারা পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন করে দেয়। মানুষের জীবন থেকে অশান্তির শেষ চিহ্নটুকুও দূরীভূত করে দেয়। মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সর্বোত্তম বিধান দান করে। এ কিতাবে আলোচিত বিষয়সমূহ নিয়ে গবেষণা করে মানুষ চরম উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হয়। এ জন্য এ কিতাবকে বরকতপূর্ণ বলা হয়েছে এবং চিন্তা ও গবেষণায় উৎসাহিত করার জন্য এ কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে।

এই কোরআন অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন একমাত্র আল্লাহর গোলাম হয়ে যায়, তারা যেন তাঁরই গোলামী করে এবং গোলামী যেন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। মানুষ নামাজ, রোজা ও হজ্জ পালনের সময়টুকু আল্লাহর গোলামী করবে, আর জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে অন্য মানুষের রচিত বিধান অনুসারে নিজেকে পরিচালিত করবে, এ ধরনের দ্বৈত গোলামী করার অবকাশ ইসলামে নেই। মানুষকে এ উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত করার জন্য পৃথিবীতে কোরআন এসেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ-

(হে রাসূল!) আমি তোমার কাছে হকসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। তাই তুমি একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো। (সূরা আয যুমার-২)

মূলতঃ মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে মহান আল্লাহর দাসত্ব করার লক্ষ্যে। এ পৃথিবীতে যা কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সবই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা হয়েছে আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা কেবলমাত্র রাব্বুল আলামীনের গোলামী করবে। মানুষকে এ অবকাশ দেয়া হয়নি যে, সে আল্লাহর সৃষ্টি যাবতীয় নিয়ামত ভোগ করবে আর জীবন পরিচালিত করবে নিজের অথবা অন্যের খেয়াল-খুশী মতো।

কোরআন পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হবার কারণ

নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি যখন কোরআন অবতীর্ণ করা হয় তখন অবিশ্বাসীরা কোরআনের সত্যতার ব্যাপারে যতগুলো যুক্তি প্রদর্শন করতো, তার ভেতরে এই যুক্তিটি ছিল অত্যন্ত প্রবল যে, তুমি বলছো মানুষকে হেদায়াত করার জন্য আল্লাহ তোমার কাছে কোরআন অবতীর্ণ করে থাকেন। মানুষকে হেদায়াত করার আল্লাহর যদি এতই প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে তিনি কেন কোরআনকে পরিপূর্ণ আকারে একটি গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থবদ্ধ করে পাঠিয়ে দিচ্ছেন না? এভাবে বিরতি দিয়ে অল্প অল্প করে কেন অবতীর্ণ করছেন? তাহলে আল্লাহকে কি মানুষের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সময় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়? অথবা বিরোধিদেরকে যা শুনানো হবে এ সম্পর্কে চিন্তা করে কথা বলতে হয়?

আসলে তুমি যা বলছো, এসব আল্লাহর বাণী মোটেও নয়। যদি এটা আল্লাহর বাণীই হতো, তাহলে তিনি পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থ প্রেরণ করতেন। তুমি যেভাবেই সক্ষম হয়ে থাকো না কেন, সময় নিয়ে সাধনা করে স্বয়ং তুমি অথবা তোমার কোন অদৃশ্য সহযোগী এ কোরআন রচনা করে আমাদেরকে শুনাচ্ছো। অবিশ্বাসীদের এসব অবান্তর কথার জবাব এবং সন্দেহ-সংশয়ের অবসান ঘটানোর জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا-

আর কোরআনকে আমি সামান্য সামান্য করে অবতীর্ণ করেছি। যেন তুমি বিরতি দিয়ে তা মানুষদেরকে শুনিয়ে দাও এবং তাকে আমি (বিভিন্ন সময়) পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল-১০৬)

ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী আল্লাহর রাসূলকে অভিযুক্ত করতো যে, স্বয়ং তিনি এ কোরআন রচনা করেছেন। তাদের এ ভিত্তিহীন কথার জবাবও আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আদ দাহারের ২৩ আয়াতে এভাবে দিয়েছেন–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا-

হে নবী ! আমিই তোমার প্রতি এ কোরআন অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি।

কোরআনের সত্যতার ব্যাপারে তারা প্রশ্ন তুলে বলতো, যদি এটা আল্লাহর কিতাবই হয়ে থাকে, তাহলে সমগ্র কিতাবটি একই সময়ে কেন অবতীর্ণ হচ্ছে না ? নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি চিন্তা-গবেষণা করে অথবা অন্য কারো কাছ থেকে জেনে নিয়ে এবং নানা ধরনের গ্রন্থ থেকে নকল করে এনে আমাদেরকে তা শুনাচ্ছে। আল্লাহ মানুষকে বর্তমান ও ভবিষ্যতে কি বলবেন, তা তো তিনি অবগত আছেন। এটা যদি আল্লাহর বাণী হতো, তাহলে তিনি তা একত্রে অবতীর্ণ করতেন। এই যে চিন্তা-ভাবনা করে বিরতি দিয়ে নতুন নতুন বিষয় আমাদের সামনে পরিবেশন করা হচ্ছে–এটাই হলো বড় প্রমাণ যে এটা আল্লাহর বাণী নয়। তাঁর ওপরে কোন ওহী আসছে না। তিনি স্বয়ং রচনা করছেন অথবা কেউ তাকে

সরবরাহ করছে। মূর্খতা ও অজ্ঞতাপ্রসূত এসব কথার জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً، كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلاً-

অস্বীকারকারীরা বলে, এ ব্যক্তির কাছে সমগ্র কোরআন একত্রে কেন অবতীর্ণ করা হলো না? হ্যাঁ, এমন করা হয়েছে এ জন্য যে, যেন আমি একে ভালোভাবে তোমার মনে গেঁথে দিতে থাকি এবং (এ লক্ষ্যে) একে একটি বিশেষ ক্রমধারানুযায়ী পৃথক পৃথক অংশে সজ্জিত করেছি। (সূরা আল ফুরকান–৩২)

এ কথা মনে রাখতে হবে, নবী ছিলেন স্বয়ং নিরক্ষর। যাদের ভেতরে কোরআন অবতীর্ণ হলো তারাও ছিলেন অক্ষর জ্ঞানহীন জনগোষ্ঠী। নিরক্ষর এই জনগোষ্ঠীকে দিয়েই আল্লাহ পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয় বিরাট একটি আদর্শিক বিপ্লব ঘটিয়ে ছিলেন যে বিপ্লবের প্রভাব কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এই নিরক্ষর মানুষগুলোই পৃথিবীর পরিবেশ পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং নেতৃত্ব ছিল তাঁদেরই হাতে। আর কোরআন দিয়ে তাঁরা তা সম্ভব করেছিলেন। সুতরাং নিরক্ষর সেই মানুষগুলোর মাধ্যমে নিকট ভবিষ্যতে যে কিতাব দিয়ে বিপ্লব ঘটানো হবে, সেই কিতাব একত্রে তাঁদের কাছে প্রেরণ করা হলে, তাঁরা তা স্মৃতির কোষাগারে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হতেন না। স্মৃতির ভান্ডারে আল্লাহর কোরআন যেন হুবহু সংরক্ষিত হয়, এ জন্য তা বিরতি দিয়ে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

বর্তমান যুগের ন্যায় সে যুগে প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের কোন আধুনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বর্তমানের কোন আন্দোলনের দিক নির্দেশনা আন্দোলনের কর্মীদের কাছে লিখিত আকারে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সে যুগে কোন নির্দেশ পৌঁছানো হতো মৌখিক আকারে। যে লোকগুলোকে বাছাই করে সর্বাত্মক বিপ্লব ঘটানোর উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছিলো, তাদের সামনে একত্রে আদর্শ পেশ করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত ছিল না। এ জন্য পূর্বে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তা অন্তরে ধারণ ও পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করিয়ে এবং আন্দোলনের কর্মীদের তা পালনের অভ্যাসে পরিণত করিয়ে পরবর্তী নির্দেশনামা অবতীর্ণ করা হচ্ছিলো। এ পদ্ধতিকেই বর্তমানে বলা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং তখন তাই অবলম্বন করা হয়েছিল।

যে কোন আদর্শের ওপরে কোন ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করলে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে সময়ের প্রয়োজন হয়। রাতারাতি কোন ব্যক্তির চরিত্রে আমূল পরিবর্তন যেমন ঘটানো যায় না এবং তা কোনক্রমে সম্ভবও নয়। যাঁদেরকে সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে কোরআন দিয়ে গড়া হচ্ছিলো এবং সমগ্র মানব জাতির সর্বকালের শিক্ষক হিসাবে যাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছিল, সেই সাহাবায়ে কেরামও মানুষ ছিলেন। তাঁরা কোন সমাজের ছিলেন এবং সে সমাজ কোন স্তরে অবস্থান করছিল, ইতিহাসের পাঠক মাত্রই তা অবগত রয়েছেন। সেই মানুষগুলোকে পরিপূর্ণভাবে গড়া একদিনে সম্ভব

ছিল না এবং তাঁরা যেন কোরআনের শিক্ষাসমূহ ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন, এ জন্য অল্প অল্প করে কোরআন অবতীর্ণ করে তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিলো।

আল্লাহর কোরআন মানুষের রচনা করা শোষণমূলক কোন আদর্শের মতো মানব জাতির ওপরে সমগ্র শক্তিতে একই সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে না। এ কোরআন সর্বপ্রথমে মানুষের চিন্তার জগতে সর্বাত্মক বিপ্লব সংঘটিত করে। আর এ বিপ্লবও একদিনে সংঘটিত হয় না। তা পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে হতে থাকে। কেননা মানুষের চিন্তা-চেতনা নামক জগতের গঠন প্রণালী অত্যন্ত জটিল এবং বিচিত্র ধরনের। শক্তি প্রয়োগ করে মানুষের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসবোধের পরিবর্তন সাধন করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এ জন্য কোরআন যে জীবন পদ্ধতি পেশ করে, তার ওপরে মানুষের মন স্থির করার প্রয়োজন ছিল।

এ জন্য নির্দেশ ও বিধানসমূহ পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করাটাই ছিল বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি। কোরআন সে পদ্ধতিতেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ পদ্ধতি অবলম্বন না করে যদি সমস্ত আইন-কানুন এবং গোটা জীবন ব্যবস্থা একত্রে মানুষের সামনে পেশ করে তা প্রতিষ্ঠিত করার ও অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হতো, তাহলে মানুষের ভেতরে যেমন বিদ্রোহের প্রবণতা দেখা দিত তেমনি তার চেতনার জগতে বিরাজ করতো এক মহাবিশৃংখলা।

আইন অনুসরণকারীদের জন্য সমস্ত বিধান তার ধারা-উপধারাসহ একত্রে পেশ করলে তা অনুসরণের ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখা দেবেই। এ জন্য প্রতিটি আইন উপযুক্ত পরিবেশে ও যথাসময়ে জারি করা প্রয়োজন। এভাবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয় এবং আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা অত্যন্ত সহজ হয় এবং এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্যই পবিত্র কোরআন দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নানা পর্যায়ে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

দ্বীনি আন্দোলন কোন ফুল শয্যার নাম নয়, এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়-কন্টকাকীর্ণ। এ আন্দোলন সফল হওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় সীমাও নেই। এই আন্দোলনে যাঁরা জড়িত থাকেন, তাঁদেরকে অসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, অকল্পনীয় কোরবানী দিতে হয়। বিরোধী শক্তির সাথে তাঁদেরকে প্রতি পদক্ষেপে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হয়। ক্ষেত্র বিশেষে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রাণ দান করতে হয়। আন্দোলন সফল হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত এসব পরিস্থিতি শুধুমাত্র একবারই যদি সৃষ্টি হতো, তাহলে নেতা-কর্মীদের মনে সাহস সঞ্চার করার মতো উপদেশ, দৃষ্টান্ত, উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক একটি কিতাব তাদের কাছে পেশ করলেই চলতো। পক্ষান্তরে, এই আন্দোলন করতে গিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যে ধরনের পরিস্থিতি পরিবেশের মোকাবেলা করতে হবে, তা সবই রাসূলের সেই তেইশ বছরে প্রকাশিত হয়েছিল-যে তেইশ বছর তিনি আন্দোলন করেছিলেন। এ জন্য দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী এ কোরআন আল্লাহর নবীর ওপরে অবতীর্ণ হয়েছে।

আন্দোলনের কর্মীগণ যখন বিরোধী পক্ষের সাথে সংঘাতে জড়িত থাকে, তখন তাদের মনে সাহস সঞ্চার করা হয় আন্দোলনের পরিচালকদের পক্ষ থেকে। প্রথম অবস্থায় কর্মীগণ মনে করে সে প্রবল এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মোকাবেলা করছে। এ অবস্থায় যদি

তাদের কাছে মাঝে মাঝে পথনির্দেশ আসতে থাকে তখন তাদের মনে এ ধারণা জাগ্রত থাকে যে, যাঁর নির্দেশে এবং সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সে জীবন বাজি রেখে আন্দোলন করছে, তিনি নীরবে বসে না থেকে তাদের ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। তারা যে প্রক্রিয়ায় আন্দোলনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করছেন এবং তাদের সমস্যা ও সংকটে পথ প্রদর্শন করছেন। এ কাজে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে বলে বার বার ঘোষণা দান করছেন এবং তাদের সাথে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক স্থাপন করবেন বলে জানিয়ে দিচ্ছেন। এ প্রক্রিয়ায় আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের মনে বিপুল সাহস ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং সংখ্যায় অতি অল্প হলেও তাঁদের শক্তি হয় অপ্রতিরোধ্য। তাঁরা তখন তাঁদের অভিধান থেকে 'পরাজয়' শব্দটি মুছে ফেলে।

রাসূলের সময়ও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছিল। সাহাবাগণ ময়দানে প্রতিটি মুহূর্তে জিহাদে লিপ্ত থেকেছেন, অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং অবশেষে নিজের প্রাণ পর্যন্ত দান করেছেন। এ সময়ে তাঁদের মন-মানসিকতা যেসব কথা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে, আল্লাহ তা'য়ালা প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ওহীর মাধ্যমে তাই শুনিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ফোরকানে বলেছেন, 'কোরআনকে একটি বিশেষ ক্রমধারানুযায়ী পৃথক পৃথক অংশে সজ্জিত করেছি।' কেন এমন করেছেন, সে জবাবও আল্লাহ দিয়েছেন-

وَلَايَاتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّاجِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا-

আর (এর মধ্যে এ কল্যাণকর উদ্দেশ্যেও রয়েছে যে) যখনই তারা তোমার সামনে কোন অভিনব কথা (অথবা অদ্ভুত ধরনের প্রশ্ন) নিয়ে এসেছে তার সঠিক জবাব যথাসময়ে আমি তোমাকে দিয়েছি এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছি। (সূরা ফোরকান-৩৩)

কোরআন কেন পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে, তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত আরেকটি কারণ স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। এ কিতাব অবতীর্ণ করার কারণ এটা নয় যে, মানব জাতির জন্য জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ রচনা করবেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে গ্রন্থ প্রচারের লক্ষ্যে পৃথিবীতে নির্বাচিত করেছেন। প্রকৃত পক্ষে বিষয় যদি সেটাই হতো, তাহলে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি প্রণয়ন শেষ করেই তা নবীর হাতে উঠিয়ে দেয়ার দাবী যুক্তিযুক্ত হতো। আসলে বিষয়টি সেটা নয়। প্রকৃত বিষয় হলো, আল্লাহ তা'য়ালা শিরক, কুফর, মূর্খতা, অজ্ঞতা, অন্যায়, অসত্য ইত্যাদির মোকাবেলায় ঈমান, ইসলাম, আনুগত্য ও আল্লাহভীতির একটি আন্দোলন পরিচালনা করতে চান এবং এ লক্ষ্যেই তিনি মানুষের ভেতর থেকে একজন সর্বোৎকৃষ্ট মানুষকে নির্বাচিত করে তাঁকে নবুয়্যত দিয়ে আন্দোলনের আহ্বায়ক ও নেতা হিসাবে মানুষের সামনে প্রকাশ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর রাসূল ও রাসূলের সাথীদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন এবং আন্দোলন বিরোধিরা যখনই কোন আপত্তি বা সন্দেহ্ অথবা জটিলতা সৃষ্টি করবে তখনই তিনি তা দূরীভূত করে দেবেন এবং শত্রুপক্ষ কোন কথার ভুল অর্থ করবে তখনই আল্লাহ্ তার সঠিক ব্যাখ্যা জানিয়ে দেবেন। নবীর দীর্ঘ তেইশ বছরের দ্বীনি আন্দোলনের জীবনে এ ধরনের অসংখ্য বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে আর এসব অবস্থার মোকাবেলার জন্য যেসব ভাষণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর সমষ্টির নামই হলো আল কোরআন। কোরআন একটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের কিতাবের নাম। আর কোরআন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিও কোরআনের স্বভাব ও প্রকৃতিতে বিদ্যমান। আর সে স্বভাব হলো, কোরআনের আন্দোলনের সূচনা লগ্ন থেকে তার সূচনা করতে হবে। এ আন্দোলন সমাপ্তি পর্যন্ত যেভাবে অগ্রসর হতে থাকবে কোরআনও সাথে সাথে প্রয়োজন অনুসারে দিক নির্দেশনা দিতে থাকবে।

ওহীর সূচনা ও অবতীর্ণ হবার পদ্ধতি

রাসূলের ওপরে ওহীর সূচনা পূর্বে প্রায়ই তিনি নির্জনতা অবলম্বন করতেন। যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে তিনি চিন্তায় অস্থির থাকতেন, এসব সমস্যার সমাধান আল্লাহ্ তাকে ওহীর মাধ্যমে দান করবেন। সুতরাং ওহী নাজিলের সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নির্জনতা অবলম্বন ততই বৃদ্ধি পেতে থাকলো। তিনি মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে একটা পাহাড়ে চলে যেতেন। সে পর্বতের হেরা নামক গুহায় বিশেষ ইবাদাতে নিমগ্ন হয়ে পড়তেন। এ সময়ে তিনি সত্য এবং সুন্দর স্বপ্ন দেখতেন। তিনি এমন স্বপ্ন দেখতেন তা যেন মনে হত তিনি তা বাস্তবে দেখছেন। পর্বতের গুহায় তিনি ইবাদাতের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। বোখারী শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, হেরা গুহায় তিনি যে ইবাদাত করতেন তা ছিল চিন্তা গবেষণা ও উপদেশ গ্রহণ করা।

তিনি বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে যেতেন অথবা খাদিজা (রাঃ) স্বয়ং গিয়ে দিয়ে আসতেন বা লোক মারফত প্রেরণ করতেন। কোন সময় কয়েকদিনের খাবার তিনি একত্রে নিয়ে যেতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ যে সময়ে তাকে অনুগ্রহ করে মানব জাতির জন্য নবী নির্বাচিত করলেন তখন তিনি নবুয়্যতের একটা অংশ হিসাবে নির্ভুল স্বপ্ন দেখতেন। এ সময়ে মহান আল্লাহ তাঁকে নির্জন বাসের প্রতি গভীর আগ্রহী করে তোলেন। তখন তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা দিনের আলোর মতই বাস্তবে পরিণত হত। একাকী কোন নির্জন স্থান সে সময়ে তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আরেকটি বর্ণনায় দেখা যায়, নবুয়্যতের সূচনা লগ্নে তিনি বাইরে বের হলেই কোন নির্জন উপত্যকায় বা কোন নির্জন সমভূমিতে চলে যেতেন। সে সময়ে তিনি কোন জড়পদার্থের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেতেন, আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ !

এ কথা শোনার সাথে সাথে তিনি চমকে উঠে তাঁর চারদিকে তাকিয়ে সালাম দাতার সন্ধান করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর আশেপাশে গাছ পাথর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতেন না। এভাবেই সময় তখন অতিবাহিত হচ্ছিল। গবেষকদের ধারণা, তিনি যেন ওহী এবং হযরত জিবরাঈলকে ধারণ করতে সক্ষম হন, এ কারণেই নবুয়্যতের পূর্বে কিছুদিন মহান আল্লাহ এ অবস্থা সৃষ্টি করে তাঁর অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করছিলেন। হাদীস শরীফে দেখা যায়, যে সময়ে তিনি নির্জনতা অবলম্বন করতেন তখন তিনি প্রচুর দান করতেন। অভাবীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করতেন। বাড়িতে ফিরে আসার পথে কা'বাঘরে এসে তিনি সাতবার বা ততোধিক বার তাওয়াফ করতেন তারপর বাড়িতে যেতেন। এ সময়ে বিশ্বনবী যে সমস্ত স্বপ্ন দেখতেন তা শুধুমাত্র সে সময়ের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল না। এ ধরণের স্বপ্ন নবুয়্যত লাভের পরেও তিনি তাঁর জীবনে বহুবার দেখেছেন। হাদীসে কুদসী নামে যে হাদীসগুলো রয়েছে, তা অনেকই এ পর্যায়ভুক্ত। নবী ও রাসূলগণ যে স্বপ্ন দেখেন তা যে সম্পূর্ণরূপে সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ–

বস্তুত আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে প্রকৃতই সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যা সম্পূর্ণরূপে সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। (সূরা আল ফাত্হ–২৭)

এ ছাড়াও বিশ্বনবীর মনে বিভিন্ন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নানা কথার সৃষ্টি করে দেয়া হত। রমজান মাসে তিনি হেরা গুহায় চলে গেলেন। এরপর সেই মহান রাত বিশ্বমানবতার সামনে এসে উপস্থিত হলো, যে রাতে নির্ভুল জীবন বিধান বিশ্বনবীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হতে থাকলো। সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এ সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে আমার সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর কাছে ছিল একখন্ড রেশমী কাপড়। সে কাপড়ে কিছু লেখা ছিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, 'পড়ুন'। আমি জবাব দিলাম আমি পড়তে পারি না। তখন তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর সে আলিঙ্গন এমন ছিল যে, আমার মনে হলো আমার প্রাণ বায়ু নির্গত হবে। তিনি আমাকে পুনরায় বললেন, 'পড়ুন'। আমি পূর্ববৎ বললাম, আমি পড়তে পারিনা। তিনি সেই আগের মতই আমাকে এমন জোরে জড়িয়ে ধরলেন যে, এবারেও আমার ধারণা হলো আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। আবারও তিনি আমাকে আদেশ করে বললেন, 'পড়ুন'। এবার আমি বললাম, আমি কি পড়বো? তিনি বললেন–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ–خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ–اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ–الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ–

পড়ুন আপনার রবের নাম সহকারে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাঁধা রক্তের এক পিন্ড হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন, আর আপনার রব খুবই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের

দ্বারা জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা সে অবগত ছিল না।' (আ'লাক)

আল্লাহর রাসূল বলেন, 'তিনি যা পড়লেন আমিও তাঁকে তা পড়ে পড়ে শোনালাম। তখন তিনি বিদায় নিলেন। তারপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমি জাগ্রত হলাম। তখন আমার উপলব্ধি হলো সমস্ত ঘটনাটি এবং যা আমাকে পড়ানো হয়েছিল তা আমার স্মরণে জাগরুক হয়ে আছে।' ঐতিহাসিক এবং গবেষকগণ বলেন, বিশ্বনবীর সাথে বাস্তবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) যে আচরণ করবেন সে আচরণ তাঁর ঘুমের ভেতরে করার অর্থ হলো তা ছিল ঘটিতব্য ঘটনার ভূমিকা। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, এরপর আল্লাহর নবী সে পাহাড়ের গুহা থেকে বের হয়ে এলেন। পাহাড়ের মাঝামাঝি অবস্থানে আসার পরে তিনি তাঁর মাথার ওপর থেকে এক অশ্রুত কণ্ঠ শুনতে পেলেন। তাকে ডেকে বলা হচ্ছে, 'হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিবরাঈল!'

এ কণ্ঠ শ্রবণ করে তিনি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) একজন অপূর্ব সুন্দর মানুষের আকৃতি ধারণ করে আছেন, কিন্তু তাঁর দুটো পাখা রয়েছে এবং সে পাখা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি পুনরায় বললেন, 'হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিবরাঈল!' তিনি হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। এরপর তিনি আকাশের যেদিকেই দৃষ্টি দিলেন সেদিকেই তাকে দেখতে পেলেন। সমস্ত আকাশ জুড়েই জিবরাঈল (আঃ) কে আল্লাহর নবী বিরাজ করতে দেখলেন। তিনি অবিচল থেকে সেই দৃশ্য দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখতে থাকলেন এবং অবস্থায় তিনি তাঁর কদম মোবারক কোন দিকেই নড়াতে পারছিলেন না।

তিনি দেখছিলেন তাঁর সন্ধানে তাঁর সহধর্মিনী লোক প্রেরণ করেছে, সে লোক তাঁর সন্ধান করছে কিন্তু তিনি সে লোককে বলতে পারলেন না তাঁর নিজের অবস্থানের কথা। লোকটি ফিরে চলে গেল। এরপর আকাশে আর কোন দৃশ্য দেখলেন না। তিনি ভীত কম্পিত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে গেলেন এবং হযরত খাদিজাকে বললেন, 'আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও! আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও!' হযরত খাদিজা (রাঃ) তাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দিলেন। নবী করীম (সাঃ) এর ভীত কম্পিত অবস্থার অবসান হলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'হে খাদিজা! আমার এ কি হলো!' তারপর তিনি সমস্ত ঘটনা তাঁর স্ত্রীকে শুনিয়ে বললেন, 'আমার নিজের জীবনের ভয় হচ্ছে।'

হযরত খাদিজা (রাঃ) তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'অসম্ভব! বরং আপনি সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহর শপথ! আপনাকে আল্লাহ কখনো অপমানিত করবেন না। আপনি সব সময় সত্য কথা বলেন এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম আচরণ করেন, তাদের হক আদায় করেন। মানুষের আমানত প্রত্যার্পণ করেন। অসহায় মানুষের বোঝা নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেন। গরীবদেরকে নিজে উপার্জন করে সাহায্য করেন। মেহমানের হক আদায় করেন এবং উত্তম কাজে সহযোগিতা করেন।' এভাবেই রাসূলের ওপরে প্রত্যক্ষ ওহীর সূচনা হয়েছিল।

এরপরে হযরত খাদিজা (রাঃ) আল্লাহর রাসূলকে সাথে করে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গেলেন। এ লোক ছিলেন বয়সে বৃদ্ধ ও অন্ধ। তিনি ছিলেন খাদিজা (রাঃ) এর চাচাত ভাই। তিনি পৌত্তলিকতা সহ্য করতে না পেরে পরবর্তীতে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী এবং হিব্রু ভাষায় ইনজিল লিখতেন। হযরত খাদিজা তাকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। তিনিও আল্লাহর রাসূলকে প্রশ্ন করে সমস্ত ঘটনা জেনে নিলেন। সবকিছু শুনে তিনি বলে উঠলেন, 'এ তো সেই ফেরেশতা যাকে মহান আল্লাহ্ হযরত মূছা (আঃ) এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। আফসোস! আপনার নবুয়্যত যুগে আমি যদি যুবক থাকতাম! আফসোস! আপনার জাতি যখন আপনাকে বহিষ্কৃত করবে! সে সময়ে যদি আমি জীবিত থাকতাম!'

তাঁর এ সমস্ত কথা শুনে আল্লাহর রাসূল জানতে চাইলেন, 'আমার জাতি আমাকে বের করে দেবে?' ওয়ারাকা ইবনে নওফেল জানালেন, 'অবশ্যই বের করে দেবে ! আপনার ওপরে যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে, এ দায়িত্ব যার ওপরেই অর্পিত হবে অথচ তাঁর সাথে শত্রুতা করা হবে না, এমন কখনো হয়নি। সে সময় পর্যন্ত আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবো।' গবেষকগণ বলেছেন, সাধারণতঃ বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, তাঁকে নবুয়্যত দান করা হয়েছিল চল্লিশ বছর বয়সে। কিন্তু গবেষণায় প্রমাণ হয়, তাঁর আগমন ঘটেছিল হস্তী বছর রবিউল আউয়াল মাসে। আর তাঁকে নবুয়্যত দান করা হয়েছিল হস্তী বছর হিসাবে রমজান মাসে। এ হিসাবে প্রথম ওহী অবতীর্ণের সময় তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর ছয় মাস।

পবিত্র কোরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে ওহীর মাধ্যমে। মানবীয় মন-মস্তিষ্ক; হৃদয়ের ক্ষেত্র আল্লাহর ওহী ধারণ করার জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। নবী ও রাসূলদের ওপরে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, সেই সাথে আল্লাহ তা'য়ালা ওহী ধারণ করার যোগ্যতা তাঁদের ভেতরে সৃষ্টি করেছেন। তাঁদেরকে সেই শক্তিদান করা হয়েছে, যে শক্তি ওহী ধারণ করার জন্য প্রয়োজন। 'ওহী' আরবী শব্দ, এর অর্থ হলো গোপন ইঙ্গিত। শরিয়তের পরিভাষায় ওহী বলতে বুঝানো হয়, যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের অন্তরে প্রবেশ করানো হয় বা ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়। এ কারণে নবীদের অন্তরে বিশ্বাস এমন দৃঢ় হয় যে, সাধারণ মানুষের থেকে সে বিশ্বাসের মর্যাদা পৃথক। তাঁকে মহান আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে যে বাণী প্রেরণ করা হলো এ সম্পর্কে নবীর অন্তরে সামান্যতম দ্বিধা থাকে না। আরেক কথায় বলা যায়, জ্ঞান বৃদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যমের নাম হলো ওহী যা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং তা শুধু মাত্র নবী রাসূলদের জন্য নির্দিষ্ট। এর সম্পর্ক সরাসরি আলমে কুদস্ এবং আলমে গায়েবের সাথে।

ওহী কিভাবে অবতীর্ণ হয় তা নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের জবাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। আল্লাহর নবী এ সম্পর্কে বলেছেন, 'কখনো তা আমার কাছে মনে হয় যে, ঘন্টার শব্দ অবিরাম গুঞ্জন সৃষ্টি করছে, আবার কখনো মৌমাছীর গুঞ্জনের ন্যায়, আবার

কখনো ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে এসে আমাকে শোনায় আমি শুনি আল্লাহ্ আমার অন্তরে তা সুরক্ষিত করে দেন।' বিশ্বনবীর কথায় ওহী অবতীর্ণের অবস্থাকে যেভাবে উপমার মাধ্যমে বা ফেরেশতার আগমনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে, তা মানুষের বোধশক্তির কাছাকাছি হলেও এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, প্রকৃত অবস্থা মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কোন মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে না।

যতদূর উপলব্ধি করা যায় ওহী অবতীর্ণের সময় প্রকৃত অবস্থা যে কি হয় তা বুঝিয়ে বলা নবীর আয়ত্ত্বের বাইরে। তাই বলে এটা নবীর অক্ষমতাও নয়। যেমন, যে ব্যক্তি সাগরের অতল তলদেশে বিশেষ পোশাক পরিধান করে অবতরণ করে, সেখানে তাঁর প্রকৃত অবস্থা কেমন হয় তা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সে প্রকাশ করে তাদের কাছে, যারা কোনদিন সাগরের তলদেশে অবতরণ করেনি। কিন্তু পানির নিচে সে যে অবস্থা উপলব্ধি করে, তাঁর সে উপলব্ধি বোধটাকে সে আরেকজনের ভেতরে সংক্রমিত করতে পারে না। তেমনি নবীগণ ওহী অবতীর্ণের সময় কেমন অবস্থার সৃষ্টি হয় তা বর্ণনা করতে পারেন কিন্তু তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি বোধটাকে তো আর শ্রোতার মনে প্রবেশ করাতে পারেন না।

আল্লাহর রাসূল এ কথাও বলেছেন যে, 'এবং ওহীর এ অবস্থাটা আমার ওপর ভীষণ কঠিন বোধ হতে থাকে। পুনরায় যখন এই কষ্টকর অবস্থার অবসান ঘটে তখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যা বলা হয়ে থাকে তা আমার মনের মধ্যে সংরক্ষিত হয়ে যায়।' ফেরেশতা যখন মানুষের আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসেন বা পর্দার আড়াল থেকে মহান আল্লাহর সাথে কথা হয় সে সময়ের অবস্থা হয় খুব সহজ। কিন্তু ওহী অবতীর্ণ করার প্রথম অবস্থা অর্থাৎ ওহী যখন মৌমাছীর গুঞ্জনের মত বা ঘন্টার অবিরাম শব্দের মত আসতে থাকে তখন ভীষণ কষ্ট অনুভব হয়। প্রশ্ন হলো এমন কেন হয়?

এ সম্পর্কে গবেষকগণ ধারণা করেন, 'মহান আল্লাহ মানুষকে মানুষের আবশ্যকীয় শর্ত ও স্বভাব চরিত্রের সাথে এমনভাবে জড়িত করে দিয়েছেন যে, নবী ও রাসূলদের মত পবিত্র এবং নিষ্পাপ সত্তাও নিজেদের সমস্ত পবিত্রতা থাকার পরেও মানবীয় প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে উপায় থাকে না। এ কারণে তাদের ওপরে যখন ওহী অবতীর্ণ হয় সে সময়ে তাদেরকে সেই উর্ধ্বজগতের প্রভাব আচ্ছন্ন করে রাখে এবং আল্লাহর নূরের ছায়ায় তাঁরা মহান আল্লাহর কথা গ্রহণ করেন।'একদিকে তাঁরা মানবীয় দেহধারী অপরদিকে তাঁরা আল্লাহর নূরের ছায়ায়–এ কারণে তাদের ওপরে উভয় জগতের প্রভাব নিপতিত হয়। সে সময়ে তাদের মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে দমন করে তাঁকে এমন এক জগতের উপযোগী করা হয় যে, তাঁরা যেন ওহী শ্রবণ এবং ধারণ করতে সক্ষম হন।

মানুষ নবীর মানবীয় বৈশিষ্ট্য অবদমিত করে তাকে যখন আল্লাহর নূরের জগতের উপযোগী করা হয় তখন তাঁর ভেতরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেটাই হলো মানুষের চর্ম চোখে অস্থিরতা, নবীর কাছে তখন সেটাই কষ্টানুভব হয়। সেই কষ্টের অবসান যখন হয় তখন নবীকে সেই জগতের যাবতীয় পবিত্রতা আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তিনি তখন অপূর্ব শান্তি অনুভব করেন। যে সময়ের ভেতরে এ অবস্থার সৃষ্টি হয় সে সময়টুকু হয় ক্ষণস্থায়ী।

ওহী অবতীর্ণের বিশেষ অবস্থায় যখন মানবসুলভ অনুভূতি ও বোধ শক্তির ওপর উর্ধ্বজগতের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, তখন মানবদেহে এক ধরণের অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। সে সময় নবীর শ্রবণ শক্তির সম্পর্ক স্থাপন হয় ওহী শ্রবণের সাথে, তখন তাঁর কাছে এ জড়জগতের কোন শব্দ স্থান পায় না। প্রথম প্রকারের ওহী অবতীর্ণের সময় নবীর যে অবস্থা হত এই অবস্থাকে ইউরোপিয় গবেষকগণ রোগ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেই শিশুকাল হতেই মৃগীরোগী। এ রোগ তাঁর মাঝে মধ্যেই দেখা দিত।' তাদের কথা যে কত বড় মিথ্যা তা তারা জেনে বুঝেই শুধুমাত্র ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য লিখেছেন।

হযরত হালিমা (রাঃ) এর বাড়িতে অবস্থানকালে শিশু নবীর যে বক্ষবিদারণ করা হয় তখন থেকে নাকি তাঁর এ রোগের সৃষ্টি। আমাদের বক্তব্য হলো, সে সময়ে আল্লাহ নবীর বয়স ছিল পাঁচ বছর। ঐ পাঁচ বছর বয়সেই শুধুমাত্র একবার সে রোগ দেখা দিল আর মাঝের ৩৫ বছর দেখা দিল না, ঠিক যখন তিনি নবুয়্যত লাভ করলেন ৪০ বছর বয়সে, তখন পুনরায় সে রোগ দেখা দিল, এ সমস্ত প্রশ্ন ইসলাম বিদ্বেষী গবেষকদের মনে জাগেনি কেন? প্রকৃতপক্ষে জেনে বুঝেই, বিশ্বনবীর নবুয়্যতকে অস্বীকার এবং ইসলামকে কোন ঐশী বিধান হিসাবে স্বীকৃতি না দেবার লক্ষ্যেই তাঁরা বিশ্বনবীর ওপরে মৃগী রোগের অপবাদ চাপানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী ও রাসূলদের ওপরে ওহী নাযিল করেছেন ফেরেশ্তার মাধ্যমে। স্বয়ং আল্লাহ কোন নবী বা রাসূলের সাথে দেখা করে ওহী দান করেন না, এটা আল্লাহর নিয়ম নয় এবং কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় তাঁকে দেখা। আল্লাহ বলেন–

وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْمِنْ وَّرَائِ حِجَابٍ اَوْيُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ–

কোন মানুষই এ মর্যাদার অধিকারী নয় যে, আল্লাহ তার সাথে প্রত্যক্ষভাবে কথা বলবেন। তিনি কথা বলেন হয় ওহীর মাধ্যমে, পর্দার আড়াল থেকে অথবা তিনি কোন বার্তাবাহক প্রেরণ করেন এবং সে তাঁর আদেশে তিনি যা চান ওহী হিসেবে দেয়। (সূরা আশ্ শুরা–৫১)

পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার অর্থ হলো, বান্দা শব্দ শুনতে সক্ষম কিন্তু শব্দদাতাকে দেখতে সক্ষম নয়। হযরত মুছার সাথেও এ প্রক্রিয়াতেই আল্লাহ কথা বলেছিলেন। তূর পাহাড়ের পাদদেশ অবস্থিত একটি বৃক্ষ থেকে হঠাৎ তিনি আহ্বান শুনতে পেলেন। কিন্তু যিনি কথা বললেন, তিনি তাঁর দৃষ্টির আড়ালেই রয়ে গেলেন। আল্লাহর রাসূল দীর্ঘ তেইশ বছর দ্বীনি আন্দোলন পরিচালিত করে সফলতা অর্জন করেছিলেন। এ সময়ে আল্লাহর বিধান সম্পর্কিত কোন কথা নিজের প্রবৃত্তি থেকে তিনি বলেননি। যা বলেছেন তা ওহীর ভিত্তিতেই বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى-اِنْ هُوَاِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى-

তিনি নিজের প্রবৃত্তি থেকে কথা বলেন না, এ তো একটা ওহী–যা তাঁর ওপরে অবতীর্ণ করা হয়। (সূরা নাজম)

ময়দানে দ্বীনি আন্দোলন পরিচালিত করার ক্ষেত্রে যখন যে নিদের্শের প্রয়োজন তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই ওহীর মাধ্যমে রাসূলের কাছে অবতীর্ণ করা হতো। রাসূলের কাছে যে কোরআন অবতীর্ণ হতো, তার ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসূলই করতেন। এ ক্ষেত্রেও রাসূল তাঁর চিন্তাধারা অনুসারে কোরআনের ব্যাখ্যা করেননি। বরং কোরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও তিনি ওহীর মাধ্যমেই অবগত হতেন। যদিও রাসূলের ব্যাখ্যার প্রতিটি শব্দ কোরআনের মতো ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণকৃত শব্দ নয়। কিন্তু তিনি যে জ্ঞান দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা দিতেন, সে জ্ঞানও ওহীর উৎস থেকে লাভ করা জ্ঞান ছিল এবং তা ছিল ওহীর উৎসের ওপরই ভিত্তিশীল।

আল্লাহর রাসূলের এসব ব্যাখ্যা ও আল্লাহর কোরআনের মধ্যে শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, কোরআনের শব্দ, ভাষা, অর্থ ও বক্তব্য সমস্ত কিছুই হলো আল্লাহর বাণী এবং তিনিই তা প্রেরণ করেছেন। আর রাসূলের কথার মূল ভাবধারা, বক্তব্য ও বিষয় ছিল মহান আল্লাহরই শিখানো। আল্লাহর শিখানো বক্তব্য তিনি নিজের ভাষায় মানুষের সামনে প্রকাশ করতেন। তাঁর এসব কথা ও বক্তব্য হাদীস নামে পরিচিত। তিনি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে কোন কথা যদি বলতেন, তাহলে তাঁর সাথে স্বয়ং আল্লাহ কি ধরনের ব্যবহার করতেন এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা সূরা হাক্কায় বলেন–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ-لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ-ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ-

আমার নবী যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমার নামে চালিয়ে দিত, তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠ শিরা ছিন্ন করে ফেলতাম।

প্রথম ওহীর তাৎপর্য

প্রথম যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, তা ছিল সূরা 'আল্ আলাক'- এর আয়াত। পবিত্র কোরআনের ত্রিশ পারার ৯৬ নং সূরা। এই সূরার ১ থেকে ৫ নং আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল। এই আয়াতগুলোয় স্পষ্ট করে ঘোষনা করা হয়েছে, মহান আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির ভেতরে মানুষ হলো সর্বোত্তম সৃষ্টি এবং পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত সৃষ্টি এবং এ কারণে মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা। মানুষের সৃষ্টিগত দুর্বলতা এটাই যে, তাঁর আগমনের সূচনা হলো অপবিত্র পানি এবং জমাটবাঁধা রক্ত থেকে।

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ যখন তাকে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং সর্ব 'নিম্ন পর্যায়ের' সৃষ্টিকে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করলেন, তখন তাকে এমন গুণ দান করলেন যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা শ্রেষ্ঠগুণ। তাকে জ্ঞান নামক গুণের প্রকাশ ক্ষেত্র হিসাবে প্রস্তুত করলেন। তাকে কলমের মাধ্যমে লেখা শিক্ষা দান করলেন। সব ধরনের জ্ঞান ও আবিষ্কারের ক্ষমতা দান করলেন। আবার মানুষকে এটাও উপলব্ধি করালেন যে, উপায় ও উপকরণগত ধারায় জ্ঞান অর্জনের তিনটি মাত্র নিয়ম বিদ্যমান।

জ্ঞানার্জনের প্রথম প্রকারের মাধ্যম হলো, অন্তর জগৎ ও মেধার জগতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জন্মগতভাবে যে জ্ঞান প্রদান করা হয়, তা শব্দ, অক্ষর এবং চিত্র বা লেখনীর মুখাপেক্ষী নয়। ইলহামের মাধ্যমেই এভাবে মানুষ জ্ঞানার্জন করে। জ্ঞানার্জনের দ্বিতীয় মাধ্যম হলো কোন কিছু শুনে মুখে আবৃত্তি করে তা স্মরণে রাখা। জ্ঞানার্জনের এ পথ হলো জিহ্বার মুখাপেক্ষী, অক্ষর ও লেখনীর মুখাপেক্ষী নয়। জ্ঞানার্জনের তৃতীয় মাধ্যম হলো, অক্ষর ও লেখনীর দ্বারা। কিন্তু এটা এমন একটি মাধ্যম যে, এই মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের উল্লেখিত দুটো মাধ্যম ছাড়া এই তৃতীয় মাধ্যমকে জ্ঞানার্জনের একমাত্র মাধ্যম হিসাবে অবলম্বন করা যায় না। এ কারণে বলা হয়েছে, তিনি তোমাদেরকে কলমের মাধ্যমে জ্ঞান শিক্ষা দান করেছেন। কলমের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে হলে যেমন অন্তর জগৎ ও মেধার জগৎ প্রসারিত হতে হয়, তেমনি প্রয়োজন হয় জিহ্বা দ্বারা আবৃত্তি করে তা স্মরণে রাখা।

ফেরেশতা বিশ্বনবীর সামনে আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন, 'আপনি পড়ুন। জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমি পড়তে জানিনা।' ফেরেশতার কথা এটা ছিল না যে, আমি যা আবৃত্তি করছি, আমার সাথে অনুরূপ আপনিও করুন। এই বচন ভঙ্গী বা কথোপকথন থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় হযরত জিবরাঈল প্রথম ওহীর শব্দগুলো লিখিত আকারে তাঁর সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। প্রথম ওহী যে তাঁর সামনে লিখিত আকারে ছিল তা বিশ্বনবীর কথার ভঙ্গীতেও প্রকাশ পায়। তিনি বলেছিলেন, আমি পড়তে জানি না। ওহী লিখিত না হলে তিনি এ কথা বলতেন না। ব্যাপারটা যদি শুধুমাত্র মুখের সাথে সম্পর্কিত হত তাহলে তিনি জিবরাঈলের সাথে সাথে প্রথমেই আবৃত্তি করে যেতেন, কোন আপত্তি উত্থাপন করতেন না। আল্লাহর প্রথম বাণী থেকে এ সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁকে নবুয়্যত দেয়ার পূর্বেই বিশেষ কোন প্রক্রিয়ায় তাঁর জ্ঞানের জগতে এ সত্য প্রবেশ করানো হয়েছিল, একমাত্র আল্লাহই হলেন রব বা প্রতিপালক। আল্লাহর এই রবুবিয়াত ছিল বিশ্বনবীর কাছে প্রকাশিত।

এ কারণেই দেখা যায় তিনি কোনদিন কোন মূর্তির কাছে সামান্য কোন প্রার্থনা করেননি। তিনি জানতেন যে, এই মূর্তিগুলো মানুষের রব্ব নয়, রব হলেন একমাত্র আল্লাহ। এ সত্য তাকে অবগত করানো হয়েছিল বলেই তিনি মূর্তিকে প্রচন্ড ঘৃণা করতেন। তিনি ওহী আসার পূর্বেই একমাত্র আল্লাহকে রব বলে জানতেন এবং তাঁকেই একমাত্র রব্ব হিসাবে

মেনে চলতেন। এই রব কি, এটা তাঁর কাছে পরিচিত ছিল ফলে প্রথম ওহীর ভেতরে নবীকে রব-এর পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হয়নি। সরাসরি তাকে বলা হয়েছিল, আপনি আপনার রব-এর নামে পড়ুন বা বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করুন।

ঐ রব-এর নামেই পড়ুন, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি কাকে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন এ কথা তাঁর নবীকে বলা প্রয়োজন হয়নি এ কারণে যে, নবীর জ্ঞানের জগতে এ কথাগুলো পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছিল, দৃষ্টির আড়ালে এবং দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান আলোকিত সমস্ত পৃথিবীটা এবং এর ভেতরে যা কিছু আছে, এ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। জমাটবাঁধা রক্ত যা ইতোপূর্বে ছিল তোমাদের দেহ নির্গত এক ফোটা অপবিত্র পানি। যাকে বিশেষ এক সময়ে জমাটবাঁধা রক্তে পরিণত করা হয়েছে, মাংস পিন্ডে পরিণত করে তার ভেতর অস্থি সংযোজন করে মানুষের আকৃতি দেয়া হয়েছে।

মানুষের প্রথম অবস্থা ছিল এক ফোটা অপবিত্র পানি, সেখান হতে সুন্দর মানুষ সৃষ্টি করে তাকে জ্ঞানের সঞ্জিবনী সুধা ঢেলে জ্ঞানের অলংকারে সজ্জিতকরণ সেই আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের প্রকাশ। তাকে শুধু জ্ঞানই দান করা হয়নি, কলমের মাধ্যমে তাকে এমন এক জ্ঞান দান করা হয়েছে যে, অর্জিত জ্ঞানের বিস্তৃতি এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তা সংরক্ষণের কৌশল ঐ মহান আল্লাহই তোমাদেরকে শিক্ষা দান করেছেন। তিনি যদি তোমাদেরকে অলক্ষ্যে থেকে কলমের ব্যবহার শিক্ষাদান না করতেন, তাহলে তোমাদের জ্ঞানের জগতে বন্ধ্যাত্ব নেমে আসতো। তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারতে না। তোমরা ছিলে জ্ঞানহীন অচেতন, কিছুই তোমরা অবগত ছিলে না। তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে যখন তোমাদের নিয়ে আসা হয় সে সময়ে তোমাদের কোন চেতনাই ছিল না।

তারপর তোমাদেরকে তিনটি জিনিষ দান করা হয়েছে। চোখ কান এবং মস্তিষ্ক। একটা দিয়ে দেখবে আরেকটা দিয়ে শুনবে এবং মাথা দিয়ে চিন্তা করবে। তোমার চিন্তার জগতে আমিই আবিষ্কারের সূত্রদান করি। যা তোমার কাছে আবৃত, অজানা-অজ্ঞাত ছিল, তা তোমাকে জানানোর ব্যবস্থা আমি করেছি। তোমরা একটা নতুন কিছু উদ্ভাবন করে এ ধারণা করো যে, এটা তোমারই কৃতিত্ব। প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, আমিই তোমার চিন্তার জগতে-আবিষ্কারের অনুপ্রেরণা এবং সূত্রদান করি। তুমি তোমার জ্ঞান দ্বারা কোন কিছুই করতে পারোনা। যতক্ষণ আমি তোমাকে সহযোগিতা না করি। তোমার এ জ্ঞান নেই, তুমি অনুভব করতে পারো না কিভাবে আমি তোমাকে জ্ঞানদান করি।

মহান আল্লাহ তাঁর প্রথম বাণীতেই তাঁর রাসূলের ওপর কোন বিরাট দায়িত্ব চাপিয়ে দেননি। তাঁর সামনে কাজের বিশাল তালিকাও পেশ করেননি। ওহী সম্পর্কে বিশ্বনবী ছিলেন অনভিজ্ঞ, প্রথম বার এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করে মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীকে ওহী সম্পর্কে অভিজ্ঞ করলেন যেন আগামী বার তিনি ওহী ধারণ করতে পারেন। মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতির জন্যও কিছুদিন তাঁকে সময় প্রদান করা হয়েছিল। প্রথমবার তাঁর পবিত্র স্বভাব

প্রকৃতির ওপর যে প্রভাব নিপতিত হয়েছিল, তা যেন সহজ হয়ে যায়, এ কারণেও ওহীর বিরতি দেয়া হয়েছিল।

প্রথম অবতীর্ণকৃত বাণীর তাৎপর্য হলো, নবী করীম (সাঃ) তাঁর নবুয়্যত সম্পর্কে অর্থাৎ তিনি যে নবী হবেন এ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না। তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবগত করা হলো, আপনাকে নবী হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে, সুতরাং আপনি সাধারণের থেকে ভিন্ন। আপনার জীবন এবং সাধারণ মানুষের জীবনে আকাশ-পাতাল ব্যবধান বিদ্যমান। একজন রাসূলের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আপনাকে তা পালন করতে হবে। অর্থাৎ নবুয়্যত সম্পর্কে বিশ্বনবীকে সজাগ করে তোলা হয়েছিল প্রথম ওহী অবতীর্ণ করে।

বিশ্বনবীর ওপরে মহান আল্লাহ তাঁর প্রথম ওহীতেই তাঁকে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ময়দানে এগিয়ে দেননি। যে দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল, সে দায়িত্ব সম্পর্কে প্রথম ওহীতে কোন নির্দেশ দান করা হয়নি। দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন তাঁর ওপরে ওহী অবতীর্ণ করা হলো, তখন তাঁর প্রতি নবুয়্যতের দায়িত্বের সাথে রেসালাতের দায়িত্বও অর্পণ করা হলো। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর ওপর অবতীর্ণ করা হলো পবিত্র কোরআনের ৭৪ নং সূরার প্রাথমিক সাতটি আয়াত। এই সূরার নাম হলো সূরায়ে আল্ মুদ্দাস্সির।

বিশ্বনবীর আরেকটি নামও হলো মুদ্দাস্সির। আল্লাহর রাসূলের মুদ্দাস্সির নামটি হলো গুণবাচক বা উপাধি বিশেষ। হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে দ্বিতীয় বার দেখে তিনি অস্থির হয়ে বাড়িতে এসে শয্যায় শুয়ে তাঁকে কম্বল দিয়ে আবৃত করে দিতে বলেছিলেন। এই সময় তাঁর ওপরে সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রথম সাতটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। রাসূলকে আহ্বান করা হলো–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ–

হে কম্বল আবৃত শয্যা গ্রহণকারী! ওঠো এবং সাবধান করো। এবং তোমার রব-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশালত্বের ঘোষনা দাও। এবং নিজের পরিধেয় পোষাক পবিত্র রাখো। আর মলিনতা অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে অবস্থান করো। আর অনুগ্রহ করো না অধিক লাভের আকাংখায়। এবং নিজের রব্ব-এর জন্য ধৈর্য অবলম্বন করো।'

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, রাসূলকে এভাবে সম্বোধন করা হলো না, হে মুহাম্মাদ ওঠো! মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বনবীকে আহ্বান করা এখান থেকেই শুরু হয়েছে। গোটা কোরআন পাঠ করলে দেখা যায়, এভাবে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধুকে নানা ধরনের মধুর নামেই আহ্বান করেছেন। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) এর যে ব্যক্তিবাচক দুটো নাম রয়েছে, মুহাম্মাদ এবং আহ্মাদ, এ দুটো নামে আল্লাহ তাঁকে কখনো আহ্বান করেননি।

মুহাম্মাদ শব্দটা পবিত্র কোরআনে চারটি সূরায় মোট চারস্থানে উল্লেখ করা হলেও সেটা

প্রাসঙ্গিকভাবে, তাঁকে আহ্বান করে নয়। আর আহ্‌মাদ শব্দটা একটি সূরায় মাত্র একস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের কথা থেকে, তাঁকে আহ্বান করে নয়। অথচ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর প্রথম মানুষ, প্রথম নবী ও রাসূল, প্রথম বিজ্ঞানী হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেই তাঁর নাম ধরে আহ্বান করে বলেছিলেন–

يَـٰٓادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ–

হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী এই জান্নাতের মধ্যে বসবাস করো।' (বাকারা)

মহান আল্লাহ কর্তৃক নবীদেরকে আহবানের এই ধারা অব্যাহত থাকলো হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত। এই পৃথিবীতে যত নবী এবং রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের সবাইকে মহান আল্লাহ সরাসরি নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে আহ্বান করা হয়েছে, হে আদম, হে নূহ্, হে মুসা, হে ইবরাহীম, হে লূত অর্থাৎ নাম ধরে আহ্বান করা হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন বিশ্বনবী এবং তাঁকে কখনো তাঁর ব্যক্তিবাচক নামে আহ্বান করা হয়নি। তাঁর গুণবাচক নাম বা উপাধি দিয়েছেন আল্লাহ এবং সেই উপাধি ধরে বা গুণবাচক নামেই আল্লাহ তাঁকে আহবান করেছেন।

এর কারণ হলো বিশ্বনবীর বিশাল মর্যাদা এবং সম্মান। আল্লাহ তাঁকে যে কত সম্মান এবং মর্যাদা প্রদান করেছেন, তাঁকে যে ভাষায় এবং ভঙ্গীতে আহ্বান করা হত, সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে অবাক হতে হয়। কম্বল দিয়ে নিজের শরীর আবৃত করে তিনি শয্যায় শায়িত, তাঁকে কি সুন্দর বিশেষণে-কি মধুর ভঙ্গিতে আহ্বান করা হলো, হে কম্বল গায়ে দেয়া শয্যায় শায়িত ব্যক্তি, ওঠো!

দ্বিতীয় পর্যায়ের ওহী অবতীর্ণ করে তাঁকে বলা হচ্ছে, হে আমার প্রিয় বন্ধু! আপনি এমন করে কম্বলে আবৃত হয়ে শুয়ে আছেন কেন! এভাবে শুয়ে থাকা তো আপনার কাজ নয়। মানুষ পশুস্তরে নেমে গেছে, অসহায় মানুষ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আর্তনাদ করছে, মিথ্যে রব-এর কাছে মানুষ নিজের কামনা বাসনা পেশ করছে, এসব দেখে আপনার মনে যে যন্ত্রণার ঝড় শুরু হতো, সে যন্ত্রণার অবসানের জন্যই আপনি কাজ শুরু করে দিন। আপনার ওপরে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, সে দায়িত্ব পালন করুন। এ জন্য আপনি সংকল্পের দৃঢ়তা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হোন। আপনি মানব এবং জ্বিন জাতিকে আদেশ করুন, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি করা পৃথিবীতে বাস করছো, তাঁর নেয়ামত ভোগ করছো, তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত এক মুহূর্ত জীবিত থাকতে সক্ষম হবেনা। অতএব তাঁরই বিধান অনুসরণ করে তাঁর দাস হয়ে যাও। একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করো, আর কারো দাসত্ব করো না। কেননা, তারা দাসত্ব লাভের উপযোগী নয়। তারা যদি তাদের রবের বিধান অনুসরণ না করে, তাহলে তাদেরকে সতর্ক করে দিন, তাদেরকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এবং তাদের পরিণাম শুভ হবেনা।

এ কথা মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলার পরেই আদেশ করলেন, আপনি যাকে রব বলে জানেন, তিনিই প্রকৃত রব। আয়াতটিতে 'ওয়া রাব্বাকা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। রব আরবি শব্দ। এই শব্দের অর্থ বড় ব্যাপক। রব শব্দের ব্যাখ্যা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে ইনশাল্লাহ। এখানে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন, যত আইন-কানুনের প্রয়োজন এ সমস্ত যিনি পূরণ করেন তিনিই হলেন রব।

দুনিয়ায় যত নবী রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের সাথে যাদের সংঘর্ষ বেধেছে, তাঁরা আল্লাহকে স্বীকৃতি দিতো, কিন্তু আল্লাহকে রব হিসাবে গ্রহণ করতে আপত্তি করেছে। ফেরআউন ঘোষনা করেছিল, আমিই তোমাদের বড় রব। সে নিজেকে আল্লাহ হিসাবে ঘোষনা দেয়নি, দিয়েছিল রব হিসাবে। আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে এই রব নিয়েই সত্যপন্থীদের সাথে বাতিল শক্তির সংঘর্ষ চলছে। সত্যপন্থীগণ দাবী করছে, এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ; তিনিই আমাদের রব, তিনিই আমাদের জীবন বিধানদাতা।

আর বাতিল শক্তি দাবী করছে, আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করলে করতেও পারেন। কিন্তু আইন-কানুন তৈরী এবং জীবন বিধান তৈরী করবো আমরা, এ ব্যাপারে আমরা স্বাধীন। আমাদের যে আদর্শ, আমাদের যে মতবাদ, সে অনুসারেই দেশ চলবে এবং দেশের মানুষকে তা অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহর নবীগণ তাদের এ কথা যখন গ্রহণ করেননি, তখনই সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাদের কারো নাগরিকত্ব বাতিল হয়েছে, কাউকে কারাগারে আবদ্ধ করা হয়েছে, কাউকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, শুধুমাত্র এই রব-এর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষনা করার কারণে। নবী করীম (সাঃ) কে মহান আল্লাহ আদেশ করলেন, 'আপনি শুয়ে থাকবেন না, উঠুন এবং আপনার রব-এর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষনা করুন। পৃথিবীতে নিজেদেরকে যারা রব বানিয়ে বসেছে, তাদেরকে সতর্ক করে দিন, তোমরা রব নও। রব হলেন একমাত্র মহান আল্লাহ। কোন আইন-কানুন বিধান রচনা করার এখতিয়ার তোমাদের নেই। রব সেজে যে গদিতে তোমরা বসে আছো, সে গদি ছেড়ে দাও। আল্লাহর বিধান ঐ গদিতে বসে দেশের বুকে, আল্লাহর বান্দাদের ওপরে আইন জারি করবে।

পৃথিবীব্যাপী উচ্চকণ্ঠে ঘোষনা করে দাও, আল্লাহ আমাদের রব এবং আল্লাহর সৃষ্টি এই পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বই চলবে, আল্লাহর রবুবিয়াত প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন। এই পৃথিবীতে নবী হিসাবে নির্বাচিত হয়ে একজন নবীর হলো এটাই সর্বপ্রথম কাজ এবং দায়িত্ব। এই পৃথিবীতে যারা নিজেদেরকে রব বলে ধারণা করছে, মূর্খ মানুষ যে সমস্ত দুর্বল অথর্ব বস্তুকে নিজেদের রব বানিয়েছে, তাদেরকে বলে দাও, রব হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা।

রব কি, রব কাকে বলে এবং রব-এর প্রয়োজনীয়তা কি, একমাত্র আল্লাহকে কেন রব হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে বিস্তারিত

আলোচনা করেছেন। মক্কী সূরাসমূহ এই রব-এর আলোচনা এবং রিসালাত ও আখিরাতের আলোচনায় পরিপূর্ণ। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত এ তিন বিষয়ে মক্কী সূরায় বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। বলা হয়েছে, তোমরা যাকে রব হিসাবে পূজা করছো, সেও ঐ আল্লাহর দাস এবং ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ঐ আল্লাহরই মুখাপেক্ষী। সুতরাং তাদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করার কোনই প্রয়োজন নেই, রব্ব হিসাবে গ্রহণ করো তাঁকেই যিনি তোমাদেরকে জমাটবাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন; জ্ঞান দান করেছেন এবং তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজন যিনি পূরণ করছেন। তোমাদের সমস্ত কাজে তাকেই রব হিসাবে ঘোষনা করবে, একমাত্র দাসত্ব লাভের যোগ্য বলে বিবেচনা করবে এবং আইনদাতা হিসাবে গ্রহণ করবে।

মহান আল্লাহ প্রথম অবতীর্ণকৃত বাণীতে তাঁর নবীকে আদেশ দিলেন, আমিই যে শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র রব–এ কথার ঘোষনা করে দাও। তুমি কোন দ্বিধা করোনা। তোমার রব-এর শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষনা করো এবং কোন শক্তিকে দেখে ভয় করো না। কেননা, সমস্ত শক্তির শ্রেষ্ঠ শক্তি তোমার সাথে রয়েছে। তোমার রব-এর শক্তির সামনে কোন শক্তিই শ্রেষ্ঠ নয়। তুমি তাদের সামনে এ কথা স্পষ্ট করে বলে দাও, তুমি যে কাজ শুরু করছো, এ কাজের গতি কেউ রুদ্ধ করতে পারবে না।

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে কোথায় কি কাজ করতে আদেশ করলেন, তা বিশ্লেষণ করলে আমাদের সামনে একটা দিক পরিষ্কার হয়ে যায় যে, গোটা পৃথিবীও যদি সত্যের বাহকের বিরুদ্ধে চলে যায় তবুও সত্যের ঘোষনা দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা যাবে না। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যে ঘোষনা দিতে আদেশ করলেন, সেই ঘোষনার বিপরীত অবস্থা বিরাজ করছিল তদানীন্তন পৃথিবীতে। মহান আল্লাহর রাসূল যে সমাজে উপস্থিত ছিলেন সে সমাজ এই ঘোষনা শুনতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

এই ঘোষনা দেয়ার সাথে সাথে রাসূলকে তাঁর আপনজনেরাই যে বন্য হায়েনার মত ঘীরে ধরবে এতেও কোন সন্দেহ ছিল না। যারা রব-এর দাবী নিয়ে সে সমাজে দীর্ঘকাল ব্যাপী নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিল, নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করছিল, কা'বাঘরসহ নিজেদের ঘরে ঘরে মূর্তিকে রব বানিয়ে তাদের পূজা অর্চনা করছিল, তারা রাসূলের এ ঘোষনা শুনেই রাসূল একজন সৎ এবং সুন্দর চরিত্রের লোক হবার কারণে তাঁর ঘোষনাকে তারা স্বাগত জানাবে অবস্থা এমন ছিল না। বরং এ ঘোষনা দেয়ার সাথে সাথেই বিপদ মসিবতের পাহাড় নিজের ওপরে আপতিত হবে, আপন আত্মীয়-স্বজন প্রাণের শত্রুতে পরিণত হবে, তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে, তাঁকে হত্যা করার জন্য সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী তৎপর হয়ে উঠবে–এটাই ছিল প্রকৃত পরিস্থিতি।

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কোন কথা ঘোষনা করতে আদেশ করলেন, সে কথার যে কি তাৎপর্য এ কথা উপলব্ধি করার মত জ্ঞান রাসূলকে দেয়া হয়েছিল, রাসূল মহান আল্লাহর আদেশের তাৎপর্য অনুধাবন করবেন, তিনি ভীতিগ্রস্থ হতে পারেন, চিন্তিত হতে পারেন, এ কারণে ঐ আয়াতের মধ্যে রাসূলকে এ কথাও বুঝিয়ে দেয়া হলো, ভয় বা চিন্তার কোন

কারণ নেই। কেননা তোমার রব্ব-ই শ্রেষ্ঠ, তোমার রব্ব-এর শ্রেষ্ঠত্বের সামনে অন্য সমস্ত শক্তি ধুলিকণার মতই উড়ে যাবে। তোমার রব্ব রয়েছেন তোমার সাথে, তোমাকে দ্বীনি আন্দোলনের উত্তপ্ত ময়দানে এগিয়ে দিয়ে তোমার রব নীরব থাকবেন না। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন শুরু করে দাও, তোমাকে সহযোগিতা করার দায়িত্ব আমার।

এই সুক্ষ্ম কথাগুলো আল্লাহর রাসূল উপলব্ধি করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে যে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়েছেন ঐ আয়াতে, তা রাসূল অনুভব করেছিলেন বলেই তিনি তাঁর আন্দোলনের গতি পথে কোন শক্তিকে সামান্যতম গুরুত্ব দেননি। মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব রাসূল উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি একাকী গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রাসূলের আদর্শ নিয়ে আজো যারা ময়দানে কাজ করতে অগ্রসর হবেন প্রথমে তাদেরকে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা অর্জন করতে হবে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের চিত্র নিজের মনে অঙ্কন করতে হবে। তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তিকেই আর শক্তি বলে মনে হবে না। এরপরে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে বললেন, 'আপনি নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখুন।' বিজ্ঞ তাফসীরকারগণ কোরআনের এই আয়াতের ব্যাপক তাফসীর করেছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত আয়াতের মর্মও বড় ব্যাপক। ছোট একটি কথা দিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে একটি অর্থ হলো, পরিধেয় পোষাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা।

পোষাক মানুষের মনের ওপরে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে এতে কোন সন্দেহ নেই। এ কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামরিক বাহিনীর বিশেষ পোষাক নির্ধারণ করা হয়েছে। গবেষকগণ বলেছেন, পোষাক-পরিচ্ছেদের পবিত্রতা এবং আত্মার পবিত্রতা অবিচ্ছিন্ন। একটার সাথে আরেকটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পবিত্র রুচি সম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় সে পুঁতিগন্ধময় কোন খাদ্য তাঁর মুখ গহ্বর দিয়ে দেহে প্রবেশ করাবে। সুতরাং, কোন পবিত্র আত্মার পক্ষেও সম্ভব নয় সে কোন অপবিত্র দেহের ভেতরে বাস করবে। কোন পবিত্র দেহের পক্ষেও সম্ভব নয় সে নিজেকে অপবিত্র অপরিচ্ছন্ন পোষাকে আবৃত রাখবে। মহান আল্লাহ পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন। তিনি অপবিত্রতা প্রশ্রয় দেননা। এ কারণে তিনি তাঁর রাসূলকে আদেশ করলেন, তোমার পোষাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখবে। মহান আল্লাহর এ কথা থেকে এটা ধারণা করার কোন অবকাশ নেই যে, রাসূল (সাঃ) বোধহয় ইতোপূর্বে অপবিত্র অপরিচ্ছন্ন পোষাকে থাকতেন। পবিত্রতা সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না।

প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। নবী করীম (সাঃ) ছিলেন জন্মগতভাবেই পবিত্র। মহান আল্লাহ তাঁকে পবিত্র রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাঁর জ্ঞানের জগতে পবিত্রতা সম্পর্কে জ্ঞানদান করেছিলেন। আরবী 'তাহ্হের বা তাহারাত' শব্দের অর্থ শুধু বাহ্যিক পবিত্রতা নয়। অন্তরের কলুষতা দূর করাকেও বোঝায়। পবিত্রতা বা তাহারাতকে কোরআন যে অর্থে উপস্থাপন করেছে, পৃথিবীর এমন কোন ভাষা নেই যে, সে ভাষার একটি শব্দ তাহারাতের সমার্থক হতে পারে বা পবিত্রতার ব্যাপক ধারণা পেশ করতে পারে।

পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করাও পবিত্রতা এবং পাপের ভেতরে নিজেকে জড়িত করাকে অপবিত্রতা বলা হয়েছে। কোন অন্যায় কাজ বা মিথ্যা কথা থেকে নিজেকে বিরত রাখার অর্থও হলো পবিত্রতা। মিথ্যা কথা বলা অপবিত্রতা। এভাবে যাবতীয় অন্যায়, অনাচার, পাপাচার, অত্যাচার, অপরিচ্ছন্নতা, মিথ্যা, চিন্তার জগতে অপরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকাকেই পবিত্রতা বলা হয়েছে। দেহ এবং দেহের পোষাক পবিত্র–এটা কোন পবিত্রতাই নয়। চিন্তার জগৎ হতে যাবতীয় অপরিচ্ছন্নতা এবং অপবিত্রতা দূর করতে হবে। অজ্ঞানতা তথা মূর্খতাও এক ধরণের অপবিত্রতা। এ সমস্ত অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকার নামই হলো পবিত্র কোরআনের ভাষায় তাহারাত।

ইসলাম আত্মা এবং দেহের পবিত্রতার দাবী করে। সে সময়ে মানুষ জ্ঞানের দিক থেকে, চিন্তার দিক থেকে, চরিত্রের দিক থেকে; স্বভাবের দিক থেকে, নেতৃত্বের দিক থেকে, কথার দিক থেকে তথা সর্বস্তরে অপবিত্রতায় নিমজ্জিত ছিল। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আদেশ করলেন, মানব সমাজ থেকে এ সমস্ত অপবিত্রতা দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করো। তুমি এই মহান কাজ করছো, এ জন্য যেন তুমি ধারণা করোনা, তুমি তাদের ওপরে দয়া করছো। বরং এটাই তোমার দায়িত্ব, এই দায়িত্ব দিয়েই তোমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। আবার এ ধারণাও করো না যে, এ কাজ করে তুমি তোমার রব্ব-এর কল্যাণ করছো।

বরং তুমি তোমার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করছো। যে দায়িত্ব তুমি পালন করছো এ কাজ সহজ নয়। তুমি তোমার প্রতিটি পদক্ষেপে বাধাগ্রস্থ হবে। তোমার সাথে অহেতুক শত্রুতা করা হবে। তোমাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়া হবে; হত্যা করার প্রচেষ্টা করা হবে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তোমার বিরুদ্ধে চলে যাবে। তুমি নানা ধরণের মিথ্যা অপবাদের, ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হবে।

তোমার বাড়ি-ঘর, সহায় সম্পদ বিনষ্ট হবে; আহার নিদ্রায় কষ্ট পাবে। তোমার উপার্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তোমার নামে কুৎসা ছড়িয়ে দেয়া হবে। বিরোধী শক্তি তোমাকে অবরোধ করবে; দেহের রক্ত ঝরবে। তোমার সামনে নানা ধরণের লোভ-লালসা দেখানো হবে। বিভিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করা থেকে তোমাকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু তোমার কাজে তুমি থাকবে অটল অবিচল। তোমাকে এমন ধৈর্য ধারণ করতে হবে, যে ধৈর্যের শেষ সীমা–শেষ পর্যায় বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ওহীর সূচনাতেই মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে এ কথা স্পষ্ট করে দিলেন যে, কি কাজের জন্য তোমাকে বিশ্বনবী হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে এবং কেন করা হয়েছে। এই কাজের সূচনা কিভাবে করা হবে। এই কাজের কারণে কোন মানুষের কাছে এ কথা বলা যাবে না যে, আমি তোমাদের হেদায়াতের জন্য এসেছি; তোমাদের কল্যাণ করছি, তোমরা আমার হাতে হাত দিয়ে ঈমান যখন আনলে তাহলে এবার আমাকে আমার বিনিময় প্রদান করো।

এ ধরনের কোন আশা মনে পোষন করা যাবেনা, এ কথা সত্যের প্রচারকদেরকে বলে দেয়া

হলো। এ কাজ করতে গেলে কি ধরনের বাধা আসবে তাও স্পষ্ট করে বলে দিয়ে ধৈর্য ধারণ করতে বলা হলো। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর নবীকে দায়িত্ব দিলেন এবং কিভাবে তিনি কাজ করবেন, কার্য ক্ষেত্রে যে সব অসুবিধা দেখা দিত তা দূর করার পথের সন্ধান দিতে থাকলেন। অর্থাৎ ক্রমাগতভাবে ওহী অবতীর্ণ হতে থাকলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওহী ধারণ করার ক্ষমতা ক্রমশঃ অর্জন করলেন। হযরত জিবরাঈল যে সময়ে ওহী তাঁর কাছে আবৃত্তি করতেন তিনিও তাঁর সাথে দ্রুত আবৃত্তি করতে থাকেন। প্রিয় বন্ধুর এই অস্থিরতা–ব্যস্ততা মহান আল্লাহর কাছে সহ্য হলো না। তিনি তাঁর রাসূলকে বললেন–

وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ، وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا–

কোরআন পড়ার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করো না যতক্ষণ না তোমার প্রতি তার ওহী পূর্ণ হয়ে যায় এবং দোয়া করো, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।

আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবিবকে জানিয়ে দিলেন, আমার ওহী তোমার স্মৃতিতে অম্লান রাখা আমার দায়িত্ব। তুমি শুধু তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকো। আল্লাহ্ বলেন–

لاَتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ–اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ–فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ–ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ-

এই ওহী অত্যন্ত দ্রুত মুখস্থ করে নেয়ার জন্য তোমার জিহ্বা দ্রুত সঞ্চালন করো না। তা মুখস্থ করিয়ে দেয়া ও পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। সুতরাং, আমি যখন (আমার পক্ষ থেকে ফেরেশ্তা) পড়তে থাকি, তখন তুমি তার পাঠকে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকে। তারপর এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াও আমারই দায়িত্ব।

কোরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ পৃথিবী সৃষ্টি করে মানুষসহ অসংখ্য প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। এসব প্রাণী পৃথিবীতে কিভাবে জীবন পরিচালিত করবে, সে প্রবণতা সৃষ্টিগতভাবেই তাদের ভেতরে দান করা হয়েছে। প্রতিটি প্রাণীর জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা যে খাদ্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারা সে খাদ্যই আহার করে জীবন ধারণ করে। মাংসাশী প্রাণীসমূহ বৃক্ষ-তরু-লতা আহার করে না। আবার উদ্ভিদ আহার করে যেসব প্রাণী, তারা রক্ত-মাংস আহার করে না। প্রাণীসমূহকে যেসব নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে দেখা যায়, তা তাদের সৃষ্টিগত প্রবণতা। এ প্রবণতা দিয়েই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের জন্য পৃথক কোন বিধি-বিধানের প্রয়োজন হয় না। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে যে নিয়ম-কানুনের অধীন করে সৃষ্টি করেছেন, তারা সে নিয়মের অধীনেই জীবনকাল

অতিবাহিত করে। এ জন্য কখনো এটা দেখা যায়নি যে, মাছ হঠাৎ করে পানি ত্যাগ করে স্থলে এসে বসবাস করছে। আবার বাঘকে এমন দেখা যায়নি যে, তারা বন-জঙ্গল ত্যাগ করে সমুদ্রে গিয়ে বসবাস করছে। তারা সবাই আল্লাহর নিয়মের অধীন। আর আল্লাহর নিয়মের কোন পরিবর্তন কখনো হয় না। মহান আল্লাহ্ বলেন-

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيْلاً-

তুমি আল্লাহর নিয়মে কোন ধরনের পরিবর্তন হতে, কোন প্রকারের ব্যতিক্রম হতে দেখতে পাবে না। (সূরা ফাতির)

সুতরাং, আইন-কানুন, বিধি-বিধানের প্রয়োজন হয় মানুষের। মানুষের জন্যই জীবন বিধানের প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যেই পৃথিবীতে নবী ও রাসূলদের আগমন ঘটেছে এবং তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'য়ালা ওহী যোগে জীবন বিধান প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন প্রেরণ করা হয়েছে। এ কোরআন দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান জ্ঞানের কোন বিশেষ শাখা নিয়ে শুধু আলোচনা করে না, বরং মানব জাতির জন্য যেখানে যা প্রয়োজন তাই নিয়ে এ কোরআনে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এ কোরআনের সবটুকুই মানুষের জন্যই আলোচনা করা হয়েছে। মানুষই হলো এ কিতাবের মূল আলোচ্য বিষয়। মানুষকে বোঝাতে গিয়ে অন্যান্য বিষয় যতটুকু প্রয়োজন-ঠিক ততটুকুই আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের যখন কোনই অস্তিত্ব ছিল না, তখন থেকে শুরু করে, তার শেষ পরিণতি পর্যন্ত এ কিতাব আলোচনা করেছে। আত্মার জগতে মানুষকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁর প্রতিপালক সম্পর্কে এবং সে কি জবাব দিয়েছিল, সে কথা এ কোরআন আলোচনা করেছে। আবার সেখান থেকে মাতৃগর্ভে যখন তাকে প্রেরণ করা হলো, তখন সে কি অবস্থায় ছিল, সে বিষয়টিও আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন-

يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ، ذٰالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ-

তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে তিন তিনটি অন্ধকার পর্দার অভ্যন্তরে একের পর এক আকৃতি দান করে থাকেন। (যিনি এ কাজগুলো সম্পাদন করেন) সেই আল্লাহই তোমাদের রব্ব। তিনিই প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিকারী-তিনি ব্যতিত কোন ইলাহ নেই। (সূরা যুমার-৬)

তিনটি পর্দা বলতে এখানে মায়ের পেট, বাচ্চা যে থলির ভেতরে অবস্থান করে সে থলি এবং যে ঝিল্লি দিয়ে বাচ্চা আবৃত থাকে সে ঝিল্লিকে বুঝানো হয়েছে। পৃথিবীতে আগমন পূর্ব মুহূর্তে মানুষের কি অবস্থা ছিল, তা আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সূরা আস্ সাজ্দায় বলেন-

الَّذِىْ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَخَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ، ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ، قَلِيْلاً مَّاتَشْكُرُوْنَ-

যে জিনিস তিনি সৃষ্টি করেছেন তা উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে, তারপর তার বংশ উৎপাদন করেছেন এমন সূত্র থেকে যা তুচ্ছ পানির মতো। তারপর তাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করেছেন এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, আর তোমাদের কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন, তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

মানুষ সৃষ্টির উপাদান ও প্রক্রিয়া, তারপর একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষ কিভাবে কোন প্রক্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করবে, তার শারীরিক কাঠামো, তাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য এবং তার দায়িত্ব-কর্তব্য কি, ইত্যাদি বিষয় স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছি আমি এবং এর ভেতরে যা কিছুই রয়েছে, কোন কিছুই আমি বৃথা সৃষ্টি করিনি। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এসব সৃষ্টি করেছি। পৃথিবীর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি তোমাদের কল্যাণের জন্য। এসব কিছুই তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছি। আর তোমাদের ওপরে আদেশ দিয়েছি, তোমরা কেবল আমারই আদেশ পালন করবে। আমার বিধান অনুসরণ করবে। আমার দাসত্ব ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করবে না আর আমার দাসত্বের মধ্যেই তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

অর্থাৎ এ কিতাব মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণ নিয়ে আলোচনা করেছে। কোন কাজ করলে, কোন পথে অগ্রসর হলে, কিভাবে জীবন পরিচালিত করলে মানুষ একটি সুখী সমৃদ্ধশালী শান্তিপূর্ণ, ভীতিহীন, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, নিরাপত্তপূর্ণ পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি গঠন করতে সক্ষম হবে এবং পরকালীন জীবনে কিভাবে কল্যাণ লাভ করতে পারবে, সে বিষয়ে এ কোরআনে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ কোন পথে নিজেকে অগ্রসর করালে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিজেকে পৌছে দেবে, পৃথিবীর জীবন হবে অস্থিরতা আর শঙ্কা জড়িত, পরকালীন জীবনে তাকে নিক্ষিপ্ত হতে হবে যন্ত্রণাময় জীবনে, তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষকে নির্ভুল কর্মনীতি ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার দিকে মানুষকে অগ্রসর করানোর লক্ষ্যেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং মানুষকে নিয়ে এ জন্যই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের আলোচনার বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আরেকটি বড় সত্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আর সে সত্যটি হলো, কোরআন যে কোন মানুষের রচনা করা কিতাব নয়, তা যে কোন চিন্তাশীল পাঠকই স্পষ্ট অনুভব করতে সক্ষম হয়। কারণ এ কিতাব যাঁর ওপরে এবং যে পরিবেশে অবতীর্ণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং

সে পরিবেশ ছিল মূর্খতায় আচ্ছন্ন। একজন নিরক্ষর মানুষের পক্ষে অজ্ঞানতার পরিবেশে অবস্থান করে এমন বৈজ্ঞানিক আলোচনা সমৃদ্ধ কিতাব রচনা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, এ সত্য কোরআনের আলোচিত বিষয়ই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

কোরআনের সম্মান ও মর্যাদা

বিশ্বের সর্বকালের সর্বযুগের একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই কোরআনে কারীমের মাধ্যমে একটি জাতির পরিবর্তন সাধিত করেছিলেন। গোটা বিশ্বে রেডিক্যাল চেঞ্জ এনেছিলেন। এ কথা অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি, পৃথিবীতে মানব রচিত কোন বিধান দিয়ে কোনদিন কল্যাণ বয়ে আসবে না। জাতি সুখ এবং সমৃদ্ধি কখনো দেখতে পাবে না। অপরের রক্তচক্ষু দেখে গোলাম হয়ে চিরকাল কাটাতে হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। ভয়ে আতঙ্কে কাতর হয়ে পড়তে হবে। এই বিশ্বের মাঝে যদি আমরা বলিষ্ঠতা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে আগ্রহী হই, একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ ও জাতি কামনা করি, তাহলে কোরআনে কারীম প্রবর্তিত একটি সমাজ ব্যতীত অন্য কোন পথে তা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

আল্লাহর কোরআন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আল্লাহ তা'য়ালা আর অন্য কিছু দেননি। গোটা বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো কোরআন। আল্লাহর এই কিতাব হচ্ছে এই মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময়। মানুষের হেদায়াতের জন্য এই কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত কিছুই বলে দিয়েছেন, নতুন করে কোন কিছু আর বলার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে আর একটি শব্দ এবং অক্ষরও মানুষের কাছে হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করা হবে না। এই কোরআনের সম্মান ও মর্যাদা যে কতবেশী, তা মানুষের পক্ষে কল্পনাও করা সম্ভব নয়। এ জন্য আল্লাহর এ কিতাবের সম্মান ও মর্যাদা সবচেয়ে বেশী।

সর্বময় ক্ষমতার উৎস হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং যাবতীয় সম্মান ও মর্যাদা তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁর পক্ষ থেকেই এ কোরআন মানব জাতির জীবন বিধান হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যত নিয়ামত দান করেছেন, তার ভেতরে এই কোরআনই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এই নেয়ামতের গুরুত্ব, সম্মান ও মর্যাদা অনুধাবন করার জন্যই একে অবতীর্ণ করা হয়েছে রমজানের কদরের রাতে। এ সম্পর্কে সূরা বাকারায় মহান আল্লাহ বলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ–

রমজানের মাস, এতে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা গোটা মানব জাতির জন্য

জীবন-যাপনের বিধান আর এটা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ, যা সঠিক ও সত্য পথপ্রদর্শন করে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য পরিষ্কাররূপে নির্ধারণ করে।

কোরআনের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই তা রমজান মাসে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর যাদের জন্য এই কোরআনের মতো মহান নিয়ামত দান করা হয়েছে, তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা এই অমূল্য নিয়ামত লাভ করলে এ জন্য তোমরা শোকর আদায় করো। কিভাবে শোকর আদায় করতে হবে, সেটাও আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে, রোজা পালন করে শোকর আদায় করো।

ব্যক্তিগতভাবেও কোন মানুষ যদি তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে সফলতা অর্জন করে, তখন সে আনন্দ প্রকাশ করে। একটি জাতি যখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে সফলতা অর্জন করে, তখন সে জাতি বিজয় উৎসবের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করে। মুসলিম একটি মিল্লাতের নাম। এই মিল্লাত বা জাতির পিতা হলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম। এই জাতি গোটা পৃথিবীতে নেতৃত্ব দান করবে এ জন্য যে, এরা গোটা পৃথিবীতে কোরআনের আদর্শ বাস্তবায়ন করবে। কারণ কোরআনের আদর্শ যদি এরা বাস্তবায়ন না করে, তাহলে গোটা পৃথিবী জুড়ে ব্যাপক ভাঙন ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে অশান্তির দাবানল যেভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, এর মূল কারণ হলো, কোরআনের আদর্শের অনুপস্থিতি। এই কোরআন স্বয়ং সম্মানিত ও মর্যাদাবান এবং তা আগমন করেছে তাঁর অনুসারীদেরকে পৃথিবীতে সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করার লক্ষ্যে। অর্থাৎ কোরআন তার অনুসারীদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে দেয়। এটা কোন কল্পনার বিষয় নয়–মুসলমানদের অতীত ইতিহাস এ কথার সাক্ষী। যতদিন মুসলমানরা কোরআন অনুসরণ করেছে, গোটা পৃথিবীর নেতৃত্ব ছিল তাদেরই পদতলে।

সুতরাং, এই অমূল্য নিয়ামত দান করে তার শোকর আদায় করার জন্য রোজা পালন করতে বলা হয়েছে। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অনুধাবন করা যাক, যেমন জাতিয় কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জনগণ যেন তাতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় সে জন্য নির্দিষ্ট একটি সময় সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়। বিষয়টির ওপরে সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখে যেন সকল স্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করতে পারে। যে অনুষ্ঠানে জনগণ অংশগ্রহণ করবে, সে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুযায়ী সরকার ক্ষেত্র বিশেষে সময় বর্ধিত করে যেন সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা থেকে কেউ বঞ্চিত না থাকে। ঠিক তেমনি, কোরআনের সম্মান ও মর্যাদা এত বেশী যে, এটা লাভ করে মানুষ শোকর আদায় করবে। এই শোকর আদায় থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না থাকে, সে ব্যাপারেও আল্লাহ তা'য়ালা ব্যাবস্থা করে রেখেছেন।

আল্লাহর গৃহীত সে ব্যবস্থাটি হলো, কোন কারণবশতঃ শোকর আদায়ের মাস রমজান মাসে কেউ যদি রোজা পালন করার সুযোগ না পায়, তাহলে বছরের যে কোন সময়ে সে রোজার

কাযা আদায় করে শোকর পালনে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই সুযোগ দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র কোরআনের সম্মান ও মর্যাদার কারণে। রমজান মাসের রোজাকে শুধুমাত্র আল্লাহভীতি অর্জনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমই করা হয়নি, বরং মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে যে বিরাট ও মহান নিয়ামত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে দান করেছেন, রোজাকে তার শোকর আদায়ের মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের জন্য কোন নে'মাতের শোকর আদায় এবং অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোত্তম পদ্ধতি এটাই তো হতে পারে, যে বিরাট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ নিয়ামত দান করা হয়েছে, নিয়ামত যারা লাভ করলো, তাদের দায়িত্ব হলো সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপযোগী করে নিজেকে গঠন করার জন্য সর্বাত্মক সাধনায় লিপ্ত হওয়া।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কোরআনের মতো নিয়ামত এ জন্য আমাদেরকে দান করেছেন যে, আমরা তাঁকে সন্তুষ্ট করার পথ ও পদ্ধতি অবগত হয়ে সে অনুসারে নিজেদেরকে প্রস্তুত করবো এবং গোটা পৃথিবীকেও সেই পথেই পরিচালিত করার জন্য সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করবো। আর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো রোজা এবং রমজান মাসে এ জন্যই কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোরআন দিয়ে আমাদেরকে ধন্য এবং বিজয়ী করা হয়েছে। আমরা শোকর আদায় শেষে বিজয় উৎসব যেন উদযাপন করতে পারি এর জন্য দান করা হয়েছে ঈদ উৎসব। মহান আল্লাহ্ বলেন–

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا–

হে নবী ! বলো, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অপার করুণা যে, তিনি এটা (কোরআন) প্রেরণ করেছেন। এ জন্য তো লোকদের আনন্দ ফূর্তি করা উচিত। (ইউনুস-৫৮)

কোরআনের মতো অতুলনীয় নিয়ামত লাভ করে আমরা বিজয়ী হয়েছি, সেই বিজয় উৎসবই হলো ঈদ। কোরআনের মতো নিয়ামতকে যে রাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ–

আমি এটি এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি। (সূরা দুখান-৩)

এভাবে সূরা কদরেও বলা হয়েছে, এ কোরআন আমি কদরের রাতে অর্থাৎ অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। সে রাত যে কতটা মহিমান্বিত রাত, যার মর্যাদা সম্পর্কে কোন মানুষ কল্পনাও করতে সক্ষম নয়। অগণিত রাত-ব্যাপী নামাজেরত থেকে যে সওয়াব অর্জন করতে পারে, সে রাতে এক রাকাআত নামাজ আদায় করে সেই একই সওয়াব অর্জন করতে পারে। এ রাতের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কোরআনের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

وَاِنَّهٗ فِیْۤ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَكِیْمٌ-

প্রকৃতপক্ষে এটা মূল কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে যা আমার কাছে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ। (সূরা যুখরুফ-৪)

কোরআনের পরিচয় আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়ে এ কথাও স্পষ্ট করে দিলেন যে, কোন ব্যক্তি যদি তার অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে আল্লাহর কোরআনের মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে সক্ষম না হয়, কোরআন পরিবেশিত অনুপম জ্ঞান ভান্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করে তা অনুসরণ করতে না পারে, তাহলে এটা সে ব্যক্তির লজ্জাজনক ব্যর্থতা আর দুর্ভাগ্য ছাড়া কি বলা যেতে পারে। কেউ যদি এ কিতাবকে ছোট করার প্রয়াস পায় এবং কিতাবের বক্তব্যের মধ্যে ভুল ধরার চেষ্টা করে তাহলে সেটা তার চরম হীনমন্যতা বৈ আর কিছু নয়।

কোরআনকে কেউ সম্মান-মর্যাদা না দিলেই এর মূল্যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। কেউ কোরআনের প্রভাব ও জ্ঞানকে গোপন করতে চাইলেই তা গোপন করতে পারে না। এটা যথাস্থানে একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব যাকে এর অতুলনীয় শিক্ষা, মু'জিযাপূর্ণ বাগ্মিতা, নিষ্কলুষ জ্ঞান এবং যাঁর বাণী তাঁর গগনচুম্বী ব্যক্তিত্ব অতি উচ্চে তুলে ধরেছে। সুতরাং একে কেউ অবমূল্যায়ন করলেই তা মূল্যহীন হয়ে যায় না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ -

এটা একটি কিতাব, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, বড়ই কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ। (সূরা আনআ'ম- ৯২)

এই কোরআনের যেমন সম্মান ও মর্যাদা, একে যারা অনুসরণ করবে, তাদেরও সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন, যারা আমার কোরআন অনুসরণ করবে, তাদেরকে আমি পৃথিবীতে নেতৃত্ব দান করে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবো। কেননা, আমার এ কিতাব কল্যাণময় ও বরকতর্পূণ। এ বরকতপূর্ণ কিতাব আমি ইতিপূর্বে নবী ও রাসূলদেরকে দান করেছিলাম। এ থেকে কল্যাণ লাভ তারাই করতে পারে, যারা না দেখে তাদের রব্বকে ভয় করে এবং আখিরাতের দিনে হিসাব গ্রহণের বিষয়ে ঈমান রাখে।

কোরআন অধ্যয়নে সতর্কতা অবলম্বন

এ কিতাব যিনি পাঠ করছেন, তিনি তা থেকে হেদায়াত লাভ করতে পারেন। সেই সাথে এর শ্রোতাদেরকেও বলা হচ্ছে, তোমরা তা শ্রদ্ধাভরে নীরবে শুনে তা থেকে হেদায়াত লাভ করার চেষ্টা করো। হেদায়াত লাভ করা আল্লাহর রহমত ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং নীরবে কোরআন শুনে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভ করার জন্য দোয়া করতে

থাকো। এ কিতাব যিনি পাঠ করবেন তার প্রতি আদেশ দেয়া হচ্ছে–

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً–

আর কোরআন থেমে থেমে পাঠ করো।

আল্লাহর কিতাবের অতি উচ্চ মর্যাদার কারণে তা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তিলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। ধীর গতিতে প্রতিটি শব্দ মুখে উচ্চারণ করতে হবে এবং বিরতি দেয়ার স্থানে বিরতি দিতে হবে। যেন এ কোরআনের অর্থ ও তাৎপর্য পরিপূর্ণভাবে তিলাওয়াতকারী অনুভব করতে পারে। তার বিষয়বস্তু হৃদয়পটে অঙ্কিত হয় এবং তা অনুসরণে উৎসাহ সৃষ্টি হয়। কোরআন তিলাওয়াতের সময় যেন শয়তান কোনভাবেই প্রতারণা করতে না পারে, সেদিকেও তিলাওয়াতকারী বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ–

তারপর যখন তোমরা কোরআন তিলাওয়াত করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে। (সূরা আন্ নাহ্ল–৯৮)

কোরআন তেলাওয়াতের শুরুতেই আয়ুযুবিল্লাহিমিনাশ্ শাইত্বানির রাজিম মুখে উচ্চারণ করলেই হবে না, মনের মধ্যে কোরআন বুঝার ইচ্ছা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে, শয়তান যেন প্রতারণা করতে সক্ষম না হয়, কোরআনের ভুল অর্থ গ্রহণ করা না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এ কিতাবের প্রতিটি কথাকে কিতাবেরই আলোকে দেখতে হবে এবং নিজের মনগড়া মতবাদ বা অন্য কারো কাছ থেকে ধার করা চিন্তার মিশ্রণে কোরআনের শব্দাবলীর এমন কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবেনা, যা আল্লাহর বক্তব্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিপন্থী। সেই সাথে তেলাওয়াতকারীর মনে এ চেতনা এবং উপলব্ধিও জাগ্রত রাখতে হবে যে, সে যেন কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে পারে এবং কোরআনের ভুল অর্থ গ্রহণ না করে, কেননা এ ব্যাপারে শয়তান তার পেছনে সক্রিয় তৎপরতা চালাচ্ছে।

কোরআন যেন আল্লাহ প্রদত্ত অর্থে তিলাওয়াতকারী বুঝতে না পারে, এ জন্য শয়তান সবচেয়ে বেশী তৎপর। এ কারণে মানুষ যখনই এ কিতাবের দিকে ফিরে আসে তখনই শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার এবং কোরআন থেকে পথনির্দেশনা লাভ থেকে বাধা দেয়ার এবং তাকে ভুল চিন্তার পথে পরিচালিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে।

এ কারণে আল্লাহর কোরআন অধ্যয়নের সময় অধ্যয়নকারীকে অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে, যেন শয়তানের প্ররোচনা ও সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশের কারণে সে হেদায়াতের উৎস কোরআনের কল্যাণকারিতা থেকে বঞ্চিত না হয়ে পড়ে। কারণ যে মানুষ আল্লাহর কিতাব থেকে সঠিক সত্য পথের সন্ধান লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে, সে পৃথিবীর কোন উৎস

থেকেই আর সত্য পথের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হবে না। শয়তানের প্রতারণার কারণে কোন ব্যক্তি যদি কোরআন অধ্যয়নের সময় বিভ্রান্ত হয়ে ভ্রষ্টতা ও প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে পড়ে, তাহলে পৃথিবীতে এমন কোন জ্ঞান নেই, যে জ্ঞান তাকে বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে।

আল্লাহর এই কোরআন যে রূপে অবতীর্ণ হয়েছে, যে অর্থ প্রকাশ করেছে, যেদিকে মানুষকে নিতে চেয়েছে, এসব দিকে কেউ যদি যেতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই শয়তানের প্রতারণা থেকে সতর্ক ও সচেতন হতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কোরআন অবতীণ করেছেন এবং এর সংরক্ষণের দায়িত্বও তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেছেন–এ কথা শয়তান জানার পরে সে এটা অনুভব করেছে, এই কোরআনকে কোনক্রমেই ধ্বংস করা যাবে না। অতএব কোরআন যখন ধ্বংস করা যাবে না তখন যারা কোরআন বুঝার চেষ্টা করবে তাদেরকে প্রতারিত করতে হবে। কোরআনের স্পষ্ট বক্তব্য যেন মানুষ অনুধাবন করতে সক্ষম না হয়, বিভ্রান্তির গোলক ধাঁ-ধাঁয় যেন নিমজ্জিত হয়, এ ব্যাপারে শয়তান কোরআন অধ্যয়নকারীর প্রতি তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এ জন্য কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্তে শয়তানের প্রতারণা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং সে পদ্ধতিও আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, শয়তানের প্রতারণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে এবং যে কথা বলে বান্দা আশ্রয় প্রার্থনা করবে সে কথাটি হলো–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

অভিশপ্ত শয়তানের প্রতারণা থেকে আমি মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করছি। (সূরা আন্ নাহ্‌ল-৯৮)

কোরআন শ্রবণে সতর্কতা অবলম্বন

এ কোরআন যখন পাঠ করা হবে, তখন শ্রোতারা কিভাবে কোরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, এ সম্পর্কে আল্লাহর কোরআনের সূরা আরাফের ২০৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ–

যখন কোরআন তোমাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন তা খুবই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নীরব থাকো, সম্ভবত তোমাদের প্রতিও রহমত অবতীর্ণ হবে।

মানব জাতির জন্য কোরআনের মোকাবেলায় শ্রেষ্ঠ নিয়ামত আর দ্বিতীয়টি নেই। এই কোরআন যারা অধ্যয়ন করে বুঝে অনুসরণ করবে, তারা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। মুসলমানগণ নামাজে প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সত্য সহজ সরল পথ কামনা করে। আর মানুষের এ কামনার জবাবে

আল্লাহ্ তা'য়ালা পরিপূর্ণ কোরআন তার সামনে পেশ করেন। সূরা ইয়াছিনে বলা হয়েছে-

وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ-هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ-

আল্লাহর দাসত্ব করবে, এটাই সহজ সরল পথ। (সূরা ইয়াছিন)

মুক্তির সোপানে পৌঁছে দেয় এই কোরআন। আল্লাহর কোরআন যেন মানুষ উপলব্ধি করতে সক্ষম না হয়, এ জন্য শয়তান তার মুরীদদের সাথে নিয়ে কোরআন শোনার পরিবেশ বিঘ্নিত করে। আল্লাহর কিতাব যাতে মানুষের কানে পৌঁছতে না পারে, শয়তান সে ব্যবস্থা করতে থাকে। এ গ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শয়তান শুধু ইবলিসই নয়-মানুষের নফছ্ এক শয়তান, জ্বিন শয়তান ও মানুষের ভেতরেও শয়তান রয়েছে।

এই চার ধরনের শয়তান একযোগে প্রচেষ্টা চালায় যেন কোরআন কোন মানুষ শুনতে না পারে। আল্লাহর এ কিতাব শোনা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে এসব শয়তান এক শ্রেণীর মানুষকে এভাবে ধোকা দিয়ে থাকে যে, 'কোরআন হলো আল্লাহর বাণী। আর আল্লাহর বাণী বড়ই জটিল, এটা বুঝতে হলে যে জ্ঞান ও যোগ্যতা প্রয়োজন-তা আমাদের নেই। অতএব সামান্য জ্ঞানের অধিকারী হয়ে কোরআন বুঝা যাবে না। অতএব কোরআনের কোন তাফসীর পড়াও যাবে না-করাও যাবেনা।'

এভাবে শয়তান এক শ্রেণীর নামাজী লোকদেরকে কোরআন বুঝা থেকে দূরে রাখে। আরেক শ্রেণীর মানুষকে শয়তান এভাবে ধোকা দিয়ে থাকে, 'কোরআন হলো আরবী ভাষায় অবতীর্ণ একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থ অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ করলেও এর সঠিক মর্মার্থ অপ্রকাশিতই থেকে যায়। সুতরাং পরিবর্তিত ভাষায় কোরআন অধ্যয়ন করে লাভ নেই। আরবীতে তিলাওয়াত করলেই প্রতিটি অক্ষর উচ্চারণ করার সাথে সাথে আমলনামায় দশ দশটি করে সওয়াব লেখা হতে থাকবে। অতএব আরবী ভাষার কোরআন আরবীতেই তিলাওয়াত করে সওয়াব অর্জন করতে হবে, অন্য ভাষায় তা পড়ার কোন প্রয়োজন নেই।' এভাবে শয়তান সওয়াবের লোভ দেখিয়ে মানুষকে দূরে রাখার চেষ্টা করে।

শয়তান আবার এভাবে ধোকা দেয় যে, 'কোরআন হলো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এ গ্রন্থ সুমধুর সুরে পাঠ করলে সওয়াব অর্জন করা যায়। শুনলেও সওয়াব হয়। নামাজে তা পাঠ করতে হবে। প্রতিদিন সকালে ফজরের নামাজ আদায় করে তিলাওয়াত করলে সওয়াবে আমলনামা পরিপূর্ণ হবে। কিন্তু এ গ্রন্থ যে শিক্ষাদর্শ মানুষের সামনে পেশ করেছে, তা ঐ যুগে শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য ছিল, যখন তা অবতীর্ণ হয়েছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যুগে পৃথিবীর সার্বিক অবস্থা বড়ই জটিল। এখানে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা অবস্থান করছে। কোরআনের বিধান এ অবস্থায় প্রয়োগ করতে গেলেই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে। ফলে পৃথিবীতে হানহানি সৃষ্টি হবে। সুতরাং, বর্তমানের এই জটিল অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অনুসারে ব্যক্তি, পরিবার,

সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত করতে হবে। কোনক্রমেই রাজনীতির অপবিত্রতার অঙ্গনে কোরআনের ন্যায় পবিত্র গ্রন্থকে টেনে এনে অপবিত্র করতে দেয়া হবে না।'

এভাবে শয়তান কোরআনে থেকে হেদায়াত লাভ করা থেকে মানুষকে বিরত রাখে। কোরআনের মাহফিল অনুষ্ঠিত হলে অসংখ্য মানুষ তা শুনতে যায়। এ মাহফিল যেন অনুষ্ঠিত হতে না পারে, এ জন্য শয়তান তার অনুগতদের দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আবার শয়তান কোরআনের মাহফিলে মানুষ যেন যেতে না পারে, সে পথেও নানা ধরনের বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করে। যারা বাধাতিক্রম করে মাহফিলে যায়, তারাও যেন মনোযোগের সাথে কোরআন শুনতে না পারে, এমন অবস্থা তাদের ভেতরে সৃষ্টি করে দেয়।

এ জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা আ'রাফে বলেছেন, আমার কোরআন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনবে। যিনি তোমাদেরকে কোরআন শোনাচ্ছেন, তোমার পূর্ণ চেতনা একমাত্র তাঁর দিকেই নিবিষ্ট করে কোরআন শোনো। যখন আমার কিতাব থেকে তোমাদেরকে শোনানো হয়, তখন এমন পরিবেশের সৃষ্টি করো না, যাতে আমার বাণী অনুধাবন করতে কোন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়। কোরআন অনুধাবন করে যারা সত্য পথ লাভ করেছে, আমার রহমত তাদের ওপরে বর্ষিত হচ্ছে। তুমিও কোরআন শুনে সত্য পথ লাভ করে আমার রহমতের অংশ নিতে পারো।

কোরআন কোন অবস্থায় স্পর্শ করা যেতে পারে

আল্লাহ্ স্বয়ং পবিত্র এবং তাঁর বাণীও পবিত্র। তাঁর বাণী সম্বলিত পবিত্র কোরআন কোন অবস্থাতেই অপবিত্র শরীরে স্পর্শ করা যাবে না। এ মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব স্পর্শ করতে হলে স্পর্শকারীকে অবশ্যই শরীর ও পোষাকের দিক দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। এ কোরআনের মর্যাদা সম্পর্কে সূরা ওয়াকীআয় বলা হয়েছে–

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ، فِىْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ ، لَايَمَسُّهٗ اِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ، تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ–

প্রকৃতপক্ষে এটা এক অতীব উচ্চ মর্যাদার কোরআন। একটি সুরক্ষিত গ্রন্থে দৃঢ়ভাবে লিপিবদ্ধ, যা পবিত্রতম সত্তা (ফেরেশ্তাগণ) ব্যতীত আর কেউ স্পর্শ করতে সক্ষম নয়। এটা রাব্বুল আলামীনের অবতীর্ণ করা।

আল্লাহর এই কোরআন এক নিখুঁত মাত্রায় পরস্পর সংযুক্ত ও সুসংবদ্ধ জীবন বিধান হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এতে আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে চরিত্র, ইবাদাত, সভ্যতা সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা, আইন ও আদালত, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ ও সন্ধিনীতি তথা মানব জীবনের সমগ্র ক্ষেত্র ও বিভাগ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ; বিস্তীর্ণ ব্যবস্থা-বিধান দান করা হয়েছে। এ কোরআনে কোন একটি জিনিসও অপর কোন

একটি জিনিস থেকে বিচ্ছিন্ন ও অসামঞ্জস্যমূলক নয়। এ কিতাবে যা বর্ণিত হয়েছে তা অবিচল; অপরিবর্তনীয় এবং এর সম্মান ও মর্যাদার দিকে দৃষ্টি রেখে তা অপবিত্রাবস্থায় পাঠ করা দূরে থাক, স্পর্শ করার অনুমতিও দেয়া হয়নি।

মানুষকে অপবিত্রতা মুক্ত করে সৃষ্টি করা হয়নি। পক্ষান্তরে আল্লাহর ফেরেশতাগণ যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। এ কোরআনে ফেরেশতাদের সত্তা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে 'পবিত্রতম সত্তা'। তাঁরা এ কোরআন যখন তখন স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু এই মানুষের দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে অপবিত্রতা। তা দেহের বাইরে নির্গত হলে কোন সময় মানুষের ওপরে গোসল ফরজ হয়ে দাঁড়ায়। আবার কোন অপিবত্রতা দেহ থেকে বাইরে এলে অজু করা আবশ্যক হয়। এ জন্য এসব অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে, পবিত্র স্থানে আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করতে হবে। এ বিষয়ে একটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, শয়তান স্বয়ং অপবিত্র এবং সে অপবিত্রতা পছন্দ করে। কোরআনের পাঠককে সে যদি অপবিত্র অবস্থায় পায়, তাহলে অতি সহজে সে তাকে প্রতারণা করতে সক্ষম হয়। এ জন্য আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন কালে পবিত্রতা অর্জনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

রাসূল কিভাবে কোরআন পাঠ করতেন

পবিত্র কোরআন যে মহামানবের ওপরে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাঁকে এ কিতাবের পঠনরীতিও শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ এ কিতাব যাঁর বাণী তিনিই তাঁকে তা পাঠ করার উপযুক্ত রীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। সুতরাং আল্লাহর রাসূল যে পদ্ধতিতে কোরআন তিলাওয়াত করতেন, তা ছিল মহান আল্লাহর শিখানো এবং সহীহ শুদ্ধ রীতি। ঐ একই রীতিতে কোরআন তিলাওয়াত করতে হবে পবিত্র কোরআনের অনুসারীদেরকে। আল্লাহর রাসূল কখনো দ্রুত গতিতে কোরআন তিলাওয়াত করতেন না। তিনি এমন রীতিতে তিলাওয়াত করতেন যে, প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট বুঝা যেত। তাঁর তিলাওয়াত শুনে পাঠক অনুভব করতে পারতো, আল্লাহ তা'য়ালা কি বলছেন। আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত শুনে শ্রবণকারী প্রভাবিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিলাওয়াতের রীতি যদি এমন হয় যে, শ্রোতা রীতিমতো বিরক্তি বোধ করে অথবা তা অস্পষ্ট, এভাবে কোরআন তিলাওয়াত করা যাবে না। এ কিতাব তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূল প্রদর্শিত রীতিই অনুসরণ করতে হবে।

বুঝে স্পষ্ট উচ্চারণে কোরআন তিলাওয়াত করলে আল্লাহ কি বলছেন, তা তেলাওয়াতকারী যেমন বুঝতে পারে এবং তার ওপরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, এমন কোন আয়াত পাঠ করা হচ্ছে, যে আয়াতে আল্লাহর মূল সত্তা ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। সে আয়াত তিলাওয়াত করার ফলে মহান আল্লাহর বিরাটত্ব ও মহানত্ব তিলাওয়াতকারীর হৃদয়-মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। আবার যে আয়াতে আল্লাহর রহমত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, সে আয়াত পাঠ করার সময় আল্লাহর শোকরের আবেগে মন-মানসিকতা

উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এভাবে যে আয়াতে আযাবের কথা বলা হয়েছে, তা পাঠ করার ফলে হৃদয়ে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়। এক কথায় কোরআন পাঠ করার বিষয়টি যেন শুধুমাত্র শব্দের উচ্চারণ ও ধ্বনি তোলার মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রেখে তিলাওয়াত গভীর চিন্তা-ভাবনা, অনুধাবন ও হৃদয়ংগম করা পর্যন্ত প্রসারিত করতে হবে।

আল্লাহর রাসূল কিভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, এ ব্যাপারে হযরত আনাস (রাঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি জানিয়ে ছিলেন যে, আল্লাহর রাসূল প্রতিটি শব্দ টেনে দীর্ঘ করে পাঠ করতেন। তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এমনভাবে পাঠ করতেন যে, আল্লাহ রাহমান ও রাহীম এই শব্দগুলো খুব বেশী টেনে টেনে পাঠ করতেন। (বোখারী)

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আল্লাহর রাসূল কিভাবে কোরআন পাঠ করতেন। তিনি জানিয়ে ছিলেন, আল্লাহর রাসূল এক একটি আয়াত পৃথক পৃথকভাবে পাঠ করতেন এবং প্রতি আয়াত পাঠ করে থামতেন। যেমন আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন পাঠ করে থামতেন। তারপর আর রাহমানির রাহীম পাঠ করে থামতেন। এর পরে পাঠ করতেন মালিকি ইয়াও মিদ্দিন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (আঃ) এক একটি শব্দ সুস্পষ্ট উচ্চারণ সহকারে পাঠ করতেন। (তিরমিযী, নাসায়ী)

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান সালামা (রাঃ) বলেন, একদিন নবী করীম (সাঃ) এর সাথে আমি রাতে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন দেখলাম তিনি কোরআন এমনভাবে পাঠ করছেন যে, যেখানে আল্লাহর প্রশংসা করার কথা বলা হয়েছে, সেখানে তিনি প্রশংসা করছেন। যেখানে দোয়া চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে তিনি দোয়া করছেন। যেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় লাভের কথা বলা হয়েছে, সেখানে তিনি আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতেন। (মুসলিম, নাসায়ী)

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বলেন, একদিন রাতে আল্লাহর রাসূল নামাজে কোরআন পাঠ করছিলেন। তিনি যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌছলেন–

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

হে আল্লাহ! তুমি যদি তাদেরকে আযাব দাও, তাহলে তুমি তা দিতে সক্ষম। কারণ তারা তো তোমারই বান্দাহ্ মাত্র। আর তুমি যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে তা করার ক্ষমতা তোমারই ইখতিয়ারে। কেননা তুমি তো সর্বজয়ী ও মহাবিজ্ঞানী।' তিনি এই আয়াতটি বার বার পড়তে লাগলেন। আর এভাবে প্রভাত এসে গেল। (বোখারী, মুসনাদে আহমাদ)

অনেকে যেমন এক নিঃশ্বাসে কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে থাকেন। রাসূল কখনো এমন করতেন না। তিনি প্রতিটি আয়াতের শেষে বিরতি দিয়ে তারপর পরবর্তী আয়াত পাঠ করতেন। এর ফলে শ্রোতারা বুঝতে পারতো, কি পাঠ করা হচ্ছে এবং সে আয়াতে আল্লাহ্ কি বলছেন তার মনে কোরআনের প্রভাব সৃষ্টি হতো।

রাতের নির্জন পরিবেশে কোরআন তিলাওয়াত

অধ্যয়ন, সাধনা ও অনুধাবনের উপযুক্ত পরিবেশ হলো নির্জনতা। একাজগুলো নির্জন পরিবেশ ব্যতীত সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন হতে পারে না। জনকোলাহলপূর্ণ পরিবেশে একাগ্রতা সৃষ্টি হয় না। এ জন্য উল্লেখিত কাজগুলো সম্পাদন করার উপযুক্ত পরিবেশ হলো রাতের নির্জনতা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ জন্য রাতকে অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দান করেছেন। রাতে নামাজ আদায় ও কোরআন অধ্যয়নের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَّاَقْوَمُ قِيْلاً–

প্রকৃতপক্ষে রাতে শয্যা ত্যাগ করে ওঠা আত্মসংযমের জন্য অত্যন্ত বেশী কার্যকর এবং কোরআন যথাযথভাবে পাঠ করার জন্য যথার্থ। (সূরা মুয্যাম্মিল-৬)

যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সম্পাদন করা হবে, সে কাজ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করতে হবে। কাজের ভেতরে যদি প্রদর্শনেচ্ছা বিদ্যমান থাকে, তাহলে সে কাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে কবুল করার প্রশ্নই ওঠে না। কিয়ামতের ময়দানে এমন অনেক শহীদকে দেখা যাবে, সে জিহাদের ময়দানে জীবন দান ঠিকই করেছে, কিন্তু তার শাহাদাত আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছিল না। তার মনে এ উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিল যে, মানুষ তার বীরত্ব দেখবে, তার মৃত্যুর পরে তাকে জাতিয় হিরো হিসাবে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হবে, এ উদ্দেশ্যেই সে জিহাদের ময়দানে জীবন দান করেছিল। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি তো আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জীবন দান করোনি, তুমি জীবন দিয়েছিলে তোমার সুনাম বৃদ্ধি করার আশায়। তোমার মৃত্যুর পরে পৃথিবীতে মানুষ তোমার সুনাম করেছে। সুতরাং, তুমি তোমার প্রাপ্য লাভ করেছো। আজ তোমার প্রাপ্য হলো জাহান্নাম।

এভাবে অসংখ্য নামাজীকে, রোজা পালনকারীকে, হজ্জ আদায়কারীকে, দানকারীকে বলা হবে, লোকে তোমাকে নামাজী বলবে, পরহেজগার বলবে, হাজী সাহেব বলবে, এসব লক্ষ্যে তুমি নামাজ-রোজা-হজ্জ আদায় করেছো। দানবীর উপাধি লাভের আশায় দান করেছো। তোমার কোন কাজ আমাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ছিল না। সুতরাং আজ আমার কাছ থেকে তোমাদের প্রাপ্য কিছুই নেই।

মহান আল্লাহ রাতকে এ জন্য বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন যে, রাতের নির্জনতায় আরামের শয্যা ত্যাগ করে মানুষ যখন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে সেজদা দেয়, সে সেজদার মধ্যে

প্রদর্শনেচ্ছা থাকে না। নির্জন নিস্তব্ধ নিঝুম পরিবেশে আল্লাহর কিতাব বান্দাহ যখন পাঠ করে আল্লাহকেই শোনায়, তখন সে পাঠের ভেতর দিয়ে এক অনাবিল জান্নাতী আবেশের সৃষ্টি হয়।

তাছাড়া কোরআন অধ্যয়নের জন্য রাতই উপযুক্ত সময়। এ সময়ে কানে কোন কোলাহল আসে না, পৃথিবীতে জীবন ধারণ করার কোন উপকরণের চিন্তায় মনভারাক্রান্ত থাকে না। মন-মস্তিষ্ক থাকে সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত-উন্মুক্ত। আল্লাহর কোরআন এ সময়ে অধ্যয়ন করে অনুধাবন করার তখনই উপযুক্ত সময়। রাতের ইবাদাতের মর্যাদাও আল্লাহর কাছে অনেক বেশী। রাতে নামাজের জন্য শয্যা ত্যাগ করে ওঠা এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ।

গোটা দিনের কর্মক্লান্ত দেহ-মন এ সময় বিশ্রাম কামনা করে। এ সময়ে দেহ-মনকে বিশ্রাম লাভের সুযোগ না দিয়ে নামাজ আদায়-কোরআন তিলাওয়াত অবশ্যই সাধনার বিষয়। এ সাধনা মানুষের কুপ্রবৃত্তি দমন করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখার একটি প্রবল কার্যকর পন্থা সন্দেহ নেই। এভাবে যে ব্যক্তি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং নিজের দেহ-মনের ওপর প্রবল প্রতিপত্তি সৃষ্টি করতে পারে, নিজের যাবতীয় শক্তিমত্তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়, সে ব্যক্তি সর্বাধিক দৃঢ়তার সাথে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রসর হয় এবং পৃথিবীর বুকে এ আন্দোলনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে ভূমিকা রাখতে পারে।

রাতের নামাজ ও কোরআন তিলাওয়াত মানুষের কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টির একটি কার্যকর পদ্ধতি। কারণ গভীর রাতে বান্দাহ ও আল্লাহর মধ্যে প্রতিবন্ধক ও অন্তরাল সৃষ্টিকারী কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। এ সময়ে বান্দাহ আল্লাহর কাছে যা বলে, তা তার হৃদয়ের অতল তলদেশ থেকে উত্থিত কথাগুলোই বলে থাকে। এসবে কোন ধরনের প্রদর্শনেচ্ছার স্পর্শ থাকে না। রাতের ইবাদাত হলো মানুষের বাইরের চরিত্র আর ভেতরের প্রকৃত চরিত্রে সামঞ্জস্যতা সৃষ্টির উৎকৃষ্ট মাধ্যম। ব্যক্তি দিনের আলোয় মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজে, কোরআন তিলাওয়াতে সময় ব্যয় করতে পারে। কিন্তু গভীর রাতে যখন সবাই গভীর সুসুপ্তিতে নিমগ্ন থাকে, তখন ব্যক্তি সবার অগোচরে কোরআন তিলাওয়াত করে, নামাজ আদায় করে, এগুলো সে করে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যেই।

দিনের নামাজ ও কোরআন তিলাওয়াত রাতের নামাজ–কোরআন তিলাওয়াতের তুলনায় অনেক সহজ। ঘুমে দু'চোখ যখন বন্ধ হয়ে আসতে চায়, দেহ ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চায়, এসব কিছুকে উপেক্ষা করে মানুষ যখন নামাজে–তিলাওয়াতে নিমগ্ন হয় এবং এটা যদি অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মানুষের ভেতরে অবিচলতা ও স্থিতিশীলতার গুণাবলী সৃষ্টি হয়। দ্বীনি আন্দোলনের ময়দানে সে অধিক দৃঢ়তা সহকারে এগিয়ে যেতে থাকে। বাতিল সৃষ্ট যাবতীয় কঠিন পরিস্থিতি, সে অবিচলতা ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

কোরআন তিলাওয়াতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপকারিতা

মানুষ যে কোন কর্মই সম্পাদন করুক না কেন, সে কর্মের একটি ফল অবশ্যই সে লাভ করে থাকে। যে কাজে কোনো ফল লাভ করা যাবে না, জ্ঞান-বিবেকসম্পন্ন কোনো মানুষের পক্ষে সে কাজে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হয় না। মানুষ তার শ্রমের বিনিময় লাভ করবে, মনে আশা নিয়েই সে শ্রমদান করে থাকে। অনুরূপ আল্লাহর কোরআন তিলাওয়াতকারী ও নামাজ আদায়কারী যদি তিলাওয়াত ও নামাজের মাধ্যমে কোন ফল লাভ না করে, তাহলে এটা বুঝতে হবে, তার কোরআন তিলাওয়াত ও নামাজ আদায় যেমনভাবে হওয়া উচিত, তেমনভাবে হচ্ছে না। ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর লোমহর্ষক নির্যাতনের মুখে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষের শক্তি অবিচলতা ও দৃঢ়তা মাত্র দুটো জিনিসের মাধ্যমে অর্জন করতে সক্ষম হয়। তার একটি যথাযথভাবে নামাজ আদায় এবং অপরটি কোরআন অধ্যয়ন।

কারণ নামাজ ও কোরআন আন্দোলনের কর্মীদেরকে এমন সুগঠিত চরিত্র ও উন্নত অনুপম যোগ্যতার অধিকারী করে গড়ে তোলে এমন শক্তি তার ভেতরে সঞ্চারিত করে, যে শক্তির সাহায্যে সে বাতিলের প্রবল কঠোরতা ও নির্যাতনের মোকাবেলায় শুধু টিকেই থাকে না, বাতিলের গতিকে স্তব্ধ করে দিতেও সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে নামাজ ও কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মানুষ এ শক্তি তখনই অর্জন করতে পারে, যখন সে কোরআনের শব্দগুলো পাঠ করেই ইতি-কর্তব্য পালন করে না, বরং কোরআন প্রদর্শিত শিক্ষাসমূহ যথাযথভাবে অনুধাবন করে তা বাস্তবায়িত করার জন্য চেষ্টা সাধনায় নিয়োজিত হয়। কোরআনের শিক্ষা তার দেহের শিরা উপশিরায় প্রবাহিত করে। নামাজের বিষয়টিও ঠিক তেমনি। একটার পর আরেকটা সেজদা আর শারীরিক কসরতের মধ্যে নামাজকে সীমাবদ্ধ না রেখে যারা নামাজের শিক্ষাকে নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করে, তখনই নামাজ তার ভেতরে শক্তি সৃষ্টি করে। এই শক্তির বলেই সে আল্লাহর পছন্দের বিপরীত পথ থেকে নিজেকে হেফাজত করতে সক্ষম হয়।

কোরআন তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত কণ্ঠনালী অতিক্রম করে তার মনের গহীনে যদি পৌঁছতে না পারে, তার হৃদয়তন্ত্রীতে যে তিলাওয়াত আঘাত করতে সক্ষম হয় না তাকে জিহাদের ময়দানে বাতিল শক্তির মোকাবিলায় ঐ তিলাওয়াত শক্তি সরবরাহ করা তো দূরের কথা, তার ঈমান ঠিক রাখার শক্তিই সরবরাহ করতে সক্ষম হয় না। এ ধরনের কোরআন তিলাওয়াতকারী মানুষের কাছে পরহেজগার হিসাবে সুনাম অর্জন করলেও সে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি মোটেও অর্জন করতে সক্ষম হয় না। এই শ্রেণীর কোরআন তিলাওয়াতকারী সম্পর্কেই নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তারা কোরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠনালীর নীচে অবতরণ করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমনভাবে ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়। (বোখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা)

প্রকৃতপক্ষে যে তিলাওয়াত ও অধ্যয়নের পরে ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, মনমানসিকতা, বাস্তব জীবনে চরিত্র ও কর্মনীতিতে কোরআনের কোন প্রভাব দেখা যায় না; কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না, কোরআনের বিপরীত কোন কর্মকান্ড ত্যাগ করে না, আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না, কোরআন যা হালাল করেছে, তা হালাল বলে গ্রহণ করে না, কোরআন যা হারাম করেছে, তা থেকে বিরত থাকে না, কোরআনের বিপরীত রাজনীতি ত্যাগ করে না, কোরআন যাদেরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে, তাদেরকে পরিত্যাগ করে না, একজন মুসলমানের কোরআন তিলাওয়াত-অধ্যয়ন এমন হতে পারে না। হযরত সুহাইব রুমী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আ'নহু বলেন, মহান আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'কোরআন কর্তৃক হারাম জিনিসকে যে হালাল করে নিয়েছে, সে কোরআনের প্রতি ঈমান আনেনি।' (আল হাদীস)

যারা কোরআন তিলাওয়াত-অধ্যয়ন ও কোরআনের তাফসীর শোনার পরেও নিজেদের চরিত্র সংশোধন করতে সক্ষম হয়নি, আত্মিক উন্নতি হয়নি, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোন চেষ্টা-সাধনা করেনি, তাদের তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন কোরআনের প্রতি বিদ্রুপ করার শামিল। এ ধরনের লোকগুলো আল্লাহর মোকাবেলায় যেমন নিজেদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে তেমনি নিজেদের বিবেকের কাছেও চরম নির্লজ্জ হিসাবে নিজেকে প্রকাশিত করে। এ লোকগুলোর চরিত্র বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কারণ যে ব্যক্তি এ কিতাবকে আল্লাহর বাণী বলে স্বীকৃতি দেয় এবং তা পাঠ করে কোরআনের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়, তারপরও সে আল্লাহর পছন্দের বিপরীত কর্মকান্ডে জড়িত হয়, সে তো সরাসরি আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করে বসে। এরা আল্লাহর কোরআনে পাঠ করেছে-

اَفَغَيْرَدِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًاوَّ كَرْهًاوَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ-

মানুষ কি আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে অন্য বিধান অনুসন্ধান করে? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা সবই স্বেচ্ছায় হোক এবং অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে (ইসলাম গ্রহণ করেছে)। আর তাঁরই দিকে সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা ইমরাণ)

কোরআন তিলাওয়াত করছে, অধ্যয়ন করছে-জানতে পারছে এটা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, তারপরও এ লোকগুলো কোরআনের বিপরীত মতবাদ মতাদর্শের অনুসরণ করছে, সেসব মতবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোকে সহযোগিতা করছে; এরা তো আল্লাহর মোকাবিলায় বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করে। না জানার কারণে এমন করছে না বরং জেনে বুঝেই এরা এই ভূমিকা পালন করছে। এদের সম্পর্কে সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ-

নিশ্চিত জেনো, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং তার মোকাবেলায় বিদ্রোহের নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য আকাশের দরজা কখনো খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ ততটাই অসম্ভব, যতটা অসম্ভব সূচের ছিদ্রপথে উটের গমন। (সূরা আরাফ)

কিয়ামতের ময়দানে আদালতে আখিরাতে স্বয়ং কোরআন এদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। এ বিষয়টিকে আল্লাহর রাসূল তাঁর বক্তব্যে এভাবে উপস্থাপন করেছেন, 'কোরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ।' (মুসলিম)

আল্লাহর এ কিতাবকে যদি যথাযথভাবে তিলাওয়াত করা হয়; অধ্যয়ন করে তা অনুসরণ করা হয় তাহলে এ কোরআন তার জন্য সাক্ষী ও প্রমাণ হয়ে দেখা দেবে। পৃথিবী থেকে আখিরাত পর্যন্ত চলার পথে যেখানে তাকে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে, সেখানেই কোরআন তার জন্য সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। কোরআনের তেলাওয়াতকারী ও অধ্যয়নকারী বলতে সক্ষম হবে, পৃথিবীতে আমি যে কাজই করেছি তা এই কিতাবের নির্দেশেই করেছি। যদি মানুষের কাজ প্রকৃতপক্ষেই কোরআনের আদর্শ অনুযায়ী হয়ে থাকে, তাহলে পৃথিবীতেও কোন ইসলামী বিচারক তাকে গ্রেফতার করতে পারবে না এবং আখিরাতের ময়দানেও তাকে গ্রেফতার করা হবে না।

আর যে ব্যক্তি এই কোরআন থেকে জেনেছে, তাকে কোরআনের বিধি-নিষেধ অনুসরণ করে চলতে হবে, কোরআনের রাজনীতি করতে হবে; কোরআন পরিবেশিত অর্থনীতি বাস্তবায়ন করতে হবে, কোরআনের শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কোরআনের বিচার নীতি অনুসারে বিচার কার্য পরিচালনা করতে হবে। এসব জেনেও যে ব্যক্তি কোরআন বিরোধী কর্মনীতি অবলম্বন করবে, তখন এ কোরআন সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহর বিচারালয়ে এ কোরআন তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাকে আরো শক্তিশালী করবে। পরিশেষে তাকে অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে।

রাসূল কর্তৃক কোরআনে পরিবর্তন ঘটেনি

এ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে যেসব মহামানবদেরকে নবী-রাসূল হিসাবে নির্বাচিত করেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবগত করার মুহূর্তকাল পূর্বেও তাঁদের কল্পনাতেও আসেনি, তাঁরা নবী-রাসূল হিসাবে মনোনীত হতে যাচ্ছেন। সুতরাং, তাঁদের নিজস্ব কোন শক্তি বা ক্ষমতা থাকার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। তাঁরা ইচ্ছা করলেই মানুষকে কোন ধরনের নিদর্শন দেখাতে পারেন না। মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَاكَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ-

আর আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত নিজেই কোন নিদর্শন এনে প্রদর্শন করবে, কোন রাসূলেরই এ শক্তি ছিল না। (সূরা আর-রা'দ-৩৮)

পবিত্র কোরআন যখন অবতীর্ণ হলো তখন এর বিধি-বিধানের মধ্যে কায়েমী স্বার্থবাদীর দল নিজেদের মৃত্যু দেখতে পেলো। তখন তারা বিশ্বনবীর কাছে দাবীনামা পেশ করলো যে, এই কোরআনের পরিবর্তে অন্য কোন কোরআন নিয়ে এসো অথবা এসব বিধান পরিবর্তন করো। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

قَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَرجُوْنَ لِقَاءَ نَاائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا اَوْبَدِّلْهُ، قُلْ مَايَكُوْنُ لِىْ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِىْ، اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَايُوْحٰى اِلَىَّ-

এরা বলে, এর পরিবর্তে অপর কোন কোরআন নিয়ে এসো অথবা এর মধ্যেই কোন পরিবর্তন সূচিত করো। (হে রাসূল!) তাদেরকে বলো, আমার এ কাজ নয় যে, আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নেবো। আমি তো শুধু সেই ওহীরই অনুসারী, যা আমার কাছে প্রেরণ করা হয়।

পৃথিবীর কোন শক্তির সাধ্য নেই যে, এই কোরআনে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে সক্ষম হয়। এ ক্ষমতা তাঁকেও দেয়া হয়নি, যাঁর ওপরে তা অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহ তা'য়ালা যা অবতীর্ণ করেন, তা পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারেই অবতীর্ণ করেছেন। এসব বিধান পৃথিবীর কোন সরকারের পক্ষ থেকে জারি করা হয় না যে, জনরোষের ভয়ে তা পুনরায় পরিবর্তন করা যেতে পারে। আল্লাহর ওহী অপরিবর্তনীয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে আইন-কানুন বা জীবন বিধান হিসাবে কোন ওহী আর কিয়ামত পর্যন্ত অবতীর্ণ হবে না। সুতরাং, এতে কোন পরিবর্তনও সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর রাসূল নিজ থেকে বানিয়ে কোন কথা বলেন না; তিনি যা ওহী করেন-রাসূলের মুখ থেকে আল্লাহর বাণী হিসাবে তাই উচ্চারিত হয়। শুধু তাই নয়, এ কথা ধমকের সুরে বলেছেন, আমার রাসূল যদি কোন কথা নিজ থেকে বানিয়ে বলতেন, তাহলে আমি তার কণ্ঠনালী টেনে ছিঁড়ে দিতাম। সুতরাং, কোরআনে যে বিধি-বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে কোন ধরনের পরিবর্তন রাসূল কর্তৃক সূচিত হবার কোন অবকাশ ছিল না। আর মহান আল্লাহ এমন অক্ষম নন যে, কোন বিধান রচনার জন্য কোন মানুষের সহযোগিতা তাঁর প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং সম্পূর্ণ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন-পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী।

কোরআনের বিকৃত ঘটানো অসম্ভব

মানব জাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূল প্রেরণ করে তাদের ওপরে কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, যেন তাঁরা আল্লাহ্র অভিপ্রায় অনুসারে মানব গোষ্ঠীকে পরিচালিত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় হযরত ঈসা রুহুল্লাহ আগমন করেন। এই ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটে নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে। তাঁর ওপরে পবিত্র কোরআন মানব জাতির জীবন ব্যবস্থা হিসাবে অবতীর্ণ করা হয়। কোরআনের পূর্বে যেসব কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল, তা যথাযথ বৈজ্ঞানিক পন্থায় সংরক্ষণ করার কোন ব্যবস্থা না থাকায় মূল কিতাব বিকৃত হয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে কোরআন অবতীর্ণ হবার সাথে সাথে আল্লাহর নির্দেশে নবী করীম (সাঃ) সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সমকালীন লোকজন থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত কোরআন মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব নেই, যে গ্রন্থ দাড়ি, কমা, সেমিকোলনসহ মুখস্থ করে রাখা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ এ কোরআনকে মুখস্থ করার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। অতীতে যেমন অসংখ্য মানুষ এ কোরআন মুখস্থ করে স্মৃতির পাতায় থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন, বর্তমানেও রাখছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। মানুষ চেষ্টা করলেই তা মুখস্থ করতে পারে।

এ জন্য কোরআনের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার কোন অবকাশ নেই। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে প্রচার মাধ্যমে কোন একজন কোরআন তিলাওয়াত করছে, যদি সে কোথাও সামান্য একটু ভুল করে, তাহলে পৃথিবীর অপর প্রান্তে বসে শ্রবণরত হাফেজে কোরআন তা শোনার সাথে সাথে বুঝতে পারবে, তিলাওয়াতকারী অমুক স্থানে ভুল উচ্চারণ করেছে। পরক্ষণেই গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে হাফেজে কোরআনগণ উক্ত তিলাওয়াতকারীকে জানিয়ে দেবে, অমুক আয়াতে সে ভুল উচ্চারণ করেছে বা তিলাওয়াতের সময় অমুক শব্দ বাদ পড়েছে। এভাবে পবিত্র কোরআন অবিকৃত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাঁর কিতাব পাঠ করার একটি নিয়ম চিরপ্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছে। সে নিয়মটি হলো, কোরআন যে ভাষায় যে ভঙ্গীতে অবতীর্ণ হয়েছে, ঐ ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় এই কিতাব তিলাওয়াত করা যাবে না। এ কিতাব যে কোন ভাষায় অনুবাদ করা যেতে পারে, যে কোন ভাষার মাধ্যমে তা অনুধাবন করা যেতে পারে এবং তা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে কোরআনের অবিকৃত আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় তা তিলাওয়াত করার অনুমতি দেয়া হয়নি।

এই সুযোগ যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে করে দেয়া হতো, তাহলে এ কিতাবে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার সুযোগ থাকতো। যে কোন ধরনের বিকৃতি থেকে হেফাজত করার লক্ষ্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ-

আর বাণী, একে তো আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। (সূরা হিজর)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাঁর ওপরে অবতীর্ণ করেছি, তিনি তা স্বয়ং রচনা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তোমরা যারা আমার কিতাবের বিরোধিতা করছো, জেনে রেখো, এতে করে আমার এ কিতাবের কোন ক্ষতি তোমরা করতে পারবে না। এ কিতাব প্রত্যক্ষভাবে আমার হেফাজতে রয়েছে। গোটা পৃথিবীতে যারা তোমরা কোরআন বিরোধী রয়েছো, তারা সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালালেও আমার কিতাবকে বিলুপ্ত করতে পারবে না। তোমরা একে কোণঠাসা করে রাখতে চাইলেও তা পারবে না। তোমাদের আপত্তি, নিন্দাবাদ, মিথ্যা প্রচার-প্রচারণার কারণেও আমার কিতাবের সম্মান-মর্যাদা বিন্দুমাত্র কমবে না। তোমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মুখেও এ কোরআনের আন্দোলন থেমে থাকবে না। এ কোরআনকে কোনক্রমেই তোমরা বিকৃত বা এর ভেতরে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে সক্ষম হবে না।

কোরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার ইতিহাস

প্রথম দিকে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে বলা হয় সাবিকুনাল আওয়ালিন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাদেরকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, সহায়-সম্পদ হারাতে এবং আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছে। এভাবে একের পর এক কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁদের ঈমানী শক্তি বিকশিত হয়ে দৃঢ়তা লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে মক্কা বিজয়ের পরে ইসলামের সোনালী দিনে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে কোন ধরনের পরীক্ষা দিতে হয়নি বা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। ফলে যে পরিবেশে ঈমানী শক্তি বিকশিত হয় এবং দৃঢ়তা লাভ করে, সে পরিবেশ তাঁরা পাননি।

এ জন্য যুক্তি সংগত কারণেই সাহাবাদের মধ্যে এ দুটো দলের সম্মান ও মর্যাদা সমপর্যায়ের হয়নি। এরপর আরেকটি দল ছিল ইতিহাসে যাদেরকে তোলাকা বলা হয়েছে। তোলাকা মানে হচ্ছে, মক্কার এমন এক বংশ, যারা শেষ পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ) এবং ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী ছিল। মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূল তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত মুআবিয়া, ওয়ালীদ ইবনে ওকবা (রাঃ) এবং মারওয়ান ইবনুল হাকামও সেই ক্ষমাপ্রাপ্ত বংশের লোক ছিলেন।

নবী করীম (সাঃ) যখন এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলেন, তারপর থেকেই এই তোলাকাদের মধ্য থেকে এবং আরবের অন্যান্য এলাকার কিছু লোকজন ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছিলো। এদের এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য রাসূলের সাহাবাগণকে যুদ্ধের মুখোমুখী হতে হয়েছিল। এসব যুদ্ধে পবিত্র কোরআনের অসংখ্য হাফিজ শাহাদাত

বরণ করেছিলেন। বিষয়টি সম্পর্কে বোখারী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে সময়ে ইয়ামামার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে অসংখ্য সাহাবা শাহাদাত বরণ করলেন। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি উপস্থিত হয়ে দেখলাম হযরত ওমর (রাঃ)ও সেখানে উপস্থিত আছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাকে বললেন, ওমর আমার কাছে এসেছে এবং পরামর্শ দিচ্ছে, ইয়ামামার যুদ্ধে কোরআনের অসংখ্য কারী (যাদের কোরআন মুখস্থ ছিল এবং মানুষকে তা পড়ে শোনাতেন এবং শিক্ষা দিতেন) শহীদ হয়েছেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, অন্যান্য যুদ্ধেও যদি কোরআনের কারীগণ শাহাদাত বরণ করেন তাহলে কোরআনের বিরাট অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ জন্য আমার মতামত হচ্ছে, আপনি কোরআনকে একত্রিত করার নির্দেশ দেন।

আল্লাহর কোরআনের অধিক সংখ্যক হাফিজগণ শহীদ হয়ে যাবার পরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু চিন্তা করেছিলেন, এভাবে যদি তাঁরা পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে থাকেন, তাহলে তো একদিন গোটা কোরআনই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট যা টিকে থাকবে, তাতেও পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটতে পারে। এ জন্য তিনি শুধু স্মৃতির পাতায় কোরআন সংরক্ষণের একমাত্র ব্যবস্থার সাথে সাথে কাগজের পাতায় তা লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। সে লক্ষ্যেই তিনি খলীফাতুর রাসূলের কাছে নিজের মতামত দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরেছিলেন।

বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ওমরের কথা শুনে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'আল্লাহর রাসূল যে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি, সে কাজ আপনি কিভাবে করতে পারেন ?'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, 'আল্লাহর শপথ ! এটা খুবই উত্তম কাজ।' এভাবে তিনি যুক্তি উত্থাপন করতে থাকেন। হযরত আবু বকরের মধ্যে প্রথম দিকে কিছুটা দ্বিধা সংকোচ থাকলেও পরে তিনি এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'পরবর্তীতে আল্লাহ তা'য়ালা এ কাজের জন্য আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিলেন। ওমরের মতামতের সাথে আমার অভিমত মিলে গেল।'

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) -যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ব্যক্তিগত সচিব। তিনি বলেন, 'খলীফাতুর রাসূল আমাকে বললেন, বয়সে তুমি নবীন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দান করেছেন। তুমি রাসূলের ওহী লেখার কাজেও নিয়োজিত ছিলে। তোমার দায়িত্ব হলো, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা কোরআনের অংশসমূহ একত্র করা।'

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ ! তিনি যদি আমাকে পাহাড় তুলে আনার নির্দেশ দিতেন তাহলে এটা আমার কাছে এতটা কঠিন মনে হতো

না–যতটা কঠিন মনে হচ্ছে তার এই কাজের নির্দেশ। আমি আবেদন করলাম, আপনি এ কাজ কেমন করে করবেন যা রাসূল করেননি?'

তিনি জবাব দিলেন, 'আল্লাহর শপথ! এটা বড়ই উত্তম কাজ।' হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) কে এই মহান কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। আল্লাহর রাসূলের ওপর যখন যে ওহী অবতীর্ণ হতো, তা স্বয়ং রাসূলের নির্দেশে লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেসব অংশ জমা করা হলো। সাহাবায়ে কেরামের ভেতরে যার কাছে কোরআনের যে অংশ বা সম্পূর্ণ কোরআন পাওয়া গেল, তাও জমা করা হলো। সে সময় পর্যন্ত কোরআনের হাফিজ যাঁরা ছিলেন, তাদের কাছ থেকে যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করা হলো। এভাবে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা, সন্দেহ সংশয়ের সম্ভাবনা মুক্ত হয়ে আল্লাহর কোরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজে হাত দেয়া হলো। আল্লাহর কিতাব গ্রন্থাবদ্ধ করার পূর্বে এর প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে তাঁদেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলো, যাঁদের সামনে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যাঁরা তা কণ্ঠস্থ করে রেখেছিলেন ও ওহী লিখতেন।

সময়ের ব্যবধানে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নির্ভুল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যখন কোরআনকে লিখিত একটি গ্রন্থের রূপ দেয়া সম্ভব হলো, তখন সেটা খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছেই রাখা হলো। তাঁর ইন্তেকালের পরে তা রাখার দায়িত্ব পালন করেছিলেন দ্বিতীয় খলীফা স্বয়ং হযরত ওমর (রাঃ)। তাঁর শাহাদাতের পরে তাঁরই কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) এর কাছে আমনত রাখা হলো। লোকজনকে এ অনুমতি দেয়া হয়েছিল যে, তাঁরা সে কোরআন দেখে নিজের কাছে রক্ষিত কোরআনের সাথে তা মিলিয়ে নিতে পারে, সেটা নির্ভূল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

আল্লাহর এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল মক্কার কুরাইশদের ব্যবহৃত আরবী ভাষায়। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভাষার উচ্চারণ গোটা দেশে এক ধরনের নয়। এক একটি এলাকায় তা উচ্চারণগত দিক দিয়ে পৃথক ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়ে থাকে। গোটা আরবের ভাষা আরবী হলেও তা বিভিন্ন ধরনের ভঙ্গীতে উচ্চারিত হয়ে থাকে। আরবের আরবী ভাষায় বিভিন্ন অঞ্চলে তখন যেমন পার্থক্য ছিল বর্তমানেও তেমনি পার্থক্য বিদ্যমান। একই বিষয়বস্তু আরবের এক এলাকায় এক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়, আবার অন্য এলাকায় তা ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এই উচ্চারণগত পার্থক্যের কারণে বর্ণিত অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটে না। সাত হরফ বলতে হাদীসে এ বিষয়টিকেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, কোরআন যদিও কোরাইশদের মধ্যে প্রচলিত বাকরীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু আরববাসীদের স্থানীয় উচ্চারণ ভঙ্গী ও বাকরীতিতে তা পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

একজন আরবী ভাষী লোক যখন আল্লাহর এই কিতাব পাঠ করে তখন ভাষার স্থানীয় পার্থক্য বর্তমান থাকার পরও অর্থ ও বিষয়বস্তুর মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না।

কোরআনে নিষিদ্ধ বিষয় বৈধ হয়ে যায় আবার বৈধ বিষয় নিষিদ্ধ হয়ে যায় না, আল্লাহর একত্ব তথা তাওহীদের বর্ণনা পরিবর্তিত হয়ে শিরক মিশ্রিত হয় না।

বোখারী ও মুসলিম হাদীসে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে–হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন আমি হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযামকে সূরা ফোরকান পাঠ করতে শুনলাম। কিন্তু আমি যেভাবে সূরাটি পাঠ করে থাকি, তার সাথে হিশামের পাঠে গরমিল লক্ষ্য করলাম। তখন আমি তার চাদর ধরে টানতে টানতে আল্লাহর রাসূলের কাছে নিয়ে গিয়ে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। রাসূল আমাকে আদেশ করলেন আমি যেন তাকে ছেড়ে দিই, তখন আমি রাসূলের নির্দেশ পালন করলাম। রাসূল তাকে সূরা ফোরকান পাঠ করতে বললেন, আমি যেভাবে তার মুখে পাঠ শুনেছিলাম, রাসূলের সামনেও তিনি সেভাবে পাঠ করলেন। রাসূল শুনে কোন আপত্তি না করে বললেন, কোরআন সাত হরফে অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং যেভাবে পাঠ করা সহজ সেভাবেই পাঠ করো।

এরপর সাহাবাদের সম্মিলিতি প্রচেষ্টায় আল্লাহর ইসলাম আরব সাম্রাজ্যের বাইরে ছড়িয়ে পড়লো। অসংখ্য অনারব ইসলাম কবুল করে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকলো। এসব অনারবদের শিক্ষক ছিলেন আরবরাই। এসব শিক্ষকদের আরবী উচ্চারণ ভঙ্গী পৃথক ছিল। তাঁরা যাদেরকে কোরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তাঁদের পৃথক উচ্চারণ ভঙ্গীতেই তা শিক্ষা দিচ্ছিলেন। বিষয়টি বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। অনারব মুসলমান ও আরব মুসলমানদের মেলামেশার ফলে আরবী ভাষা অনারবদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছিলো। ফলে যে যার মতো আঞ্চলিক উচ্চারণে কোরআন পাঠ করতে থাকলে অনারব নও মুসলিমদের মনে কোরআন সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হওয়া অসম্ভবের কিছু ছিল না। তারপর এ ধরনের সমস্যাও প্রকট হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছিল যে, এক এলাকার সাহাবী নামাজে কোরআন তিলাওয়াত করছেন তাঁর আঞ্চলিক উচ্চারণে, অন্য এলাকার সাহাবী তা শুনে সন্দেহে পড়ে যেতেন। যেমনটি হযরত ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)সহ অনেকের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। আল্লাহর কালাম অপরিচিত উচ্চারণ ও ভঙ্গীতে পাঠ করা নিয়ে সাহাবাদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভবের কিছু ছিল না। তারপর এ পার্থক্য অদূর ভবিষ্যতে মৌলিক বিকৃতি সৃষ্টি করতো না, এ নিশ্চয়তা ছিল না।

এ ধরনের নানা আশঙ্কা দেখা দেয়ার ফলে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) প্রবীন সাহাবা–যাদেরকে সাবিকুনাল আওয়ালীন বলা হয়, তাঁদেরকে নিয়ে বৈঠক করে সবার মতৈক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, খলীফা তুর রাসূল হযরত আবু বকর (রাঃ) এর প্রচেষ্টায় যে কোরআন লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেটাই এখন থেকে পঠিত হতে থাকবে। আর অন্য যেসব কোরআন রয়েছে, যা বিভিন্ন উচ্চারণ ভঙ্গীতে পাঠ করা হয়ে থাকে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে। অবিলম্বে এই আইন কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হলো এবং হযরত

আবু বকর কর্তৃক সংকলিত কোরআন মুসলিম জাহানে প্রচার করা হলো। কোরআন অবতীর্ণ হবার সময় যেভাবে তা সুসংবদ্ধ ও উন্নতমানের ছিল, হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক সংকলিত কোরআন অনুরূপ তাই ছিল।

এ সম্পর্কে বোখারী শরীফে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আনাস ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান হযরত উসমানের কাছে এলেন। এটা সেই সময়ের কথা, যখন তিনি সিরিয় বাহিনীসহ আরমেনিয়া বিজয়ে ইরাকী বাহিনীর সাথে আযারবাইজান বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। লোকদের বিভিন্ন রীতিতে কোরআন পাঠ হযরত হুযাইফাকে উদ্বিগ্ন করে তুললো। তাই তিনি হযরত উসমান (রাঃ) কে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! ইহুদী-খৃষ্টানদের মতো আল্লাহর কিতাবে বিভেদ সৃষ্টির পূর্বে আপনি এই জাতিকে রক্ষা করার চিন্তা-ভাবনা করুন। এরপর হযরত উসমান হযরত হাফসা (রাঃ) কে বলে পাঠালেন, আপনার কাছে যে কোরআন রয়েছে তা আমার কাছে প্রেরণ করুন। আমরা সেটা দেখে কপি করে তা আপনাকে ফেরৎ দেবো। উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) কে পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, হযরত সাঈদ ইবনে আ'স এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে হিশাম (রাঃ) –এ চারজনকে এ কাজে নিযুক্ত করলেন। তাঁরা হযরত আবু বকর কর্তৃক সংকলিত কোরআন থেকে আরো কয়েকটি কপি প্রস্তুত করবেন।

এই চারজনের মধ্যে কুরাইশ বংশের হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, হযরত সাঈদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস (রাঃ) কে নির্দেশ দিলেন, যদি কখনো কোরাআনের কোন জিনিস নিয়ে তোমাদের সাথে যায়েদের মতানৈক্য হয়, তাহলে তোমরা কোরআনকে কুরাইশদের বাকরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করবে। কারণ সেই রীতিতেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরাই তাঁর নির্দেশ অনুসারে দায়িত্ব পালন করলেন। যখন তাঁরা গ্রন্থাকারে কোরআনের সংকলন প্রস্তুত করলেন, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক সংকলিত কপিটি হযরত হাফসা (রাঃ) এর কাছে ফেরৎ পাঠালেন।

এরপর হযরত উসমান (রাঃ) কোরআনের এক একটি সংকলন ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করলেন। তিনি সেই সাথে নির্দেশ দিলেন, এই সংকলন ব্যতীত অন্য যতো সংকলন রয়েছে, তা যেন আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং, বর্তমান সময়ে আমরা যে কোরআন দেখছি ও পাঠ করছি, তা হযরত আবু বকর কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থের অনুলিপি। হযরত উসমান সেই সংকলনেরই অনুলিপি সরকারীভাবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেছিলেন।

ইতিহাস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) শুধু যে আল্লাহর কিতাবের বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের সংকলন প্রস্তুত করে মুসলিম সাম্রাজ্যের

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় স্থানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন তাই নয়, একই সাথে তিনি সে কোরআনের যথার্থ পঠনরীতি মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য স্বনামধন্য ক্বারীও প্রতিটি স্থানে নিয়োগ করিয়েছিলেন। মদীনায় এ কাজের দায়িত্ব ছিল হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারীর ওপর। মক্কায় এ কাজের আঞ্জাম দিতেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব (রাঃ)। সিরিয়ায় নিয়োজিত ছিলেন হযরত মুগীরা ইবনে শিহাব (রাঃ)।

কুফায় নিয়োগ লাভ করেছিলেন হযরত আবু আব্দুর রহমান সুলামী (রাঃ)। বসরায় এই মহান দায়িত্ব পালন করতেন হযরত আমের ইবনে আব্দুল কায়েস (রাঃ)। এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়াও যেখানেই আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁর বিদায়ের পরে কোরআন পাঠে অভিজ্ঞ ক্বারী সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কোন সাহাবীর সন্ধান পাওয়া যেত, অগণিত মানুষ তাঁর কাছে গিয়ে আল্লাহর এ কিতাবের প্রতিটি শব্দ সহীহ শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করা শিখে নিতো।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই মুসলমান ও অমুসলমানদের কাছে কোরআনের সেই অনুলিপিই বিদ্যমান। পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে কোরআনের একটি কপি সংগ্রহ করে, তা আরেক দেশের কপির সাথে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, দুটো কপির সাথে কোন গড়মিল নেই। নবী করীম (সাঃ) যে কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির কাছে পেশ করেছিলেন; এটাই যে সেই কোরআন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই কোরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য একশ্রেণীর অমুসলিম চিন্তাবিদগণ চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। তারা যদি কোরআনের ভেতরে একটি অক্ষরেরও গড়মিল খুঁজে পেতো, তাহলে এতদিনে গোটা পৃথিবী জুড়ে তা প্রচার করতো। কোরআনের ওপরে গবেষণা করতে গিয়ে তারা কোন গড়মিল খুঁজে পায়-ই নি, উপরন্তু তারা প্রমাণ পেয়েছে, এ ধরনের কোন গ্রন্থ মানুষের পক্ষে শতকোটি বছর ধরে চেষ্টা-সাধনা করেও রচনা করা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের আধুনিক যুগে কম্পিউটারের সাহায্যে তারা কোরআনের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে কোরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মাহাত্মের সন্ধান লাভ করে। তারা সন্ধান পেয়েছে, আল্লাহর এই কিতাবে এক বিস্ময়কর সংখ্যাতাত্ত্বিক জটিল জাল বিছানো রয়েছে, যা অতি অদ্ভূত, অভিনব এবং বিস্ময়কর। সেই সংখ্যাটি হলো ১৯ সংখ্যার সুদৃঢ় সামঞ্জস্য। চূড়ান্ত বিশুদ্ধতায় এ কিতাব আল্লাহর বাণী এবং নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। সারা পৃথিবীর মানুষ যদি সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর গোটা বয়সব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা-সাধনা করে যেত কোরআনের মতো একটি গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে, তবুও তা অনন্তকাল ধরে থেকে যেতো সাম্ভাব্যতার সীমানা থেকে শতকোটি যোজন যোজন দূরে।

এ কিতাবে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করা হয়েছে, সংখ্যাতাত্ত্বিক দিক দিয়ে যে ১৯ সংখ্যার চরম এক জটিল জালকে যেভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে, তেমনি সমান সংখ্যক শব্দে, সমান সংখ্যক বাক্যসংখ্যায়, সমান সংখ্যক অক্ষরে এ কোরআনের মতো একটি

গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজন হতো ৬২৬, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০ বছর। অর্থাৎ ৬২৬ সংখ্যার সাথে ২৪ টি শূণ্য জুড়ে দিলে যে সংখ্যা হতে পারে। এরপরও বলা হয়েছে, কোন মানুষের পক্ষে এ ধরনের কিতাব রচনা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কেননা, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একত্রিত হয়ে একযোগে চেষ্টা করতে হবে, সেই সাথে প্রতিটি মানুষকে হায়াত লাভ করতে হবে শতকোটি বছরের ওপরে। সুতরাং আমাদের সামনে যে কোরআন বর্তমান রয়েছে, তা যে আল্লাহর বাণী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যেভাবে অবতীর্ণ করা হয়েছিল, আল্লাহর নির্দেশে রাসূল (সাঃ) যেভাবে কোরআনের বিন্যাস করেছিলেন এবং গ্রন্থাবদ্ধ করার সময় তাতে যে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেনি, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

কোরআনের দাওয়াত

পৃথিবীতে মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য যে হেদায়াত ও পথনির্দেশনার একান্ত প্রয়োজন, এ পৃথিবীতে মানুষের আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গোটা বিশ্বলোকের নিগূঢ় তত্ত্ব ও অস্তিত্বের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুধাবন করার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন, মানুষের ব্যক্তি চরিত্র গঠন ও দায়িত্ব-কর্তব্য, পারিবারিক চরিত্র গঠন ও পরিচালনা, সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা, সমাজ, দেশ ও জাতিকে সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেসব মূলনীতি ও আদর্শ একান্ত প্রয়োজন, সেসব লাভ করার একমাত্র মাধ্যম হলো মহান আল্লাহকে নিজেদের জন্য একমাত্র পথনির্দেশক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া।

তারপর তিনি তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন, শুধুমাত্র তাই অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে তা অনুসরণ করা। আল্লাহকে শুধুমাত্র সেজদা লাভের অধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তারপর জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে পৃথিবীর চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের আবিষ্কৃত মতবাদ মতাদর্শ অনুসরণ করা এবং নিজেকে পরিপূর্ণরূপে নেতা নেত্রীদের নেতৃত্বাধীন করা মানুষের জন্য এক মারাত্মক ভ্রান্ত কর্মনীতি। এ ধরনের কর্মকান্ড মানুষকে ক্রমশঃ ধ্বংস গহ্বরের দিকে অগ্রসর করিয়ে থাকে। এ জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন–

اِتَّبِعُ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَاتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ–

হে মানুষ! তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাই অনুসরণ করো এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ ও অনুগমন করো না। (সূরা আ'রাফ–৩)

এই কোরআন মানুষকে আহ্বান জানায় আল্লাহর দাসত্ব করার দিকে। মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তিনিই তোমাদের স্রষ্টা ও লালন-পালন কর্তা। সুতরাং তাঁরই আইন-কানুন অনুসরণ করে চলো। কোরআন মানুষকে এভাবে দাওয়াত দেয়–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ-

হে মানুষ ! তোমরা তোমাদের সেই রব-এর দাসত্ব স্বীকার করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত মানুষের সৃষ্টি কর্তা। (সূরা বাকারা-২১)

মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই তাঁর স্রষ্টার মুখাপেক্ষী। মানুষের সৃষ্টিগত প্রকৃতিই হলো, সে আল্লাহর দাসত্ব করবে। এই প্রকৃতি থেকে মানুষ যখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তখন সে সমস্ত সৃষ্টির দাসত্ব করতে বাধ্য হয়। সম্মান ও মর্যাদার আসন থেকে সে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল তলদেশে তলিয়ে যায়। এ জন্য কোরআন মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য আহ্বান জানায় তথা মানব প্রকৃতির দিকে ফিরে আসতে উদাত্ত আহ্বান জানায়। কোরআন মানুষকে দাওয়াত দেয়-

حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ-وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ-

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বান্দাহ্ হয়ে যাও, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেলো। এখন হয় তাকে পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে অথবা বাতাস তাকে এমন স্থানে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দেবে যেখানে সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। (সূরা আল হাজ্জ-৩১)

উল্লেখিত আয়াতে আকাশ বলতে মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর প্রকৃতি দাবি করে আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার জন্য এবং তাওহীদ ব্যতীত সে আর অন্য কোন আদর্শ অনুসরণ করতে আগ্রহী হয়না। মানুষ জন্মগ্রহণ করে তার স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপরে আল্লাহর গোলাম হিসাবেই। পরবর্তীকালে তার প্রকৃতি নানাভাবে প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন আদর্শের অনুসরণ করতে থাকে। মানুষ যখন তার জন্মগত স্বাভাবিক প্রকৃতিতে থাকে, তখন তাকে রাসূল প্রদর্শিত আদর্শানুসারে শিক্ষা প্রদান করা হলে তার জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি ও অন্তরদৃষ্টি স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পরবর্তী জীবনে এসব মানুষ আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে আরোহন করতে সমর্থ হয়।

আল্লাহর রাসূল বলেন, মানুষ জন্মগ্রহণ করে মুসলিম হিসাবেই, তাকে লালন-পালনকারী যারা, তারাই তাকে ভিন্ন আদর্শে গড়ে তোলে। অর্থাৎ মানুষ এক আল্লাহর গোলামী করার প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি নিয়েই পৃথিবীতে আগমন করে থাকে। মানুষের জন্য এই প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হবার অর্থই হলো, সম্মান-মর্যাদার উচ্চাসন থেকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হওয়া। এ অর্থেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর গোলামী ত্যাগ করে যে ব্যক্তি অন্যের অনুসরণ করলো সে যেন তাকে দাসত্ব লাভের অধিকারী বানিয়ে দিল।

আর এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করার অর্থই হলো স্পষ্ট শিরক করা। শিরকে লিপ্ত হওয়ার মানেই হলো সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসন থেকে ছিটকে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়া। এভাবে কোন মানুষ যখন নীচে পড়ে যায়, তখন অসংখ্য শক্তির দাসত্ব করতে সে বাধ্য হয়। পরিবারে নিজের স্ত্রী থেকে শুরু করে, সমাজের নেতাদের দাসত্ব করতে থাকে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নেতৃবৃন্দের এবং মানুষের রচনা করা রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের দাসত্ব করতে সে বাধ্য হয়।

একটা পাখির শাবক যখন বাসা থেকে ছিটকে পড়ে, তখন যেমন শাবকটি বাতাসের ঝাপটায় বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হতে পারে, অথবা অন্য কোন জন্তু-জানোয়ারের খোরাকে পরিণত হয়। তেমনি মানুষ যখন তার নিজের আসল স্থান থেকে ছিটকে পড়ে, তখন সে শয়তানের খেলনার বস্তুতে পরিণত হয়। মানুষের মধ্যে যারা শয়তান রয়েছে, তারা শিকারী পাখির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাকে বিভিন্ন দল ও আদর্শের দিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। অপরদিকে তার মধ্যে যে কুপ্রবৃত্তি রয়েছে, এই কুপ্রবৃত্তি তাকে বাতাসের গতিতে ভ্রান্ত পথে দ্রুত গতিতে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। এ জন্যই কোরআন মানুষের প্রতি এই দাওয়াত দেয়, দাসত্ব করতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং এ পথেই মানুষের জীবনে স্থিতি আসতে পারে। নিজের গর্দান থেকে দাসত্বের সমস্ত শৃংখল ছিন্ন করে নিজেকে এক আল্লাহর গোলামে পরিণত করার মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনে সার্বিক সফলতা। কোরআন সেদিকেই মানুষকে আহ্বান জানায়। কোরআন বলছে–

وَيَرَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْ أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ
هُوَ الْحَقَّ-يَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ-

হে নবী! জ্ঞানবানরা অতি উত্তমভাবে অবগত রয়েছে যে, যা কিছু তোমার রব-এর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য এবং তা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথপ্রদর্শন করে। (সূরা সাবা-৬)

কোরআন অনুধাবনের প্রকৃত ক্ষেত্র

হেরা পর্বতের গুহায় রাসূল ধ্যানমগ্ন ছিলেন আর আল্লাহর ফেরেশ্তা এসে তাঁকে এই কোরআন নামক গ্রন্থটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন; রাসূল তা এনে বাড়িতে আরাম শয্যায় শুয়ে কোরআনের মর্ম অনুধাবন করেছেন–বিষয়টি মোটেও এরকম নয়। পবিত্র কোরআন যে শিক্ষাদর্শ সহকারে অবতীর্ণ হলো, যে পরিবেশে অবতীর্ণ হলো, তা ছিল আল্লাহর এ কিতাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিপরীত স্রোতধারাকে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যেই এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মগ্রন্থের মতো এ কোরআন

কোন ধর্মগ্রন্থ নয়। এটা একটি পরিপূর্ণ ভারসাম্যমূলক জীবন ব্যবস্থা–সমাজ পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। একটি বিপ্লবাত্মক দাওয়াত ও আন্দোলনের গ্রন্থ। চার দেয়ালের মধ্যে বসে এ গ্রন্থ পাঠ করলে এর সঠিক ভাবধারা উপলব্ধি করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। বসে বসে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র পাঠ করলে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায় না। রোগ থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে ওষুধ সেবন করতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের যে সমস্যার সমাধানের জন্য কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, সে সমস্যার সাথে মোকাবেলা না করলে কি করে কোরআনের মূলভাবধারা অনুধাবন করা যেতে পারে? অন্যায় অত্যাচারে ভেসে যাওয়া সমাজ, অশান্তির অগ্নি গহ্বরে নিমজ্জিত দেশ ও জাতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে যারা ঘরের নিভৃত কোণে আবদ্ধ রেখে নিজেকে সবচেয়ে 'নির্বিরোধী সত্যাশ্রয়ী শান্তি প্রিয়' হিসাবে প্রমাণ করতে চায়, তাদের পক্ষে কখনোই আল্লাহর কোরআনের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। একটা বিষয় কোরআন অধ্যয়নকারীর স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, আল্লাহর রাসূলের চেয়ে বড় পরহেজগার, নির্বিরোধী, সত্যাশ্রয়ী ও শান্তি প্রিয় মানুষ এ পৃথিবীতে অতীতে যেমন ছিল না, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও আর আসবে না। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বকে আল্লাহর কোরআন কি আরামের শয্যায় অবস্থান করার অনুপ্রেরণা যুগিয়ে ছিল–না রক্তক্ষয়ী উত্তপ্ত ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত করেছিল?

সুতরাং, এ কোরআন বুঝতে হলে এবং এ থেকে পথনির্দেশনা লাভ করতে হলে পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির ভেতরে আসন গেড়ে বসা আল্লাহ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। সমাজ দেহে অনুপ্রবিষ্ট আল্লাহ বিরোধী শক্তি যে ক্যান্সার সৃষ্টি করেছে, তা নিরাময়ের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি আল্লাহর কোরআন অধ্যয়ন করলে তখন আল্লাহর কোরআনের প্রকৃত ভাবধারা অনুধাবন করা সহজ হবে। কোরআন অবতীর্ণ হয়ে আল্লাহর রাসূলকে যে আন্দোলনের পথে অগ্রসর করালো, সেই আন্দোলনের দাওয়াত মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল। যারা সর্বপ্রকার দাসত্বের বন্ধন দূরে ছুড়ে ফেলে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করতে আগ্রহী ছিল, তাঁরা সর্বপ্রথম কোরআনের আন্দোলনে শামিল হলো। দেশ ও জাতির ওপরে যারা নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রেখে শোষণ যন্ত্রটি সক্রিয় রাখতে আগ্রহী ছিল, তারা চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। কোরআনের আন্দোলনকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে তারা সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। শুরু হয়ে গেলো কোরআনের সৈনিকদের সাথে শয়তানের সৈনিকদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। আল্লাহর কিতাব যাদেরকে প্রস্তুত করছিল, তাঁদের ওপরে লোমহর্ষক নির্যাতন শুরু হলো, তাঁরা সহায়-সম্পদ হারালেন; অপমানিত লাঞ্ছিত হলেন। তাঁদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হলো। কষ্টার্জিত সমস্ত সম্পদ বাতিল করা হলো। কারাবরণ করতে হলো। শাহাদাতের পেয়ালাও হাসি মুখে পান করতে হলো। এভাবে সূচনা থেকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে

দীর্ঘ তেইশটি বছর লেগে গেলো। আল্লাহর এই কোরআন দীর্ঘ তেইশটি বছর ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে তা সফলতার সিংহদ্বারে পৌঁছে দিল।

অতএব এই কোরআনকে বুঝতে হলে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম যে পথে তাঁদের পবিত্র পদচিহ্ন এঁকেছেন, তাঁরা যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন, সে পথে এগিয়ে যেতে হবে, সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য নিজের সমস্ত কিছু উৎসর্গ করার মন-মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তাহলে কোরআনের অধ্যয়নকারীর কাছে মনে হবে, বর্তমানে তিনি যে সমস্যার মোকাবিলা করছেন, এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ বোধহয় এই মাত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। এ সময়ে কোরআনকে সেই চৌদ্দশত বছর পূর্বে অবতীর্ণ করা কোন কিতাব মনে হবে না, কোরআন যে চির নতুন–এ কথা নতুন করে পাঠকের সামনে প্রতিভাত হবে।

কোথাও যদি আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয় আর সে আগুনের উত্তাপে চারদিকের আবর্জনা নিঃশেষে পুড়ে না যায়, তাহলে বাহ্যিক দিক থেকে তা আগুন মনে হলেও তা আগুন নয়। এ ধরনের দহন ক্ষমতাহীন আগুনের কোন মূল্য নেই। শত সহস্র কণ্ঠে যদি কোরআন তিলাওয়াত করা হয়, আর সে তেলাওয়াতের আঘাতে মানব রচিত মতবাদ মতাদর্শের ধারক-বাহকদের ক্ষমতার মসনদ টল-টলায়মান হয়ে না ওঠে, তাদের ভেতরে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয়, তখন তো তেলাওয়াতকারীকে এ কথা অনুধাবন করতে হবে, তার কোরআন তেলাওয়াত আর সাহাবায়ে কেরামের কোরআন তিলাওয়াতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য অনুধাবন করতে হলে যে আন্দোলন ও সংগ্রামের ময়দানে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সে ময়দানে নামতে হবে। কোরআন অনুধাবন করে কোরআনের আদর্শে নিজেকে প্রস্তুত করে এগিয়ে যেতে থাকলে তার সামনে অবশ্য অবশ্যই মক্কার উত্তপ্ত পরিবেশ এসে উপস্থিত হবে। বদরের ময়দান তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। ওহুদের রক্ত রঞ্জিত ময়দান দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হবে। তায়েফের প্রস্তর বর্ষন কিভাবে হচ্ছে তা অবলোকন করা যাবে। হোনাইনের ময়দানে আকাশ আবৃত করে কিভাবে তীর ছুটে আসছে তা দেখা যাবে। মুতার প্রান্তরে কিভাবে রক্তের বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে, তা দেখে শরীর শিহরিত হবে।

মানুষের মধ্যে একটি শ্রেণী কোরআন পাঠ করে, কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ বিরোধী শক্তির অপতৎপরতার কাহিনী পড়ে। নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর সম্মানিত সাহাবাদের সাথে কি নিষ্ঠুর আচরণ করেছে, সে কাহিনী বিভিন্ন গ্রন্থে পড়ে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু বাস্তব ময়দানে তারা আল্লাহ বিরোধী শক্তির অস্তিত্ব খুঁজে পায় না। আবু জেহেল আর আবু লাহাবের ভূমিকা তাদের চোখে পড়ে না। না পড়ার কারণ হলো, এরা কোরআনকে একটি আন্দোলনের কিতাব হিসাবে পড়ে না। এরা কোরআনের ভেতরে জ্বিন তাড়ানোর আয়াত অনুসন্ধান করে। যুবক-যুবতীদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করার, হারানো

দ্রব্য ফিরে পাবার, মামলায় জয়ী হবার, শত্রুর উৎপাত থেকে নিরাপদ থাকার, পুত্র সন্তান জন্ম দেবার, ব্যবসায়ে বরকত হবার, পরীক্ষায় পাশ করার, বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার, বন্ধ্যা নারীর সন্তান হবার আয়াত অনুসন্ধান করে। আল্লাহর কোরআনকে এরা ঝাড়-ফুঁকের কিতাব হিসাবে পাঠ করে।

কোন ব্যক্তি যদি দেশের এক প্রান্তে অবস্থিত একটি এলাকা থেকে দেশের রাজধানীর দিকে যাওয়ার লক্ষ্যে যন্ত্রযানে আরোহন করে যাত্রা আরম্ভ করে, তাহলে তার সামনে যে মঞ্জিলগুলো আসার কথা, সে মঞ্জিল না এসে তার বিপরীত মঞ্জিল আসতে থাকে, তাহলে যাত্রীকে এ কথা বুঝতে হয়, সে যে যন্ত্রযানে আরোহন করেছে, তা তার কাংখিত স্থানের দিকে, তার গন্তব্য স্থলের দিকে যাচ্ছে না-যাচ্ছে বিপরীত দিকে। এ পথ তাকে দেশের রাজধানীর দিকে নিয়ে যাবে না, নিয়ে যাবে সেখানেই যেখানে সে যেতে ইচ্ছুক নয়। একইভাবে কোরআন নিয়ে কেউ যদি ময়দানে সক্রিয় হতে চায়, তার সামনে একে একে ঐসব মঞ্জিল এসে উপস্থিত হবে, যেসব মঞ্জিল রাসূল ও তাঁর সাহাবাদের সামনে এসেছিল। সে তখন চোখ মেলেই দেখতে পাবে, তাঁর চোখের সামনে শ্বাপদ সঙ্কুল পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে আবু জেহেল আর আবু লাহাবের দল। সামনে-পেছনে, ডানে-বামে যেদিকেই সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, সেদিকেই সে দেখতে পাবে, আবু জেহেল আর আবু লাহাবের দল কিভাবে হুংকার ছাড়ছে। সুতরাং, কোরআনকে তার সঠিক অর্থে অনুধাবন করতে হলে, কোরআন যে আন্দোলন আর সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে, সেই ময়দানে নিজের অবস্থান নির্ণয় করে তারপর কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে।

মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য

বর্তমানে পবিত্র কোরআন যেভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে, এভাবে এ কোরআনকে বিন্যাস করেছেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবুয়্যত ও রিসালাত সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তিনি যেসব কথা বলেছেন, সেসব কথা তিনি আল্লাহর আদেশেই বলেছেন। এই কোরআনে যখন শ্রেণী বিন্যাস করা হয়, তখন তা স্বয়ং আল্লাহরই নির্দেশে এবং নবী করীম (সাঃ) এর তত্ত্বাবধানে তা করা হয়। কোন সূরার পরে কোন সূরা সাজানো হবে, কোন আয়াত কোন সূরার অংশ হবে, এ সংক্রান্ত নির্দেশ আল্লাহর রাসূল দিয়েছিলেন। আল্লাহর নবী তাঁর নবুয়তি জিন্দেগীর মোট তেইশ বছরের মধ্যে তের বছর অবস্থান করেছিলেন মক্কায় আর অবশিষ্ট দশ বছর মদীনায় অবস্থান করেন এবং সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

মক্কায় অবস্থানকালে তাঁর ওপরে যেসব ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, সেগুলো মক্কী সূরা নামে অভিহিত হয়েছে। আর মদীনায় অবস্থানকালে যেসব ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, তা মাদানী সূরা নামে অভিহিত। অবশ্য কতকগুলো সূরা সম্পর্কে কোরআন গবেষকগণ বলেন, এসব

সূরায় মক্কী ও মাদানী এ উভয় বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। আল্লাহর এ কিতাবের যেসব সূরা মক্কী হিসাবে অভিহিত হয়েছে, সেগুলোর বৈশিষ্ট্য এবং মাদানী নামে পরিচিত সূরাগুলোর বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য রয়েছে। পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন দায়িত্ব হলো নবী-রাসূলদের ওপরে অর্পিত দায়িত্ব। এই দায়িত্ব অর্পণ করার ক্ষণপূর্বেও নবী হিসাবে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ এ দায়িত্ব ও দায়িত্বের পরিধি–ব্যাপকতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা রাখতেন না। নবী করীম (সাঃ)ও তাঁর ওপরে অর্পিত দায়িত্ব অর্পণের পূর্বে কিছুই জানতেন না। সুতরাং, এ দায়িত্ব অর্পণ করার পর তাঁর মধ্যে যে অস্থিরতা প্রকাশিত হয়েছিল, মক্কী সূরায় তাঁর অস্থিরতা দূর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণসহ আলোচনা করা হয়েছে।

নবী ও রাসূল হিসাবে তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব কি এবং কিভাবে তিনি তা পালন করবেন, সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দান করা হয়েছে। কোরআন যে দাওয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হচ্ছিলো, সে দাওয়াতের দিকে আল্লাহর রাসূল কোন পদ্ধতিতে মানুষকে আহ্বান জানাবেন, দাওয়াত দানকারীকে কি ধরনের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে ও গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে, মক্কী সূরায় এ সম্পর্কিত আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিকভাবে এ দাওয়াতের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তার মোকাবেলায় রাসূলের অবস্থান কি হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দান করা হয়েছে। যখন বিরোধিতা শুরু করা হলো, সে বিরোধিতার ধরন অনুসারে করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যারা শামিল হচ্ছিলেন, তাঁদের মাধ্যমে এক বিরাট উদ্দেশ্য সাধন করা হবে, এ লক্ষ্যে ব্যক্তি গঠনমূলক পথনির্দেশ মক্কী সূরায় স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

মানুষের সামনে আল্লাহর একত্ববাদ, এক আল্লাহর দাসত্ব করার প্রয়োজনীয়তা, নবুয়্যত ও রিসালাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, আখিরাত ও আখিরাতের আবশ্যকতা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান দেয়া হয়েছে মক্কী সূরায়। এসব প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করতে গিয়ে গোটা বিশ্বলোক, প্রাণীজগৎ, মহাশূণ্য, উদ্ভিদজগৎ, মানব সৃষ্টির রহস্য, রাত-দিনের আবর্তন ও বিবর্তন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের সূচনায় মক্কায় নবী করীম (সাঃ) এর ওপরে যেসব সূরা অবতীর্ণ করা হতো, সেগুলো আকারে ছোট হলেও অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় সমৃদ্ধ ছিল এবং তা ছিল গভীরভাবে প্রভাব বিস্তারকারী। ইসলামী আদর্শের মৌলিক দিক হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। এ তিনটি বিষয় মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছিল এসব সূরায় এবং সেই সাথে শিরক, আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস ইত্যাদির পরিণতি সম্পর্কে বারবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যারা রাসূলের দাওয়াতে সাড়া দেবে না, বিরোধিতা করবে আখিরাতে তাদের জন্য কি ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা প্রস্তুত রয়েছে, তা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

অতীতে যারা নবী-রাসূলদের সাথে বিরোধিতা করেছে, ইতিহাসে তাদের কি পরিণতি ঘটেছে, সেসব ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। যারা বিরোধিতা করতো, তারা যেসব ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান রাখতো, সেগুলোও তুলে ধরা হয়েছে। যারা রাসূলের আন্দোলনে শামিল হবে এবং রাসূল কর্তৃক আনিত আদর্শ অনুসরণ করবে, আখিরাতে তাদের সম্মান ও মর্যাদা এবং প্রতিদান সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে।

মাতা-পিতা তাদের অবাধ্য সন্তানকে যেমন স্নেহমাখা কণ্ঠে সোজা সরল পথে চলার জন্য নানা ধরনের যুক্তি দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করেন এবং সন্তানকে সত্য পথে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন না, মক্কী সূরার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সে বিষয়টি প্রতিভাত হয়ে ওঠে। সত্য সহজ সরল পথ গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাহ্দেরকে বারবার বুঝিয়েছেন। বারবার বুঝানোর পরেও বান্দাহ্ বিদ্রোহীর ভূমিকা অবলম্বন করছে, তবুও আল্লাহ্ তাদেরকে বুঝানোর ব্যাপারে বিরতি দেননি বা বিরক্ত হয়ে তাদেরকে পরিত্যাগ করেননি। তারা যেন সত্য পথ গ্রহণ করে, এ ব্যাপারে আহ্বান জানিয়েছেন।

রাসূল এবং রাসূলের সাথীদের ওপরে যখন চরম নিষ্ঠুর নির্যাতন অনুষ্ঠিত হয়েছে, প্রবল বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে, এ অবস্থায় দ্বীনি আন্দোলনের সৈনিকদেরকে কি ভূমিকা পালন করতে হবে তা বলে দেয়া হয়েছে এবং বারবার সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিল হবার কারণে অতীতে যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, তাঁরা কিভাবে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, এখন তাঁদেরকে কিভাবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, নির্যাতনের মধ্য দিয়েই কিভাবে আন্দোলনকে বিজয়ের পথে অগ্রসর করাতে হবে, এর বিনিময়ে তাঁদেরকে কিভাবে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হবে এবং সামনে তাঁরা বিজয়ের সোনালী সূর্যের আভায় অচিরেই সিক্ত হবেন, এ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে ইসলাম বিরোধিদেরকে মারাত্মক পরিণতি ভোগ করতে হবে, এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদেরকে আখিরাতের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

এ পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কিভাবে ধ্বংস হবে, মাটির সাথে মিশে যাওয়া মৃত মানুষগুলো আবার জীবিত হবে, পৃথিবীতে মানুষ যা করেছে তার প্রতিটি কর্মকান্ডের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে, এসব দিক আলোচনা করে বিরোধিদেরকে বিরোধিতা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়া হয়েছে। আখিরাত সম্পর্কে গোটা কোরআনে এত কথা আলোচনা করা হয়েছে যে, তা একত্রিত করলে গোটা কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগের সমান হবে। এত কথা একটি বিষয়ের ওপরে এ জন্য বলা হয়েছে যে, যে কোন ধরনের কঠিন আইন প্রণয়ন করে তা জারি করেও মানুষকে অন্যায় করা থেকে বিরত রাখা যায় না এবং মানুষের ভেতর থেকে অপরাধ প্রবণতা দূর করা যায় না। এক কথায় মানুষের চরিত্র কিছুতেই ভালো করা যায় না। মানুষের চরিত্র ভালো করতে হলে মানুষের চিন্তার

জগৎ থেকে অপরাধ প্রবণতা দূর করতে হলে, অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে দূরে রাখতে হলে মানুষের ভেতরে আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি করতে হয়। মক্কী সূরাসমূহে এ প্রচেষ্টার আধিক্য লক্ষ্যণীয়।

মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য

নবী করীম (সাঃ) মক্কায় যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, দীর্ঘ তের বছরে সে আন্দোলন একটি বিশেষ পর্যায়ে উন্নিত হলেও মক্কায় এ আন্দোলন সফল হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ যে কোন আদর্শ ভিত্তিক আন্দোলন সফল করতে হলে দুটো জিনিসের একান্তই প্রয়োজন হয়। একটি হলো যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে, সে আদর্শের ভিত্তিতে একদল লোক প্রস্তুত করা। যেন সাধারণ মানুষ সে লোকগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে আদর্শ সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করতে পারে এবং আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।

এ ছাড়া আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যতটা কঠিন, তার চেয়ে অধিক কঠিন হলো আদর্শ টিকিয়ে রাখা। আদর্শ ভিত্তিক লোক প্রস্তুত করা না হলে আদর্শ টিকিয়ে রাখা যায় না। দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রয়োজন হয় তাহলো আদর্শ ভিত্তিক সে আন্দোলনের প্রতি জনসমর্থন। দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনতার সে আন্দোলন ও আদর্শের প্রতি যদি সমর্থন না থাকে, তাহলে তা দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়না।

আল্লাহর রাসূল মক্কার জীবনে প্রথমটিতে সফলতা অর্জন করেছিলেন। দ্বিতীয়টি মক্কায় ছিল না। মক্কায় আদর্শ ভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তি প্রস্তুত হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ রাসূলের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেনি এবং ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এ জন্য হযরত মুসয়াব ইবনে উমায়ের (রাঃ) কে আল্লাহর রাসূল মদীনায় প্রেরণ করে মদীনার জনগণকে ইসলামের পক্ষে সংগঠিত করার কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ-ইসলামের প্রথম দূত।

এছাড়া মদীনা থেকে হজ্জ উপলক্ষ্যে যেসব লোকজন মক্কায় আগমন করতো, আল্লাহর নবী তাদের কাছে ইসলামী আদর্শ তুলে ধরতেন। এভাবে মদীনার কিছু সংখ্যক লোকজনের ইসলামের সাথে পরিচিতি ঘটে এবং পরপর দু'বছর মদীনা থেকে আগত লোকজন রাসূলের কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা রাসূলকে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে মদীনায় বরণ করে নেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। এভাবেই মদীনায় ইসলামের পক্ষে একটা সাধারণ জনমত গড়ে উঠেছিল।

মক্কায় ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী মুসলমানদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এ কারণে কিছু সংখ্যক মুসলমান রাসূলের অনুমোদনক্রমে হাবশা-বর্তমানে যে দেশটির নাম আবিসিনিয়া সেখানে হিজরাত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরবর্তীতে মক্কার মুসলমানগণও একে একে

মদীনায় হিজরাত করেন। তারপর মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী স্বয়ং আল্লাহর রাসূলকেই পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়ার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছিল। ঠিক সে সময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরাত করার অনুমতি দিলেন।

রাসূল মদীনায় গমন করলেন, সেখানের সাধারণ জনগণ তাঁকে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল। যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য রাসূলের এই আন্দোলন, তা বাস্তবে পরিণত করার সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করলেন। এবার রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে ইসলাম চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো। এ পর্যন্ত দ্বীনি আন্দোলনের কর্মী-সমর্থক যেখানে যে অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছিলেন, তাঁরা সবাই একই কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগ লাভ করলেন।

মদীনায় হিজরাত করার পরে আল্লাহর রাসূলের ওপরে কোরআনের যেসব আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয়, সেগুলো মাদানী সূরা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এসব সূরার বৈশিষ্ট্য মক্কী সূরা থেকে ভিন্ন। একটি রাষ্ট্রশক্তি মুসলমানদের হস্তগত হবার পর থেকে ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে মুসলমানদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করলো। মদীনায় ইহুদীদের একটি বিরাট শক্তি বর্তমান ছিল। এই ইহুদী জাতি-গোষ্ঠীগতভাবে অত্যন্ত কুটিল স্বভাবের। ইসলাম এবং মুসলমান এদের কাছে অসহনীয়।

এছাড়া রাসূল মদীনায় হিজরাত করার পূর্বে উবাই নামক এক প্রভাবশালী ব্যক্তির নেতৃত্বের আসনে আসীন হবার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর রাসূল মদীনায় পদার্পণ করার সাথে সাথে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরে গেল; জনতা নেতৃত্বের আসনে আসীন করলো স্বয়ং আল্লাহর রাসূলকে।

নেতৃত্ব হারিয়ে লোকটি উন্মদের ন্যায় হয়ে পড়েছিল। সে তার সমর্থক গোষ্ঠী নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। সংখ্যা গরিষ্ঠ জনশক্তি ইসলামের দিকে থাকার কারণে সে প্রকাশ্যে বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করতে না পেরে মদীনার ইহুদী এবং মদীনার বাইরের ইসলামের শত্রুদের সাথে আঁতাত করে ইসলামী রাষ্ট্র উৎখাত করার প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিলো। এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হচ্ছিলো।

মুসলমানদের জনবল নেই, অর্থবল নেই, অস্ত্রশক্তিও নেই–তবুও তাঁদেরকে একটার পরে আরেকটা যুদ্ধের মোকাবেলা করতে হলো। এভাবে এক চরম সংঘাত-মুখর পরিস্থিতি অতিক্রম করে দীর্ঘ দশ বছর পরে বিজয়ের সোনালী সূর্য উদিত হলো। এই দীর্ঘ দশটি বছর অতিবাহিত করতে গিয়ে যেসব পরিস্থিতি ও পরিবেশের মোকাবেলা করতে হয়েছে, তার আলোকে কোরআনের যে সূরা বা আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একটি নতুন পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও জাতি গঠন এবং তা বিশ্বের মানচিত্রে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যেসব উপাদান– উপকরণের প্রয়োজন, তা মাদানী সূরাসমূহে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

মক্কায় অবস্থান কালে মুসলমানদেরকে নির্যাতিত হয়েছে। মদীনায় এসে তাদেরকে আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের (Self preservation and resist) ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। তাঁদের এই ভূমিকার ধরন কেমন হবে, তা এসব সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। জাতি গঠন ও জাতি গঠনের মূল উপাদান-উপকরণ কি কি, তা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধনীতি, সন্ধিনীতি ও যুদ্ধবন্দীদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে তা পেশ করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং এ সম্পর্কের ভিত্তি কি হবে–তা সবিস্তারে পেশ করা হয়েছে। সভ্যতা-সংস্কৃতির রূপরেখা এবং তা কিভাবে বিকশিত হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের প্রতিদিনের জীবনধারা এবং জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে কোন নীতি অবলম্বন করতে হবে, তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

মুনাফিক ও অমুসলিমদের সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে, তা অবগত করানো হয়েছে। আহলি কিতাবদের সাথে মুসলমানরা কি ধরনের সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে, সে ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এভাবে সামাজিক আইন-কানুন, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আইন-কানুন, বিচার বিভাগীয় আইন-কানুন, উত্তারাধীকার সংক্রান্ত বিধি-বিধান ইত্যাদি বিষয় সবিস্তারে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

গোটা পৃথিবীর সামনে তাঁরা যেন আদর্শের জীবন্ত সাক্ষী হিসাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়, এ জন্য তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সাথে ইহুদী-খৃষ্টানদের ভ্রান্তিসমূহ স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, এই ভ্রান্ত পথ-মত ও নীতি-পদ্ধতি পরিহার না করলে তাদের পরিণতি কতটা ভয়াবহ হবে।

যুদ্ধে বিজয়ী হবার পরে যেসব সম্পদ মুসলমানদের হাতে এসেছে, সেসব সম্পদ সম্পর্কিত বিধান জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ও জীবন বিধানের ওপর হামলা আসার ফলে মুসলমানদেরকে সংগত কারণেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। সক্ষম থাকার পরেও এসব যুদ্ধে যোগদান না করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে জিহাদকারীর সম্মান ও মর্যাদা।

জিহাদের ময়দানে আল্লাহর রাস্তায় যাঁরা জীবন দান করবে, তাঁদেরকে কি ধরনের বিনিময় দেয়া হবে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। জিহাদের প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় তথা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে উৎসাহ প্রদান ও ব্যয় না করার পরিণতি সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। সাংবাদিকতার নীতিমালা পেশ করা হয়েছে এবং সেই সাথে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ ভীতিহীন লোক কর্তৃক পরিবেশিত সংবাদ যাচাই-বাছাই না করে গ্রহণ করা যাবে না। মাদানী সূরাসমূহে এ ধরনের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

কোরআনের সূরা সংখ্যা ও নামসমূহ

পবিত্র কোরআনে মোট সূরার সংখ্যা হলো ১১৪ টি। আল্লাহর রাসূলের হিজরাতের পূর্ব জীবনে যেসব সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, যেগুলোকে মক্কী সূরা নামে অভিহিত এবং হিজরাতের পরবর্তী সময়ে যেসব সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো মাদানী সূরা নামে অভিহিত হয়েছে। এমন কি হিজরাতের পর মক্কার কাছে অবস্থিত হুদায়বিয়ার সন্ধী (Hudaibiya treaty) সম্পাদিত হবার পর এবং বিদায় হজ্জ উপলক্ষ্যে মূল মক্কা নগরীতে যা কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, সেগুলোও মাদানী সূরার অন্তর্গত হয়েছে। এ দিক দিয়ে মক্কী সূরার মোট সংখ্যা হলো ৮৬ টি। আর মাদানী সূরার মোট সংখ্যা হলো ২৮ টি। এভাবে কোরআনের মোট সূরার সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ১১৪ টি। কতকগুলো সূরা এমন যে, তার প্রথম অংশ মক্কী এবং পরবর্তী অংশ মাদানী। কিন্তু গোটা সূরাটিই মক্কী হিসাবেই গণনা করা হয়েছে। সূরা মুযাম্মিল এ ধরনের একটি সূরা।

কোরআনের মোট সূরার মধ্যে ১৭ টি সূরা মক্কী না মাদানী এ বিষয়ে মতপার্থক্য বিরাজমান। এই ১৭ টি সূরার মধ্যে আবার সূরা বাইয়েনাহ, সূরা আল আদিয়াহ, সূরা আল মাউন, সূরা আল ফালাক ও সূরা আননাস–অর্থাৎ মোট ৫ টি সূরা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য বিদ্যমান। এই ১৭ টি সূরার মধ্যে সূরা আর রাদ, সূরা আর রাহমান, সূরা আদ দাহার ও সূরা আল যিলযাল অর্থাৎ ৪ টি সূরা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো মাদানী সূরা। আবার সূরা আত তীন, সূরা আল কদর, সূরা আত তাকাসুর, সূরা আল আসর, সূরা আল কোরাইশ, সূরা আল কাউসার, সূরা আল কাফিরুন ও সূরা ইখলাস–এই ৮ টি সূরা সম্পর্কে অধিকাংশ গবেষকগণ বলেছেন, এগুলো মক্কী সূরা।

আল্লাহর কোরআনের কোন বিষয় ভিত্তিক নাম নেই। এ কিতাবের যতগুলো নাম পাওয়া যায়, তা সবই গুণবাচক নাম। যেমন কোরআন একটি নাম এবং এর অর্থ হলো যা পাঠ করা হয় বা যা পাঠ করা একান্তই জরুরী। অর্থাৎ এটা এমনই একটি কিতাব, যা প্রতিটি মানুষের জন্য পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। কারণ এ কিতাব ব্যতীত মানুষ কোনক্রমেই নির্ভুল পথ এবং জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম নয়। আর নির্ভুল পথ ও জ্ঞান মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যেই এ কিতাব অবশ্যই পাঠ করা কর্তব্য। এ জন্য আল্লাহর এ কিতাবকে বলা হয়েছে কোরআন।

মহান আল্লাহর অবতীর্ণ করা এ কিতাবের আরেকটি নাম হলো ফোরকান। এই ফোরকান শব্দের অর্থ হলো যা সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য নির্ভুলভাবে দেখিয়ে দেয়। পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থ নেই, যে গ্রন্থ দাবী করতে পারে যে, আমি সত্য আর মিথ্যার ব্যবধান নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম। কিন্তু আল্লাহর এই কিতাব চ্যালেঞ্জ করে দাবী করে, আমি সত্য আর মিথ্যা নির্ণয়ের একমাত্র নির্ভুল মানদন্ড–আমি সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরি। মহান আল্লাহ বলেন–

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ-

স্মরণ করো, আমি মূসাকে কিতাব এবং ফোরকান দান করেছি–সম্ভবত এর সাহায্যে তোমরা সহজ ও সত্য পথ লাভ করতে পারবে। (সূরা বাকারা-৫৩)

হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের ওপরেও যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল, সে কিতাবও সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য করার গুণাবলী সম্বলিত ছিল। আর কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ-

রমজান মাস, এতেই কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন যাপনের বিধান আর এটা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ, যা সঠিক ও সত্য পথপ্রদর্শন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কাররূপে তুলে ধরে। (সূরা বাকারা-১৮৫)

সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন ধরনের জড়তা বা সন্দেহ সংশয় থাকে না, সম্পূর্ণ পরিষ্কারভাবে তা তুলে ধরে। মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, মানুষের রচনা করা বিধান অনুসরণ কেন করা যাবে না এবং কেন আল্লাহর প্রেরিত বিধান অনুসরণ করতে হবে। এ পার্থক্য দিনের আলোর মতো স্পষ্ট তুলে ধরে এ কিতাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ-اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ-

আর তিনি মানদন্ড অবতীর্ণ করেছেন হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশকারী। এখন যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে অস্বীকার করবে, তাদেরকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। (সূরা আলে-ইমরান-৪)

আল্লাহ তা'য়ালা যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তা অত্যন্ত কল্যাণময়। কেননা এ কিতাব মানুষের যে কোন সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম। এই পৃথিবীর ইতিহাস হলো সত্য আর মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ্বের ইতিহাস। সত্য আর মিথ্যার যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব এ পৃথিবীতে চলে আসছে, এ দ্বন্দ্ব দূরীভূত করার লক্ষ্যেই এ কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا-

বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি–যিনি এ ফোরকান তাঁর বান্দার ওপর অবতীর্ণ করেছেন, যেন সে গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য সতর্ককারী হয়। (সূরা আল ফোরকান-১)

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবকে 'যিকর' নামে অভিহিত করেছেন। প্রচলিত অর্থে যিকর বলতে একশ্রেণীর মানুষ যা বুঝে থাকে, যিকর শব্দের অর্থ বা যিকর বলতে শুধু সেটাই বুঝায় না। আল্লাহ তা'য়ালা এই যিকর শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ কিতাবকেও যিকর বলা হয়েছে। কোরআনকে যিকর বলা হয়েছে এ অর্থে যে, এ কিতাব ভুলে যাওয়া শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা নির্ভুল উপদেশ-জ্ঞান দান করে। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের ওপর যে তাওরাত অবতীর্ণ করা হয়েছিল, তাকেও যিকর বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ-

পূর্বে (এই কোরআনের পূর্বে) আমি মুসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম ফোরকান, জ্যোতি ও যিকর মুত্তাকিদের জন্য। (সূরা আল আম্বিয়া-৪৮)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর এই কিতাবকে যিকর হিসাবে উল্লেখ করে বলেন-

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ-اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ-

আর এখন এই বরকত সম্পন্ন যিকর আমি অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা একে মেনে নিতে অস্বীকার করবে? (সূরা আল আম্বিয়া-৫০)

আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আ'রাফের ৬৩ ও ৬৯ আয়াতে, সূরা ইউসুফের ১৪০ আয়াতে, সূরা হিজরের ৬ ও ৯ আয়াতে, সূরা নাহলের ৪৪ আয়াতে, সূরা কলমের ৫১ আয়াতে ও সূরা আবাসার ১১ আয়াতে যিকর শব্দের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনকে বুঝিয়েছেন। সূরা কামারের ২৫ আয়াতে যিকর শব্দ দিয়ে ওহীকে বুঝানো হয়েছে। এই কিতাব সংরক্ষণের কথা উল্লেখ করে সূরা আল হিজরের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ-

আর বাণী, একে তো আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কোরআনকে 'আমার যিকর' নামে অবিহিত করেছেন-যে যিকর মানুষকে সত্য সহজ পথপ্রদর্শন করে। মানুষ যে শিক্ষা ভুলে গিয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ-

এ বাণী তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যেতে থাকো। যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে লোকেরা চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরা আন নাহল-৪৪)

এভাবে এ কিতাবকে 'নূর' বলা হয়েছে। কারণ এ কিতাব মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে অর্থাৎ মিথ্যার অন্ধকার থেকে মহাসত্যের আলোর দিকে নিয়ে আসে। এ ধরনের অনেক নাম রয়েছে এ কিতাবের। যা গুণবাচক নাম এবং সেসব নাম এ কিতাবের সম্মান-মর্যাদা ও অন্যান্য গুণাবলী প্রকাশ করে। আল্লাহর এই কিতাবে যে ১১৪ টি সূরা রয়েছে, তার ভেতরে ৯ টি সূরা ব্যতিত ১০৫ টি সূরার বিষয় ভিত্তিক নাম নেই। শুধুমাত্র পরিচিতির জন্য বিভিন্ন নাম দেয়া হয়েছে। যেমন সূরা বাকারাহ্, এর অর্থ গাভী। এ নাম এ জন্য দেয়া হয়নি যে, এ সূরায় শুধু গাভী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আন নাহল–এর অর্থ মৌমাছি। সূরা নামল–এর অর্থ পিপিলীকা। সূরা আনকাবুত–এর অর্থ মাকড়শা। এসব সূরার মধ্যে এই শব্দগুলো উল্লেখ রয়েছে, ফলে পরিচিতির জন্য নামকরণ করা হয়েছে।

কোরআনের আংশিক অনুসরণ করা যাবে না

আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান হিসাবে কোরআনের ওপরে ঈমান আনার অর্থ হলো, কোরআন পরিবেশিত বিধি-বিধান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা। কারণ কোরআনই হলো একমাত্র নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা। কোরআনের বিধান কিছুটা অনুসরণ করা হবে আর কিছুটা অনুসরণ করা হবে না, অর্থাৎ কোরআনের বিধান খন্ডিতভাবে অনুসরণ করা হবে, তাহলে মুমিন হওয়া যাবে না।

নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ-তাহলীল, জানাযা, দাফন-কাফন ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোরআনের বিধান অনুসরণ করা হবে আর জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন–রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি, শ্রমনীতি, পরিবার পরিচালনায়, সমাজ পরিচালনায়, বিচার কার্য পরিচালনায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় কোরআনের বিধান ত্যাগ করে পৃথিবীর দার্শনিক-চিন্তাবিদ কর্তৃক রচিত মতবাদ-মতাদর্শ বা বিধি-বিধান অনুসরণ করলে কোনক্রমেই নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়া যাবে না।

কোরআনের বিধান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাস্তবায়ন করতে হবে। জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে রাসূলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে কোরআনের বিধান অনুসরণ করতে হবে। কোরআন এ জন্য অবতীর্ণ হয়নি যে, তার কিছু নীতিমালা মানুষ অনুসরণ করবে আর অবশিষ্ট বিধি-বিধান শুধু সুমধুর স্বরে তেলাওয়াত করা হবে তা ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবনে অনুসরণ করা হবে না। আল্লাহ বলেন–

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ –وَمَا اللّٰهُ

بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ- أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ-فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُوْنَ-

তবে তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের একাংশ বিশ্বাস করো এবং অপর অংশকে অবিশ্বাস করো? জেনে রেখো, তোমাদের মধ্যে যারাই এধরনের আচরণ করবে তাদের এ ছাড়া আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা পৃথিবীর জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ সে সম্পর্কে মোটেও বেখবর নন। প্রকৃতপক্ষে এসব লোকেরা নিজেদের পরকাল বিক্রি করে পৃথিবীর জীবন ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি কিছুমাত্র হ্রাস করা হবে না এবং এরা নিজেরাও কোন সাহায্য পাবে না। (সূরা বাকারা-৮৫-৮৬)

মুসলমানদের জীবন দুই ভাগে ভাগ করার কোন অবকাশ নেই। এক ভাগে থাকবে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি আর আরেক ভাগে থাকবে ধর্ম, এ বিভক্ত জীবন মুসলমানের হতে পারে না। আল্লাহর কোরআনের পূর্ণাঙ্গ বিধান অনুসরণ করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ অনুসারে জীবন-যাপন করা যাবে না। যারা ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ অনুসরণ করবে, এ পৃথিবীতে তারা গোলামীর জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। আর গোলামীর জীবন হয় অপমান ও লাঞ্ছনামূলক জীবন।

বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানরা ঘৃণা ও লাঞ্ছনার জীবন অতিবাহিত করছে, এর একমাত্র কারণ হলো, এরা কোরআনের বিধি-বিধান আংশিক অনুসরণ করে। পৃথিবীতেও এরা লাঞ্ছিত হচ্ছে, কিয়ামতের ময়দানেও এরা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। মুসলিম বিশ্বে যারা এই ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করছে, তারা যে অমুসলিম শক্তির পক্ষে কাজ করছে এবং এ কাজের বিনিময়ে বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার করে থাকে এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর কোরআনের পূর্ণাঙ্গ বিধান মেনে নিলে পৃথিবীতে ভোগবাদী জীবন ধারা অনুসরণ করা যাবে না, এ জন্যই তারা দুনিয়ার জীবনের মোকাবেলায় আখিরাতের জীবন বিক্রি করে দিয়েছে। এই ধর্মনিরপেক্ষ নীতির অনুসারীদের জন্য আদালতে আখিরাতে কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। সুতরাং, একমাত্র কোরআনের বিধানই অনুসরণ করতে হবে, এ ব্যাপারে কোন আপোস করা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِتَّبِعُ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَاتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ-

হে মানুষ! তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাই অনুসরণ করো এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ করো না। (সূরা আ'রাফ-৩)

পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো। (সূরা বাকারা- ২০৬)

উল্লেখিত আয়াতে 'ইসলামে প্রবেশ করো' বলতে বুঝানো হয়েছে, পরিপূর্ণভাবে কোরআনের বিধান অনুসরণ করা। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। (সূরা নেছা)

এ আনুগত্য শুধু নামায-রোযার নয়, বরং তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে। পৃথিবীতে নবী ও রাসূলদের আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা। এ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে রাসূল (সাঃ) নিজে রাজীনিত করেছেন। তাছাড়া সকল নবী-রাসূলগণ ও সাহাবায়ে কেরাম রাজনীতি করেছেন। তাঁরা কেউ-ই ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। সুতরাং ইসলাম মানুষের জীবনের কোন খন্ডিত অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খন্ডিতভাবে রাসূলের নেতৃত্ব গ্রহণ করা এবং কোরআনের বিধান অনুসরণ করার কোন অবকাশ কোরআন দেয়নি। কোরআন তথা রাসূলের আদর্শ অনুসরণের ব্যাপারে যদি কারো মধ্যে কোন ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে মুসলমান হওয়া যাবে না। হযরত ওমর (রাঃ) এর কাছে একজন লোক এসে একটি মামলার নিস্পত্তি করে দেয়ার আবেদন পেশ করেছিল। সেই ব্যক্তি ঐ একই মামলা রাসূলের আদালতে পেশ করেছিল–কিন্তু রাসূলের দেয়া রায় তার মর্জ্জি মাফিক ছিল না।

এ কারণে সে পুনরায় মামলাটি হযরত ওমরের কাছে পেশ করেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) লোকটির কাছে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এই মামলাটি প্রথম কার কাছে পেশ করেছিলে?'

লোকটি জানালো, 'আমি মুসলমান, আমি নামায আদায় করি; রোযা পালন করি, ইসলামের পক্ষে জিহাদেও যোগদান করি। একজন ইহুদী রাসূলের আদালতে আমার বিরুদ্ধে মামলা করলো আর রাসূল সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে ইহুদীর পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন। এ রায় সঠিক হয়নি। আপনি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ শুনে সঠিক ফায়সালা করে দিন।'

লোকটির কথাগুলো হযরত ওমরের কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর ধমনীর রক্ত দ্রুত বেগে প্রবাহিত হতে থাকলো। ক্রোধে তাঁরা চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি অপেক্ষা করো, আমি তোমার মামলার ফায়সালা করে দিচ্ছি।'

এ কথা বলে তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করে কোষমুক্ত তরবারী এনে বললেন, 'আল্লাহর বান্দা শোন, আল্লাহর রাসূল যে ফায়সালা করে দেন, তাঁর ফায়সালার সাথে যারা দ্বিমত পোষণ করে, তাদের ফায়সালা এভাবেই করতে হয়।'

এ কথা বলে তিনি তরবারীর আঘাতে লোকটিকে দ্বিখন্ডিত করে দিলেন। রাসূলের দরবারে সংবাদ পৌছে গেল, হযরত ওমর একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। চারদিকে এ সংবাদ জানাজানি হয়ে গেল। লোকজন বিরূপ মন্তব্য করতে থাকলো। আল্লাহর রাসূল স্বয়ং বিব্রতবোধ করতে থাকলেন, ওমর কেন এমন কাজ করলো। রাসূলের যাবতীয় দ্বিধা সংকোচ দূর করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিলেন-

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

তোমার রবের শপথ! লোকেরা কোনক্রমেই ঈমানদার হতে পারবে না, যদি না তারা-হে নবী-আপনাকে তাদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়ে বিচারক ও সিদ্ধান্তকারী হিসেবে মেনে নেয়, আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মনে কুণ্ঠাবোধ করে এবং তা সর্বান্তকরণে মেনে নেয়। (সূরা নিসা- ৬৫)

অর্থাৎ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যাকে হত্যা করেছেন সে ব্যক্তি মুমিন নয়, সে ব্যক্তি হলো মুনাফিক। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করার পরে নিজেকে মুসলমান দাবী করে কোরআনের আংশিক অনুসরণ ও খন্ডিতভাবে নবীর নেতৃত্ব মানার কোন অবকাশ নেই, পরিপূর্ণভাবে নবীর নেতৃত্ব অনুসরণ করতে হবে। নবী করীম (সাঃ) কোরআনের যে বিধান পেশ করেছেন, সে বিধানের কোন একটি দিকও ত্যাগ করা যাবে না। কোরআনের বিধান পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এই বিধান যেমন বাস্তবায়িত করতে হবে ব্যক্তি জীবনে, তেমনি বাস্তবায়িত করতে হবে দেশ-জাতি ও রাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে।

কোন মুসলমান যদি রাজনীতি করতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাঁকে অবশ্যই কোরআনের রাজনীতি করতে হবে। ইসলাম কোন মুসলমানকে এ সুযোগ দেয়নি যে, সে কোরআনের বিধানের বিপরীত কোন মতবাদ মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতি করবে। এ ধরনের কোন রাজনীতির সাথে যে ব্যক্তি নিজেকে জড়িত করবে, নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করার তার কোন অধিকার নেই। শাসন ক্ষমতায় যিনি অধিষ্ঠিত, তাকেও কোরআনের বিধান অনুসরণ করতে হবে।

শাসক হিসাবে আল্লাহর রাসূল কিভাবে দেশ পরিচালিত করেছেন, সেভাবেই দেশ পরিচালনা করবেন। সেনাপ্রধান অনুসরণ করবেন আল্লাহর রাসূলকে। তিনি তাঁর বাহিনী পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখবেন, আল্লাহর রাসূল সেনাপ্রধান হিসাবে কিভাবে তাঁর অধীনস্থ বাহিনী পরিচালিত করেছেন। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বপ্রথমে অনুসন্ধান করতে হবে আল্লাহর কোরআনে। কোরআন কি ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করে গোটা মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে দরিদ্রতা দূর করেছিল। কোরআনের সেই অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়িত করতে হবে।

আল্লাহর কিতাবের দেয়া যে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে নবী করীম (সাঃ) নিকৃষ্ট স্তরের মানুষগুলোকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রবান মানুষে পরিণত করেছিলেন, সেই শিক্ষানীতি অনুসরণ করতে হবে। শিল্পপতিগণ তাদের অধিনস্থ শ্রমিকদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোরআনের দেয়া শ্রমনীতি অনুসরণ করবেন। এসব ব্যাপারে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকা যাবে না। পৃথিবীর কোন মানুষ নির্ভুল বিধান দিতে পারে না। কারণ কোরআনের জ্ঞানহীন মানুষ নির্ভুল জ্ঞানের পরিবর্তে অমূলক ধারণা ও অনুমানকেই অনুসরণ করে থাকে। তাদের আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-কল্পনা, নীতি-দর্শন, জীবন বিধান ও কর্ম পদ্ধতি সমস্ত কিছুই অনুমান নির্ভর-ধারণা আর অনুমানের ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

পক্ষান্তরে কোরআন প্রদর্শিত পথ-নির্ভুল পথ। এ সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান ও সন্ধান সেই আল্লাহই দান করেছেন। মানুষ নিজেদের ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে যে পথ নির্ধারণ করে নিয়েছে, তা কোনক্রমেই নির্ভুল নয়। সুতরাং, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও দেশসমূহ কোন পথে চলছে এবং কোন বিধান অনুসরণ করছে, তা কোন মুসলমানের কাছে বিবেচনার বিষয় নয়। মুসলমান একমাত্র কোরআন প্রদর্শিত পথে চলবে। এ পথের পথিক যদি সে একাও হয় তবুও সে একাকীই এ পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হবে। এ বিষয়টিই কোরআন স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছে-

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً، لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمْتِهِ، وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَمَنْ فِى الاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ-اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ-

তোমার রব-এর কালামসমূহ সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পূর্ণ পরিণত। তার বিধান পরিবর্তনকারী কেউ নেই। এবং তিনি সমস্ত কিছু শোনেন এবং জানেন। আর হে রাসূল ! তুমি যদি এ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কথা মতো চলো তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। তারা তো নিছক ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে চলে এবং কেবল ধারণা অনুমানই তারা করতে থাকে। (সূরা আল আন'আম-১১৫-১১৬)

সৃষ্টিসমূহের প্রতি আল্লাহর হেদায়াত

মহান আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা-খালিক। স্রষ্টা হিসাবে তিনি নিজের কর্ম-কৌশল, নিজের সুবিচার-ইনসাফপূর্ণ নীতি ও নিজের অনুগ্রহশীলতার ভিত্তিতে মানুষকে পৃথিবীতে অজ্ঞ, পথহারা ও অনবহিত না রাখার-বরং সত্য সঠিক অভ্রান্তপথ এবং ভ্রান্তপথ বুঝিয়ে দেয়ার, পাপ-পুণ্য, বৈধ-অবৈধ তথা হারাম ও হালাল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত করার, কোন পথ-মত ও আচরণ গ্রহণ করলে সে আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্ হতে সক্ষম হবে এবং কোন পথ ও মত এবং কার আনুগত্য করলে সে আল্লাহর বিদ্রোহী বান্দাহ্ বলে প্রমাণিত হবে, এসব কথা

তাকে পরিপূর্ণভাবে জানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ বলেন–

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى–

পথপ্রদর্শন করা নিঃসন্দেহে আমারই দায়িত্ব। (সূরা লাইল-১২)

সুতরাং হেদায়াতের পথপ্রদর্শন করা মহান আল্লাহরই দায়িত্ব। আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং এই দায়িত্ব পালন করেন বলে তিনি তাঁর বান্দাহ্‌কে শিখিয়েছেন আমার কাছে এভাবে দোয়া করো, 'আমাদেরকে সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করো।' পবিত্র কোরআন মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছে, প্রতিটি সৃষ্টিকেই তার সূচনা থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত চারটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। এর শেষ স্তর হলো হেদায়াত। মহান আল্লাহই এই হেদায়াত দান করেছেন। আল্লাহ বলেন–

الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى–وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى–

যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং ভারসাম্যতা স্থাপন করেছেন। (সূরা আ'লা-২-৩)

প্রতিটি বস্তু সৃষ্টির পূর্বেই পৃথিবীতে তাকে কি কাজ করতে হবে, সেই কাজের পরিমাণ কি হবে, তার আকার-আকৃতি কি হবে, তার গুণাবলী কি হবে, কোথায় তার স্থান ও অবস্থিতি হবে, তার স্থিতি, অবস্থান ও কাজের জন্য কি ক্ষেত্র ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে, কোন সময় তার অস্তিত্ব হবে, কতদিন পর্যন্ত তা নিজের অংশের কাজ করবে এবং কখন কিভাবে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে, সৃষ্টির সামঞ্জস্য ও পথ নির্দেশ ইত্যাদি–এসব কিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যথাযথরূপে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি সৃষ্টি করেই সৃষ্টি সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ে যাননি-হেদায়াতও তিনি দিয়ে দেন।

উদাহরণ স্বরূপ মানুষের পা যেভাবে গঠন করা হয়েছে, এই গঠন প্রণালীর দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। পায়ের নলার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পায়ের নলাটি গোটা পায়ের মাঝামাঝি নেই। সম্পূর্ণ পায়ের কেন্দ্রস্থলে এই নলাটি দেয়া হলে কোন মানুষের পক্ষে ভারসাম্য রক্ষা করে হাঁটা চলাফেরা করা কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। পায়ের পাতার অংশের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পায়ের পাতার সিংহভাগ সামনের দিকে আর ক্ষুদ্র অংশটি পেছনের দিকে। পায়ের পাতার এই পরিমাপ ঠিক না থাকলেও মানুষ স্বচ্ছন্দভাবে হাঁটতে পারতো না। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা শুধু সৃষ্টিই করেননি, তিনি এর সুসাম স্যতাও বিধান করেছেন।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব মানুষকে এভাবে প্রতিটি দিক থেকে সুসামঞ্জস্যভাবে, পরিমাপ ঠিক রেখে সৃষ্টি করা হয়েছে। এবার পশু-প্রাণীর দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। যেসব পশু শিকার করে তাদের পায়ের থাবা সামনের দিকে। যেদিকে মুখ দিয়ে সে ছুটতে বা দৌড়াতে পারে, তার থাবাও সেদিকেই দেয়া হয়েছে। পায়ের থাবা সামনের দিকে না দিয়ে পেছনের দিকে দেয়া হলে তার পক্ষে সামনের দিকে দৌড়ানোও যেমন সম্ভব হতো না, তেমনি সম্ভব হতো না তার পক্ষে শিকার ধরে আহার করা।

মুরগীর বাচ্চা ডিম ফুটে বের হয়ে স্থলে বিচরণ করে-এটাই তার ক্ষেত্র। স্থলে বিচরণ করার হেদায়াতই তাকে দেয়া হয়েছে। মুরগী ও তার বাচ্চাগুলোকে পানির ভেতরে ফেলে দেয়া হলে ডুবে মারা যাবে। কিন্তু হাঁসের বাচ্চা ডিম ফুটে বের হবার পরে পানিতে ছেড়ে দিলে স্বচ্ছন্দে তারা সাঁতার দিতে থাকবে। এই প্রজাতির হাঁস-যেগুলো গভীর অরণ্যে বাস করে, প্রজনন মৌসুমে এরা বড় বড় বৃক্ষের উচ্চ কোঠরে ডিম দেয়। গাছের নিচের কোন কোঠরে ডিম দিলে অন্য কোন প্রাণী সে ডিম খেয়ে ফেলতে পারে, এ জন্য তারা গাছের ওপরের কোঠরে ডিম দেয়। ডিমগুলো হেফাজত করার পথ-নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

ডিমগুলো ফুটে বাচ্চা বের হবার পরে সে বাচ্চাগুলো প্রায় বিশ-ত্রিশ ফুট উঁচু থেকে নিচে নামবে কি করে? শক্ত মাটিতে বাচ্চাগুলো লাফিয়ে পড়লে আঘাত পেয়ে মারা যাবে, এ জন্য বড় হাঁসগুলো মুখ দিয়ে গাছের শুকনো পাতা ঐ গাছের গোড়ায় একত্রিত করে নরম তোষকের মতো বানিয়ে দেয়। তারপর বাচ্চাকে সংকেত দিলেই সে বাচ্চাগুলো কোঠর থেকে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের সাথে কোন সরোবরের দিকে চলে যায়। হাঁস ও তার বাচ্চাকে এই হেদায়াত দান করেছেন আল্লাহ্ তা'য়ালা।

সুতরাং, তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকে পথ-নির্দেশ দিয়েছেন, সৃষ্টির পরিমাপ ঠিক করেছেন ও সামঞ্জস্যতা বিধান করেছেন। সমস্ত সৃষ্টি পরিচালিত হচ্ছে মহান আল্লাহ্র হেদায়াত অনুসারে। মানুষকেও একমাত্র তাঁরই হেদায়াত অনুসরণ করতে হবে। মানুষের কাছে স্বয়ং আল্লাহ্ এই হেদায়াত পৌছান না, তিনি মানুষের মধ্যে থেকে একজন সর্বোত্তম মানুষকে নবী-রাসূল নির্বাচিত করে তাঁর মাধ্যমেই মানব-জাতিকে হেদায়াত প্রদর্শন করেছেন।

হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে যখন এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল, তখন তাকে শুধু একজন সাধারণ মানুষ হিসাবেই প্রেরণ করা হয়নি। তাকে নবী-রাসূলের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল। হেদায়াত অর্থাৎ সঠিক পথ আল্লাহ্ প্রদর্শন করবেন, এ কারণে পৃথিবীর প্রথম মানবকেই একজন নবী হিসাবে প্রেরণ করে তাঁর মাধ্যমে হেদায়াত দান করা হয়েছিল। সৃষ্টির অন্যান্য বস্তু ও জীবের স্বভাবের মধ্যেই যেমন আল্লাহ্ প্রয়োজনীয় হেদায়াত দান করেছেন, মানুষকে তা দান করা হয়নি তার উচ্চ মর্যাদার কারণে। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ও জীবকে যে প্রক্রিয়ায় হিদায়াত দেয়া হয়েছে, সেই একই প্রক্রিয়ায় মানুষকে হিদায়াত দেয়া হলে, মানুষ আর অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে মর্যাদাগত দিক থেকে কোন পার্থক্য থাকতো না এবং আল্লাহ্ যে পরীক্ষা করতে চান, সে উদ্দেশ্য সফল হতো না।

এ জন্য মানুষকে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে, সত্য-মিথ্যা যাচাই করার যাবতীয় যোগ্যতা দিয়ে এবং নবী-রাসূলের মাধ্যমে হেদায়াত দান

করা হয়েছে। মানুষ যেন পৃথিবীতে চিনে নিতে সক্ষম হয়, কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা। কোনটি অনুসরণ করা উচিত আর কোনটি উচিত নয়। পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে প্রেরণের সময় তিনি অনুভব করেছিলেন, এই পৃথিবীতে তিনি কোন নির্দেশের ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত করবেন। তখন স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বলেছিলেন−

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

আমার কাছ থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের কাছে পৌঁছবে, যারা আমার সেই বিধান অনুসরণ করবে, তাদের জন্য ভয়ভীতি এবং চিন্তার কোন কারণ থাকবে না।

যখনই মানুষের জন্য সহজ-সরল পথের প্রয়োজন হয়েছে, তখনই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী-রাসূল প্রেরণ করে তাঁর ওয়াদানুসারে মানব জাতিকে হেদায়াত দান করেছেন। জীবন পরিচালিত করার ব্যাপারে কোন পথ আবিষ্কার করার অধিকার মানুষের স্বয়ং নেই বা এ অধিকার তাকে দেয়া হয়নি।

কারণ মানুষের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, সমস্ত সমস্যাসমূহের প্রতি একই সময়ে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে পারে না এবং সে ক্ষমতাও মানুষের দৃষ্টির নেই। যাবতীয় সমস্যা সে একই সময়ে অনুধাবনও করতে পারে না বা অনুধাবন করার মতো জ্ঞানও মানুষের নেই। মানুষসহ প্রতিটি জীবের সমস্যা অনুধাবন করে তা সমাধান করার মতো সামর্থ মানুষের নেই।

মানুষের দৃষ্টি কতটা সঙ্কীর্ণ এবং সে দৃষ্টি তাকে কিভাবে প্রতারিত করে বা তার দৃষ্টির দুর্বলতা কেউ যদি পরীক্ষা করে দেখতে চায় তাহলে তাকে পাশাপাশি স্থাপন করা রেল লাইনের মাঝখানে দাঁড়াতে হবে। কিছুটা দূর পর্যন্ত দেখা যাবে যে, লাইন দুটো পাশাপাশি চলে গিয়েছে। এভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে মনে হবে অনেক দূরে গিয়ে লাইন দুটো একত্রিত হয়েছে। অথচ প্রকৃত বিষয় তা নয়। আড়াল থেকে কানে কোন শব্দ প্রবেশ করলে সেটা কিসের শব্দ, তা নির্ণয়ে মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয়। এভাবে প্রতিটি বিষয়েই মানুষ দুর্বলতার শিকারে পরিণত হয়। সুতরাং দুর্বলতায় আচ্ছন্ন অসমর্থ মানুষের পক্ষে সবার জন্য ইনসাফমূলক সার্বজনীন কোন বিধান রচনা করা সম্ভব নয়। তাকে অবশ্যই আল্লাহর বিধানের মুখাপেক্ষী হতেই হবে, এ ছাড়া তার সম্মুখে দ্বিতীয় কোন উন্মুক্ত নেই।

মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ, তিনিই মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেন। তিনিই মানুষকে পথপ্রদর্শন করেন। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের ইতিহাস পবিত্র কোরআনে বেশ কয়েক স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ সেখানে হেদায়াতের বিষয়টি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি তার জাতিকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের পূজা-উপাসনা, বন্দেগী, আনুগত্য, দাসত্ব করতে দেখে এবং মানুষের বানানো বিধান অনুসরণ করতে দেখে বলেছিলেন−

اَلَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ-وَالَّذِىْ هُوَيُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ-وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ-

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনিই আমাকে পথ দেখিয়েছেন। তিনি আমাকে আহার করান ও পান করান এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। (সূরা শু'আরা)

অর্থাৎ তিনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। আমি যখন ক্ষুধার্ত হই তখন তিনি আমাকে আহার দান করেন। আমি যখন তৃষ্ণা অনুভব করি তখন তিনি আমাকে পান করান। আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।

হযরত মুছা ও হযরত হারুন (আঃ)কে ফেরাউন প্রশ্ন করেছিল-

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى-

হে মুছা! তোমাদের দু'জনার রব কে? (সূরা ত্বা-হা-৪৯)

আল্লাহর নবী হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন-

قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى-

আমাদের রব্ব তিনি-যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন তারপর তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা ত্বা-হা-৫০)

আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি জিনিসকে শুধুমাত্র তার বিশেষ আকৃতি দান করেই এমনিভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তিনিই সবাইকে পথও দেখিয়েছেন। পৃথিবীর এমন কোন জিনিস নেই যাকে তিনি নিজের গঠনাকৃতিকে কাজে লাগাবার এবং নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পদ্ধতি শেখাননি। কানকে শোনার ও চোখকে দেখার কাজ তিনিই শিখিয়েছেন। মাছকে সাঁতার কাটার, পাখিকে উড়ার শিক্ষা তিনিই দিয়েছেন। গাছকে ফুল ও ফল দেবার এবং মাটিকে উদ্ভিদ উৎপাদন করার নির্দেশ তিনিই দিয়েছেন। সুতরাং তিনি শুধু স্রষ্টাই নন-গোটা জাহানের সমস্ত কিছুর শিক্ষক ও পথপ্রদর্শকও একমাত্র তিনিই।

সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল, মানুষের ক্ষুধার সময় তিনিই আহার করান, মানুষ তৃষ্ণার্ত হলে তিনিই পান করান, মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনিই নিরাময় দান করেন অর্থাৎ তিনি মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেন। সমস্ত কাজ তিনিই সম্পাদন করেন আর মানুষের হেদাতায়াতের কাজটি তিনি অন্যের জন্য রেখে দিবেন, এটা কোন যুক্তির কথা হতে পারে না। সুতরাং তিনি যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমনি সৃষ্টিকে হেদায়াতও তিনিই দান করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا–

আমি তাদেরকে পথ দেখিয়েছি, ইচ্ছা করলে তারা শোকরকারী হবে অথবা হবে কুফরকারী। (সূরা দহ্‌র-৩)

আল্লাহ বলেন, আমি মানুষকে শুধুমাত্র জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন করেই ছেড়ে দিইনি, সেই সাথে তাকে পথও প্রদর্শন করেছি। যেন তারা জানতে যে, শোকর-এর পথ কোনটি এবং কুফরের পথ কোনটি। তারপর তারা যে পথই অবলম্বন করবে, তার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী হবে। সূরা আল বালাদে বলা হয়েছে–

وَهَدَيْنَٰهُ النَّجْدَيْنِ–

আর আমি তাদেরকে উভয় পথ অর্থাৎ ভালো ও মন্দ স্পষ্ট করে দিয়েছি।

এভাবে আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত সৃষ্টিকেই পথপ্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ– ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا–

আর দেখো তোমার রব্ব মৌমাছীদেরকে এ কথা ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন, তোমরা পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ তরু-লতা ও মাচার ওপর ছড়ানো লতাগুল্মে নিজেদের চাক নির্মাণ করো। তারপর সব রকমের ফলের রস চুসে নাও এবং নিজের রব-এর প্রদর্শিত পথে চলতে থাকো। (সূরা নাহ্‌ল- ৬৮-৬৯)

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির জন্য অন্য কাউকে পথপ্রদর্শনের জন্য নিযুক্ত করেননি। তিনি স্বয়ং এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনিই গোটা বিশ্বলোকের সমস্ত কিছুর পথ-নির্দেশ দান করেন। পবিত্র কোরআন বলছে–

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ– أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ– قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ– أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ–

কে তিনি যিনি আর্তের ডাক শোনেন যখন সে তাঁকে কাতরভাবে ডাকে এবং কে তার দুঃখ দূর করেন? আর কে তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? আল্লাহর সাথে কি আর কোন ইলাহও কি এ কাজ করছে? তোমরা সামান্যই চিন্তা করে থাকো। আর কে

জলে-স্থলের অন্ধকারে তোমাদের পথ দেখান এবং কে নিজের অনুগ্রহের পূর্বাহ্নে বাতাসকে সুসংবাদ দিয়ে পাঠান? (সূরা নাম্‌ল-৬২-৬৩)

মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনে একমাত্র তিনিই সাড়া দেন, আর হেদায়াতের প্রয়োজনে তিনি হেদায়াত দেননি–মানুষ স্বয়ং তার হেদায়াতের নির্মাতা হবে, এ কথা জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধির অগম্য। এই কথা যারা বলে, তারা মানুষকে শোষণ করা এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত অশুভ স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্যই বলে থাকে। মানুষের প্রতিটি কাজের যাবতীয় উপকরণও তিনিই সরবরাহ করে থাকেন। সূরা কাহ্‌ফ-এর ১৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا–

এবং তিনি তোমাদের কাজের উপযোগী উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করবেন।

নির্ভুল–অভ্রান্ত পথ-নির্দেশ দেয়া তাঁরই দায়িত্ব এবং তিনিই সঠিক পথপ্রদর্শনকারী। একমাত্র তিনিই সত্য পথের দিকে পরিচালিত করে থাকেন। পৃথিবীতে যারা পথ নির্দেশদানকারী বলে দাবী করে, তারা মানুষকে ভ্রান্তপথের দিকে পরিচালিত করে। সূরা আহ্‌যাবে আল্লাহ্ বলেন–

وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ–

আল্লাহ্ এমন কথা বলেন যা প্রকৃত সত্য এবং তিনিই সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন।

সুতরাং নির্ভুল, অভ্রান্ত, স্থিতিস্থাপক, ইনসাফমূলক, সামঞ্জস্যমূলক, সহজ-সরল পথ একমাত্র আল্লাহ-ই রচনা করতে ও প্রদর্শন করতে পারেন। কোন মানুষের পক্ষে মানুষের জন্য অনুসরণীয় মতবাদ-মতাদর্শ, জীবন ব্যবস্থা রচনা করা কোনক্রমেই যে সম্ভব নয়, পৃথিবীর ইতিহাসই এর জ্বলন্ত সাক্ষী। এ যাবৎ কাল পর্যন্ত মানুষ যতগুলো আদর্শ উদ্ভাবন করেছে এবং তার ভিত্তিতে দেশ ও জাতিকে পরিচালিত করার প্রয়াস পেয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা শোচনীয় ব্যর্থতার গ্লানী বহন করেছেন। নিকট অতীতে মানব রচিত মতবাদ সমাজতন্ত্রের করুণ পরিণতি পৃথিবীবাসী অবলোকন করেছে এবং ঘৃণ্য পুঁজিবাদের মরণযন্ত্রণাও মানুষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে।

নির্ভুল পথ রচনায় মানুর্ষের দুলর্বতা

মানুষ তার নিজের সত্তার দিক দিয়েই একটি জগৎ বিশেষ। তার এই জগতের মধ্যে অসংখ্য শক্তি, যোগ্যতা ও কর্ম-ক্ষমতা বিদ্যমান। তার এই জগতের মধ্যে জাগ্রত রয়েছে কামনা-বাসনা, লোভ, লালসা, আবেগানুভূতি, ভাবাবেগ, ঝোঁক-প্রবণতা, কাম, ক্রোধ, জেদ, হঠকারিতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি। মানুষের দেহ ও মনের রয়েছে অসংখ্য দাবি। মানুষের আত্মা, প্রাণ ও স্বভাবের রয়েছে সীমাহীন জিজ্ঞাসা। প্রতি নিয়ত তার মধ্যে অসংখ্য

প্রশ্নমালা সৃষ্টি হচ্ছে। এসব প্রশ্নের জবাব লাভের জন্য সে অস্থির হয়ে ওঠে। এটাই হলো মানুষের জটিল অবস্থা। এই জটিল অবস্থা সম্পন্ন মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে মানব সমাজ গড়ে ওঠে, সে সমাজও নানা ধরনের জটিল সম্পর্কের ভিত্তিতেই গঠিত হয়। মানব সমাজ অসীম ও অসংখ্য জটিল সমস্যার সমন্বয়ের ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ লাভের সাথে সাথে এসব জটিলতা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে।

এসব সমস্যা ছাড়াও পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণের জন্য যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী মানুষের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, তা ব্যবহার করা এবং মানবীয় সংস্কৃতিতে তা ব্যবহার উপযোগী করে প্রয়োগ করার প্রশ্নেও মানুষের ভেতরে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে অসংখ্য জটিলতার সৃষ্টি করে। মানুষ তার নিজের দুর্বলতার কারণেই তার সমগ্র জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে একই সময়ে পূর্ণ ও সামঞ্জস্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে না। এ কারণে মানুষ নিজের জন্য জীবনের এমন কোন পথ স্বয়ং সে নিজেই রচনা করতে পারে না, যে পথ নির্ভুল হতে পারে।

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিটি মানুষের ভেতরেই একটি জগৎ রয়েছে এবং সে জগৎ অসংখ্য জটিল বিষয় সমন্বিত, অসংখ্য শক্তি-সামর্থ সে জগতে ক্রিয়াশীল রয়েছে। সুতরাং মানুষ স্বয়ং যে বিধি-বিধান, মত-পথ রচনা করবে, সে বিধান স্বয়ং মানুষের অন্তর্নিহিত যাবতীয় শক্তি-সামর্থের সাথে পূর্ণ ইনসাফ করবে, তার সমস্ত কামনা-বাসনার সাথে প্রকৃত অধিকার বুঝিয়ে দিবে, তার আবেগ-উচ্ছাস ও প্রবণতার সাথে ভারসাম্যমূলক আচরণ করবে, তার দেহের ভেতরের ও দেহের বাইরের যাবতীয় প্রয়োজন সঠিকভাবে পূরণ করবে, তার গোটা জীবনের যাবতীয় সমস্যার দিকে পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টি দিয়ে সেসব কিছুর এক সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান বের করবে এবং বাস্তব জিনিসগুলোও ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনে সুবিচার, ইনসাফ ও সত্যনিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবহার করবে–এসব কোন কিছুই মানুষের পক্ষে কক্ষনো সম্ভব হবে না।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ স্বয়ং যখন নিজের পথ-প্রদর্শক, আইন-কানুন, বিধান রচয়িতার ভূমিকা পালন করে, তখন নিগূঢ় সত্যের অসংখ্য দিকের মধ্য থেকে কোন একটি দিক, জীবনের অসংখ্য প্রয়োজনের মধ্য থেকে কোন একটি প্রয়োজন, সমাধানযোগ্য সমস্যাবলীর কোন একটি সমস্যা তার চেতনার জগতে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, মানুষ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক–অন্যান্য দিক ও প্রয়োজন এবং সমস্যাগুলোর ব্যাপারে সে কোন দৃষ্টিই দিতে সক্ষম হয় না। কারণ তার চেতনার জগৎ তো আচ্ছন্ন হয়ে থাকে বিশেষ একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে। এভাবে বিশেষ মানুষের ওপরে বিশেষ কোন মত বা আদর্শ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চাপিয়ে দেয়ার কারণে জীবনের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে সামঞ্জস্যহীনতার এক চরম পর্যায়ের দিকে তা বক্র গতিতে চলতে থাকে।

মানব জীবনের এই চলার বাঁকা গতি যখন শেষ স্তরে গিয়ে উপনীত হয় তখন মানুষের জন্য তা অসহ্যকর হয়ে জীবনের যেসব দিক, প্রয়োজন ও সমস্যার দিকে ইতিপূর্বে দৃষ্টি দেয়া হয়নি, সেসব দিক তরিৎ গতিতে বিদ্রোহ করে এবং সেসব প্রয়োজন পূরণ করতে বলে, সমস্যাগুলো সমাধানের দাবি করতে থাকে। কিন্তু তখন আর মানুষের পক্ষে সেসব প্রয়োজন পূরণ করা ও সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব হয় না। কারণ পূর্বানুরূপ সামস্যহীন কর্মনীতি পুনরায় চলতে থাকে।

পূর্বে যেসব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়নি, প্রয়োজনগুলো পূরণ করা সম্ভব হয়নি, সামস্যহীন কর্মনীতির ফলে মানুষের যেসব দাবি ও আবেগ-উচ্ছাসকে ভয়-ভীতি ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করে রাখা হয়েছিল, তা পুনরায় মানুষের ওপর প্রচন্ড গতিতে আধিপত্য বিস্তার করে বসে এবং তাকে নিজের বিশেষ দাবি অনুযায়ী বিশেষ একটি লক্ষ্যের দিকে গতিবান করে তোলার চেষ্টা করে।

এ সময় অন্যান্য দিক, প্রয়োজন ও সমস্যাগুলোর সাথে পূর্বের ন্যায় আচরণই করা হতে থাকে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে মানুষের জীবন কখনো সঠিক, সত্য, সহজ-সরল পথে একনিষ্ঠভাবে চলার মতো পরিবেশ লাভ করে না। সমস্যার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে সে ক্রমশঃ ডুবে যেতে থাকে। একটি ধ্বংস গহ্বর থেকে কোনক্রমেই সে উঠতে সক্ষম হলেও ছুটতে গিয়ে অন্য আরেকটি ধ্বংস গহ্বরে সে আছড়ে পড়ে। মানুষ এমনি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতায় পরিপূর্ণ এক জীব যে, কোন কাজ করতে গেলে সর্বপ্রথম তাকে নির্ধারণ করে নিতে হয় তার কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অন্য কোন জীবের ন্যায় এ মানুষ লক্ষ্যহীন কোন কাজ করতে পারে না আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে গেলেই তার সামনে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কোন আদর্শের ওপর ভিত্তি করে, কোন আদর্শের দেয়া নিয়ম অনুযায়ী সে তার কাজগুলো সম্পাদন করবে। মানুষের নিজের রচনা করা কোন মতবাদ মানুষকে আদর্শের সন্ধান দান করে না বিধায় মানুষ চরম হতাশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মানব চরিত্র যে কোন মতবাদ যখন মানুষকে আদর্শহীন অবস্থায় পৃথিবীতে ছেড়ে দেয়, তখন স্বাভাবিক কারণেই মানুষের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন শূন্যতা।

পক্ষান্তরে আদর্শহীন অবস্থায় চিন্তা ও চেতনার শূন্যতা নিয়ে, মানুষ জীবন ধারণ করতে পারে না বলে জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য আদর্শের সন্ধানে মানুষ অস্থির হয়ে ওঠে। ফলে চিন্তা ও চেতনার জগতের শূন্যতা পূরণ করার জন্য তার সামনে বিচিত্র ও মানব চিন্তার বিপরীতমুখী আদর্শের সামবেশ ঘটতে থাকে। এ অবস্থায় মানুষের যে কি করুণ পরিণতি ঘটে তা একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পরিষ্কার হতে পারে।

কোন একজন মানুষের অনেকগুলো বন্ধু ছিল। বন্ধুদের মধ্যে কেউ ছিল শুকনো কাঠ ব্যবসায়ী, কেউ ছিল তুলা ব্যবসায়ী, কেউ ছিল কাপড় ব্যবসায়ী, কেউ ছিল পেট্রোল ব্যবসায়ী, কেউ ছিল কেরেসিন তৈল ব্যবসায়ী, কেউ ছিল খড় ব্যবসায়ী, কেউ ছিল কাগজ

ব্যবসায়ী। হঠাৎ কোন একদিন দেখা গেল, গভীর রজনীতে ঐ অনেকগুলো বন্ধুর অধিকারী ব্যক্তিটির আপন বাসগৃহে আগুন লেগেছে। তখন ঐ ব্যক্তি চিৎকার করে তার বন্ধুদের কাছে সাহায্য চেয়ে বলছে, 'আমার এই চরম বিপদের মুহূর্তে তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করো।'

লোকটির এই করুণ আর্তনাদে সাড়া দিয়ে তার সমস্ত বন্ধুরা ছুটে এলো। কাঠ ব্যবসায়ী বন্ধু প্রচুর কাঠসহ ছুটে এসে অগুনের ভেতরে তা ছুড়ে দিলো। কাপড় ব্যবসায়ী বন্ধু কতকগুলো কাপড়ের থান এনে তা আগুনের ভেতরে ছুড়ে মারলো। খড় ব্যবসায়ী বন্ধু কয়েক বোঝা খড় এনে তা আগুনের ভেতরে ছুড়ে দিল। এভাবে কাগজ ব্যবসায়ী বন্ধু কাগজ, পেট্রোল ব্যবসায়ী বন্ধু পেট্রোল, কেরেসিন ব্যবসায়ী বন্ধু কেরোসিন আগুনের ভেতরে ছুড়ে দিলো। ফল যা হবার তাই হলো। আগুন নির্বাপিত হবার পরিবর্তে আগুন আরো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। সমস্ত বন্ধুর কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল বিপদগ্রস্থ বন্ধুকে সাহায্য করা অর্থাৎ বন্ধুর ঘরের আগুন নিভিয়ে ফেলা। পক্ষান্তরে বিপদগ্রস্থ বন্ধুর জন্য এই লোকগুলো যা করলো, তাতে করে বিপদগ্রস্থ বন্ধুর বিপদ বৃদ্ধি বৈ কমলো না।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজের জন্য যত আদর্শ, মতবাদ-মতাদর্শ রচনা করেছে তা সবই আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু বলে প্রতিভাত হয়েছে। ভুল দিক থেকে তার গতি শুরু হয় এবং ভুল দিকেই তা উপনীত হয়ে সমাপ্তি লাভ করে এবং সেখান থেকে পুনরায় অন্য কোন ভুল পথের দিকেই অগ্রসর হতে থাকে। এসব অসংখ্য বাঁকা ও ভ্রান্ত পথের ঠিক মাঝামাঝি অবস্থানে অবস্থিত এমন একটি পথ একান্তই আবশ্যক। যেন মানুষের সমস্ত শক্তি ও কামনা বাসনার প্রতি, সমস্ত ভালোবাসা, মায়ামমতা, স্নেহ, প্রেম-প্রীতি ও আবেগ উচ্ছ্বাসের প্রতি, মানুষের আত্মা ও শারীরিক সমস্ত দাবির প্রতি এবং জীবনের যাবতীয় সমস্যার প্রতি যথাযথ–ন্যায়-নিষ্ঠ আচরণ করা, যে আচরণে কোন ধরনের বক্রতা ও জটিলতা থাকবে না, বিশেষ কোন দিকের প্রতি অযথা গুরুত্ব আরোপ ও অন্যান্য দিকগুলোর প্রতি অবিচার ও জুলুম করা হবে না।

বস্তুত মানব জীবনের সুষ্ঠু ও সঠিক বিকাশ এবং তার সাফল্য ও সার্থকতা লাভের জন্য এটা একান্তভাবে অপরিহার্য। মানুষের মূল প্রকৃতিই এই সত্য-সঠিক পথ তথা সিরাতুল মুস্তাকিম লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। পৃথিবীর কোন অমুসলিম বা ইসলাম বিদ্বেষী চিন্তানায়ক এ কথার প্রতি স্বীকৃতি দিক আর না-ই দিক, এ কথা চরম সত্য যে, অসংখ্য বাঁকা-চোরা পথ, ভ্রান্তপথ থেকে বারবার বিদ্রোহ ঘোষণার মূল কারণ হলো, মানব প্রকৃতি সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সহজ-সরল পথের সন্ধানেই ছুটতে থাকে।

পক্ষান্তরে এ কথা সর্বজনবিদিত ও চরম সত্য যে, মানুষ স্বয়ং মুক্তির এই রাজপথ আবিষ্কার করতে ও চিনতে সক্ষম হয় না এবং সিরাতুল মুস্তাকিম মানুষ রচনা করতে পারে না–শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই সিরাতুল মুস্তাকিম রচনা করার মতো জ্ঞানের

অধিকারী এবং তিনিই তা রচনা করতে সক্ষম। ঠিক এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যেই আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁদের আন্দোলন-সংগ্রামের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, মানুষকে মুক্তির রাজপথে নিয়ে আসা তথা আল্লাহর গোলামীর পথ–সিরাতুল মুস্তাকিম কোনটি তা প্রদর্শন করা। আল্লাহর কোরআন এই মহামুক্তির মহান পথ সিরাতুল মুস্তাকিমকে 'সাওয়া-আস-সাবীল' নামেও মানুষের সামনে পেশ করেছে। পৃথিবীর এই নশ্বর জীবন থেকে শুরু করে আলমে আখিরাতের দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবন পর্যন্ত অসংখ্য বাঁকা-চোরা এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন পথের মাঝখান দিয়ে সিরাতুল মুস্তাকিম বা মহামুক্তির মহান পথ সরল রেখার মতোই আল্লাহর জান্নাতের দিকে চলে গিয়েছে। সুতরাং এই পথের যিনি পথিক হবেন, তিনি এই পৃথিবীতে নির্ভুল-অভ্রান্ত পথের পথিক হবেন এবং আলমে আখিরাতের দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবনে পরিপূর্ণভাবে সার্থক ও সাফল্যমন্ডিত হবেন।

আর যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে সিরাতুল মুস্তাকিমের অভ্রান্ত পথ চিনতে ব্যর্থ হবে বা হারিয়ে ফেলবে সে ব্যক্তি এই পৃথিবীতেও বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও ভুল পথের যাত্রী আর আলমে আখিরাতে তাকে অনিবার্যরূপে আল্লাহর জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। কারণ সিরাতুল মুস্তাকিম বা সাওয়া-আস সাবীল ব্যতিত অন্য সমস্ত বাঁকা পথের শেষ প্রান্ত আল্লাহর জাহান্নাম পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে।

বস্তুবাদ আর জড়বাদের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত একশ্রেণীর চিন্তানায়কগণ বর্তমান মানুষের জীবনকে ক্রমাগতভাবে একটি প্রান্ত থেকে বিপরীত দিকের আরেকটি প্রান্তে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হতে দেখে এই ভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, দ্বান্দ্বিক কার্যক্রম (Dialectical Process) মানুষের জীবনের ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক স্বভাবসম্মত পথ। এসব চিন্তাবিদগণ নিজেদের অজ্ঞতার কারণে বুঝে নিয়েছেন যে, প্রথমে এক চরমপন্থী দাবী (Thesis) মানুষকে একদিকের শেষ প্রান্তে নিয়ে যাবে, ঠিক অনুরূপভাবে সে ঐ প্রান্ত থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আরেকটি চরমপন্থী দাবী (Antithesis) তাকে বিপরীত দিকের শেষ প্রান্তে নিয়ে পৌছাবে। এভাবে উভয় প্রান্তের আঘাতের সংমিশ্রণে মানুষের জন্য তার জীবন বিকাশের পথ (Synthesis) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেরিয়ে আসবে আর এটাই হচ্ছে মানুষের ক্রমবিকাশ লাভের একমাত্র অভ্রান্ত পথ।

ভোগবাদে বিশ্বাসী এসব জড়বাদীদের আবিষ্কার করা ক্রমবিকাশ লাভের এই পথকে ক্রমবিকাশ লাভের পথ না বলে চপেটাঘাত খাওয়ার পথ বললে অতুক্তি হবে না। কারণ মানুষের জীবনের সঠিক বিকাশের পথে এই পথ বারংবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, মানব জীবন বিকাশের পথে এ পথ অর্গল তুলে দেয়। প্রতিটি চরমপন্থী দাবী মানুষের জীবনকে তার কোন একটি দিকে ঘুরিয়ে দেয় ও তাকে কঠিনভাবে টেনে নিয়ে যায়। এভাবে বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে হতে যখন সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে তা অনেক দূরে

চলে যায়, তখন স্বয়ং জীবনেরই অন্যান্য যেসব সমস্যার প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি, যেসব সমস্যাগুলোর কোন সমাধান করা হয়নি, তা বিদ্রোহ শুরু করে।

এভাবে একটির পর একটি দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে, মানুষের জীবন থেকে শান্তি সুদূর পরাহত হয়ে যায়। এই অন্ধদের দৃষ্টি সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে যেতে বাধা দেয় তাদের সীমাহীন ভোগ ব্যবস্থা। এ জন্য তারা দেখতে পায় না, সিরাতুল মুস্তাকিমই হলো মানব জীবনের ক্রমবিকাশ লাভের একমাত্র সত্য-সঠিক পথ।

কোরআনই সিরাতুল মুস্তাকিম

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেন–

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ–

বস্তুত এই (কোরআন) একটি পয়গাম সমস্ত মানুষের জন্য আর এটা প্রেরিত হয়েছে এ জন্য যে, এর মাধ্যমে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হবে এবং তারা অবগত হবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ শুধু একজন আর বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যাপারে সচেতন হবে। (সূরা ইবরাহীম-৫২)

আল্লাহর এই কিতাব পৃথিবীর কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে বা কোন শ্রেণী বিশেষকে পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়নি, এই কিতাব সমস্ত মানুষের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য এই কোরআন হেদায়াতের পয়গাম বহন করে এনেছে। এই কোরআন সোজা সহজ সরল পথপ্রদর্শন করতে এসেছে। এই কোরআনকে যারা অনুসরণ করবে তারা নিজেদের কল্যাণের লক্ষ্যেই তা করবে। আর যারা অনুসরণ করবে না, তারা নিজেদেরই অকল্যাণ সাধন করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ–فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ–وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا–

আমি সমস্ত মানুষের জন্য এ সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং যে সোজা পথ অনুসরণ করবে সে নিজের জন্যই করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে তার পথভ্রষ্টতার প্রতিফলও তাকেই ভোগ করতে হবে। (সূরা যুমার-৪১)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কোরআন কেন এবং কোন উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করেছেন, তা আমরা ইতিপূর্বে 'কোরআন অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আল্লাহর দায়িত্ব হলো নিজের সৃষ্টিসমূহকে পথপ্রদর্শন করা, যে পথে চলে তারা নিজেদের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে সফল ও পূর্ণ করতে পারবে সেই পথের সন্ধান

বলে দেয়া। এ কারণেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন অবতীর্ণ হওয়া একদিকে যেমন তাঁর পরম দয়াশীলতার অনিবার্য দাবী, তেমনিভাবে তাঁর সৃষ্টিকর্তা হওয়ারও স্বাভাবিক ও অপরিহার্য দাবীও এই কোরআনের অবতরণ।

আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তাঁর সৃষ্টিসমূহের পথপ্রদর্শনের কাজ সুসম্পন্ন করেছেন এই কোরআন অবতীর্ণ করে। সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং যদি তাঁর সৃষ্টির বিধি-ব্যবস্থা বলে না দেন, কর্মপথ নির্দিষ্ট না করেন, তাহলে দ্বিতীয় কে এমন আছে যে, তা করবে ? শুধু তাই নয়–সৃষ্টিকর্তাই যদি তাঁর সৃষ্টিকে হেদায়াত দিতে অক্ষম হন, তাহলে কে এমন আছে যে, তিনি হেদায়াত দান করতে সক্ষম ?

স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যে জিনিস নির্মাণ করলেন, তার জীবন, উদ্দেশ্য, পরিপূরণের পন্থা ও পদ্ধতি তিনিই বলে দিয়েছেন। মানুষের দেহের প্রতিটি লোমকূপ, প্রতিটি কোষ ও টিস্যু'র যা কাজ, মানব দেহে অবস্থান করে যে কাজ তাকে করতে হয়, এই কাজের শিক্ষা দিয়েছেন মহান আল্লাহ। সুতরাং এই লোমকূপ ও কোষসমূহের সমষ্টি যে মানুষ, সে নিজে তার সৃষ্টিকর্তার শিক্ষা ও পথপ্রদর্শন থেকে বঞ্চিত থাকে কিভাবে? মানুষকে এই হেদায়াত থেকে বঞ্চিত রাখা হয়নি, পবিত্র কোরআন সেই হেদায়াত হিসাবে আগমন করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ–

রমযানের মাস, এতেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন-যাপনের বিধান আর এটা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ, যা সঠিক ও সত্য পথপ্রদর্শন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কাররূপে তুলে ধরে। (সূরা বাকারা ১৮৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কোরআনকে 'হুদাল্লিন নাছ' অর্থাৎ মানব জাতির জন্য এটা হেদায়াত–বলে ঘোষণা করেছেন। সূরা নেছায় বলা হয়েছে–

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ–

হে নবী ! আমি এই কিতাব পূর্ণ সত্যতা সহকারে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন আল্লাহ তোমাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন, সেই অনুসারে লোকদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করতে পারো। (সূরা নিছা-১০৫)

এই কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সহজ-সরল পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে আগমন করেছে। কোনটি আলো, কোনটি অন্ধকার, কোনটি সত্য আর

কোনটি মিথ্যা, কোন পথে অশান্তি আর কোন পথে শান্তি, কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায় তার স্পষ্ট পার্থক্য করে দেয় আল্লাহর এই কোরআন। এই কোরআনই মানুষকে সত্য পথপ্রদর্শন করে এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এই কোরআন দিয়েই মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দেয়ার জন্য।

মানুষের হক ও বাতিল, ন্যায় ও অন্যায়, ভালো ও মন্দ বুঝানোর জন্য এবং হেদায়াতের পথপ্রদর্শনের জন্য সবচেয়ে বড় যা হতে পারে, তা-ই হলো এই কোরআন এবং সেটাই মানুষের জন্য মানুষের স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা অবতীর্ণ করেছেন। এই কোরআন থেকে মানুষ যদি হেদাতায়ত গ্রহণ না করে, তাহলে গোটা সৃষ্টিজগতের মধ্যে দ্বিতীয় এমন কোন জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে যে, মানুষ সেখান থেকে হেদায়াত গ্রহণ করতে পারে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ–

এই কোরআনের পরিবর্তে আর কোন কালাম এমন থাকতে পারে যে, যার প্রতি এসব মানুষ ঈমান আনবে? (সূরা মুরসালাত-৫০)

কোরআন ব্যতীত হক ও বাতিলের পার্থক্য নিরূপণ করা এবং হেদায়াতের পথপ্রদর্শনের অপর কোন মাধ্যম নেই। সুতরাং, যারা এই কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করবে না তারা আর কোন মাধ্যম থেকে হেদায়াত পাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا–وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا–

আসলে এ কোরআন এমন পথ দেখায় যা একেবারেই সোজা। যারা একে নিয়ে ভালো কাজ করতে থাকে তাদেরকে সে সুসংবাদ দেয় এই মর্মে যে, তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে। আর যারা আখিরাত অস্বীকার করে তাদেরকে এ সংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৯-১০)

কোরআন সোজা পথপ্রদর্শন করে এবং এই কোরআন থেকে যারা হেদায়াত গ্রহণ করে তারা আল্লাহর কাছে বিরাট প্রতিদান লাভ করবে। আর যারা এই কোরআনকে হেদায়াত বলে বিশ্বাস করে না বা এর থেকে হেদায়াত গ্রহণ করে না, তারা কিয়ামতের ময়দানে কঠিন শাস্তির মধ্যে নিপতিত হবে। তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কোরআন থেকে যারা হেদায়াত গ্রহণ করেনি, তাদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

اِذَا اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ–تَكَادُ

تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ-كُلَّمَا اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ-

তারা যখন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন জাহান্নামের ক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়াবহ ধ্বনি শুনতে পাবে। তা তখন উত্থাল-পাতাল করতে থাকবে, ক্রোধ-আক্রোসের অতিশয় তীব্রতায় জাহান্নাম যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম করবে। প্রতিবারে যখনই জাহান্নামের মধ্যে কোন জনসমষ্টি নিক্ষিপ্ত হবে, তখন এর কর্মচারীরা সেই লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন সাবধানকারী কি তোমাদের কাছে আসেনি?

কোরআন প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ যারা গ্রহণ করেনি, কোরআনকে যারা হেদায়াত হিসাবে অনুসরণ করেনি, জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের মধ্যে যখন তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নামের দ্বাররক্ষী প্রশ্ন করবে, কেন তোমরা এই কঠিন আযাবের মধ্যে এলে? এই ভয়াবহ আযাবের কথা কেউ কি তোমাদেরকে পৃথিবীর জীবনে বলেনি ? আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হেদায়াত কি তোমরা লাভ করনি ? সিরাতুল মুস্তাকিম কি তোমাদের সামনে ছিল না? জাহান্নামীরা আক্ষেপ করে বলবে-

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاءَ نَا نَذِيْرٌ-فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ-اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ-

হ্যাঁ, সাবধানকারী আমাদের কাছে এসেছিল বটে, কিন্তু আমরা তাঁকে অমান্য ও অবিশ্বাস করেছি এবং বলেছি যে, আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। আসলে তোমরা অতিমাত্রায় পথ ভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছো। (সূরা মুল্‌ক-৯)

অবশ্যই আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হেদায়াত নিয়ে আল্লাহর দ্বীনের ধারক-বাহকগণ এসেছিল। কিন্তু আমরা তা বিশ্বাস করিনি বরং তাদেরকে বলেছি, আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোন হেদায়াত অবতীর্ণ হয়নি। মানুষের জন্য কোন জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি, যদি কিছু করেই থাকেন, তা ধর্মগ্রন্থ হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা এই ধর্মকেই মানুষের জীবন ব্যবস্থা তথা যাবতীয় বিধি-বিধান হিসাবে পেশ করছো। মানুষকে তোমরা প্রগতি থেকে অধঃগতির দিকে নিয়ে যেতে চাও। তোমরা দেশ ও জাতিকে সামনের দিকে না নিয়ে পেছনের দিকে নিয়ে যাবার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তোমরা নিজেরাও যেমন পথভ্রষ্ট, তেমনি আল্লাহর বিধানের নামে গোটা মানব মন্ডলীকেও বিভ্রান্ত করতে চাও। আমরা এসব কথা বলে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদর্শন করা সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে নিজেদেরকে পরিচালিত করিনি এবং জাতিকেও পরিচালিত করার কোন চেষ্টা করিনি।

আল্লাহর দেয়া হেদায়াত থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে কাফির মুশরিকদের কাছ থেকে আমদানী করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। এই মতবাদের যারা অনুসারী এবং যারা সমর্থক, যারা আল্লাহর দেয়া হেদায়াত অনুসরণ করেনি, তারা আল্লাহর জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব দেখে আক্ষেপ করে বলতে থাকবে–

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ–

আর তারা বলবে, হায়–আমরা যদি শুনতাম ও অনুধাবন করতাম তাহলে আমরা আজ এই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম না। (সূরা মুল্ক)

যারা সত্য পথ অবলম্বন করে এই পৃথিবীতে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করার আকাংখা পোষণ করে, এই কোরআন তাদের জন্য পথপ্রদর্শক এবং সুসংবাদ হিসাবে আগমন করেছে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَهُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ–

এই কোরআন ঈমানদারদের জন্য সঠিক পথের সন্ধান ও সাফল্যের সুসংবাদ নিয়ে এসেছে। (সূরা বাকারা-৯৭)

সাফল্যের এই সুসংবাদ পৃথিবীতে নতুন কোন বিষয় নয়–আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে কোরআনের পূর্বেও বিভিন্ন নবী-রাসূলদের ওপরে কিতাব অবতীর্ণ করে সাফল্য ও সুসংবাদ দান করেছেন। সুতরাং সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ নতুন কোন পথ নয়, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই পৃথিবী সিরাতুল মুস্তাকিমের সাথে পরিচিত হয়নি, ইতিপূর্বেও এই পথের সাথে পৃথিবীর পরিচয় ঘটেছে। প্রতিটি নবী-রাসূলই সেই একই সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকেই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন।

কোরআন শান্তি ও নিরাপত্তার পথপ্রদর্শন করে

আল্লাহর এই কিতাব তাদেরকেই পথপ্রদর্শন করে, যারা অসংখ্য বাঁকা পথের অশুভ হাতছানি থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করে সহজ-সরল পথের সন্ধান লাভের জন্য চেষ্টা চালায়। আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত যাবতীয় বিষয়াদি ও শিক্ষাসমূহ অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কার। এসব শিক্ষা এতটাই পরিষ্কার যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলেই সত্যের অভ্রান্ত পথ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে। যারা কোরআন যথাযথভাবে অনুসরণ করে, এই কোরআন কত সুন্দর ও নির্ভুল পথপ্রদর্শন করে এবং এটা কত বড় রাহ্মতের ব্যাপার তা তাদের জীবনে ও কর্মে প্রত্যক্ষ করা যায়। কোরআন প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকিমের প্রভাবে মানুষের মন-মানস, নৈতিক চরিত্র, আচার-ব্যবহারে যে স্বাভাবিক এক অতি উত্তম বিপ্লব সূচিত হয় তাও লক্ষ্য করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন–

هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ-

এই কিতাব ঈমানদার লোকদের জন্য হেদায়াত ও রাহ্মত স্বরূপ।

এই কোরআনে অপরিসীম বিচক্ষণতার আলো প্রস্ফুটিত রয়েছে। এর অত্যধিক উজ্জ্বল সৌন্দর্য হলো, যারা এর হেদায়াত অনুসরণ করে তারা অতি সহজেই জীবনের সরল-সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যায় এবং তাদের নির্মল ও উত্তম চরিত্রে আল্লাহর অফুরন্ত রাহ্মতের নিদর্শন প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ-

বস্তুত এটা অন্তর্দৃষ্টির উজ্জ্বলতম আলো, তোমাদের রব-এর কাছ থেকে অবতীর্ণ। এটা হেদায়াত ও রাহ্মত সেই লোকদের জন্য, যারা এটা মেনে নিবে।

এই পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় সমস্যাকে যদি রোগ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে, এসব রোগ নির্মূল করার লক্ষ্যেই এই কোরআনের আগমন ঘটেছে। আল্লাহ বলেন–

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ-وَهُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-

হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে নসীহত এসে পৌছেছে, এটা অন্তরের যাবতীয় রোগের পূর্ণ নিরাময় আর যে তা কবুল করবে, তার হেদায়াত ও রাহ্মত নির্দিষ্ট হয়ে আছে। (সূরা ইউনুস-৫৭)

আল্লাহর এই কোরআন–এটা এমনি এক হেদায়াত, যেসব মানুষের অন্তর কালিমা লিপ্ত হয়ে পড়েছে, সেই মসীলিপ্ত অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করে দেয়। এই কিতাবের কাছ থেকে যারা সিরাতুল মুস্তাকিম লাভ করতে চায়, তাদের জন্য হেদায়াত ও রাহ্মতের ব্যবস্থা মহান আল্লাহ করে রেখেছেন। মানুষ আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানালো, তারা সত্য পথ তথা হেদায়াত লাভ করতে চায়। মহান আল্লাহ প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাদের হেদায়াতের জন্য পবিত্র কোরআন নবীর মাধ্যমে তাদের সামনে পেশ করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ-

আমি এ কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যা সব জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে এবং যা সঠিক পথনির্দেশনা, রাহ্মত ও সুসংবাদ বহন করে তাদের জন্য যারা আনুগত্যের মাথা নত করে দিয়েছে। (সূরা নাহ্ল-৮৯)

এই কোরআন এমন প্রত্যেকটি জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে, যার ওপর হেদায়াত ও পথভ্রষ্টতা এবং লাভ ও ক্ষতি নির্ভর করে, যা জানা সঠিক পথে চলার জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং যার মাধ্যমে হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যারা কোরআন থেকে হেদায়াত গ্রহণ করবে এবং আনুগত্যের পথ অবলম্বন করবে আল্লাহর কোরআন জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবে, একে অনুসরণ করে চলার কারণে তাদের প্রতি আল্লাহর রাহ্মত বর্ষিত হবে এবং এ কিতাব তাদেরকে এই সুসংবাদ দেবে যে, চূড়ান্ত ফায়সালার দিন আল্লাহর আদালত থেকে তারা সফলকাম হয়ে বের হয়ে আসবে।

অন্য দিকে যারা আল্লাহ কোরআনের অনুসরণ করবে না তারা যে শুধুমাত্র হেদায়াত ও রাহ্মত থেকে বঞ্চিত হবে তাই নয়–বরং কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর নবী তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে দাঁড়াবেন তখন এই দলীলটিই হবে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কারণ নবী এ কথা প্রমাণ করে দিবেন যে, তিনি তাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছিলেন যার মধ্যে হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছিল।

মানুষের জন্য আল্লাহর এই কোরআন সবচেয়ে বড় দান, সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার, সবচেয়ে বড় সম্পদ-নিয়ামত। মানুষের ব্যক্তি জীবন বা রাষ্ট্রীয় জীবনে একটি স্বাভাবিক বিষয় দেখা যায়, কোন ব্যাপারে যদি একজন মানুষ অথবা একটি রাষ্ট্রের জনগণ সাফল্য লাভ করে, তাহলে ব্যক্তি যেমন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি রাষ্ট্রও আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। নিজ দেশের সেনাবাহিনী যখন শত্রু দেশের সৈন্যদেরকে নাস্তানাবুদ করে বিজয়ী হয়ে আসে, তখন বিজয়ী দেশের জনগণ আনন্দ-উল্লাসে দিশাহারা হয়ে যায়।

অর্থাৎ লাভের পরিমাণটা যত বেশী হয়, মানুষ তত বেশী আনন্দ প্রকাশ করে থাকে, এটা মানুষের স্বভাব। এই পৃথিবী ও আখিরাতের জীবনে মানুষকে সবচেয়ে অধিক লাভ করে দিতে পারে এই কোরআন। মানুষকে সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌছে দেয়ার জন্যই এই কোরআন প্রেরণ করা হয়েছে। মানুষের সবচেয়ে বেশী আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা উচিত যে, তারা কোরআনের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার লাভ করে শয়তানী শক্তির ওপরে বিজয়ী হয়েছে। এই যমীন ও আকাশের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, এসব প্রতিটি বস্তুর যা মূল্য হবে, সেসব মূল্য একত্রিত করলে যে পরিমাণ দাঁড়াবে, আল্লাহর কোরআনের একটি অক্ষরের মূল্যের সাথেও তা তুলনীয় হবে না। এই কোরআন যে কত মূল্যবান, এটা মহান আল্লাহর যে কতবড় নিয়ামত, তা মানুষ অনুধাবন করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا–هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ–

হে নবী! আপনি বলে দিন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অপার করুণা যে, তিনি এই কোরআন প্রেরণ করেছেন। এই জন্য তো লোকদের আনন্দ স্ফূর্তি করা উচিত। এই কোরআন সেসব জিনিস থেকে উত্তম যা লোকজন সংগ্রহ ও আয়ত্ত করে থাকে। (সূরা ইউনুস-৫৮)

কোরআনই সেই সিরাতুল মুস্তাকিম, মানুষ যা নামাজের মধ্যে বার বার কামনা করে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে আগ্রহী, আল্লাহর এই কোরআন তাদের যাবতীয় অভাব পূরণ করে। কোরআন মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা দান করে। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। মহান আল্লাহ বলেন–

قَدْ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوعرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ-يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রৌশনী এসেছে, সেই সাথে এমন একটি সত্য প্রদর্শনকারী কিতাবও–যার সাহায্যে আল্লাহ তা'য়ালা তার সন্তোষ-সন্ধানকারী লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ বলে দেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান ও সঠিক পথে পরিচালিত করেন। (সূরা মায়িদা-১৫-১৬)

এই আয়াতে পরিষ্কার বলে দেয়া হলো, যে সিরাতুল মুস্তাকিম মানুষ লাভ করার জন্য আল্লাহর দরবারে অভিনন্দন পূর্বক দাবি পেশ করে, এই কোরআনই সেই সিরাতুল মুস্তাকিম। সূরা আল জাসিয়ার এগার আয়াতে এই কোরআনকে 'হাযা হুদা' অর্থাৎ হেদায়াত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এটাই মানব জাতিকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করবে। শর্ত হলো, এই কোরআনের বিধানের সামনে মাথানত করে দিতে হবে।

মানুষের জীবন সফল হতে পারে তখনই যখন সে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু সে মানুষের জানা নেই, কোন পথে সে নিজের জীবনকে পরিচালিত করলে মহান আল্লাহ তার ওপরে সন্তুষ্ট হবেন। এই কোরআন এমনি এক হেদায়াত–যা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ, মানুষের কাংখিত পথপ্রদর্শন করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ-وَيَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ-

হে নবী! জ্ঞানবানরা ভালো করেই জানে, যা কিছু তোমার রব-এর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ সত্য এবং তা (এই কোরআন) পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথপ্রদর্শন করে। (সূরা সাবা-৬)

কোরআন থেকে হেদায়াত লাভের শর্ত

মানুষের হেদায়াতের জন্যে একমাত্র এই কোরআনকেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। মানুষ আল্লাহর দরবারে যে হেদায়াত কামনা করলো, সেই হেদায়াত হিসাবে তার কাছে ত্রিশপারা কোরআন দিয়ে বলা হলো, এই কোরআন থেকে হেদায়াত গ্রহণ করো। আল্লাহর এই কিতাব থেকে হেদায়াত গ্রহণ করতে হলে কতিপয় শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। সেই শর্ত পূরণ না করলে কোনক্রমেই এই কিতাব থেকে হিদায়াত লাভ করা যাবে না।

কোন ব্যক্তি যদি মহাশূন্যে গমন করতে যায়, চাঁদ বা অন্য কোন গ্রহে ভ্রমণ করতে চায়, তাহলে কাংখিত গ্রহে ভ্রমণের উপযোগী হিসাবে দীর্ঘ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। সেই গ্রহের উপযোগী পোষাক পরিধান করতে হয়। মহাশূন্যে কিভাবে আহার করতে হবে, ঘুমাতে হবে, মলমূত্র ত্যাগ করতে হবে ইত্যাদি বিষয় তাকে অবগত হতে হয়। তারপর পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে মহাশূন্যের পথে পা বাড়াতে হয়।

একই ভাবে কোন বস্তু থেকে উপকার বা কল্যাণ গ্রহণ করতে হলে সেই বস্তুর ব্যবহার বিধি মানুষকে অবশ্যই জানতে হয়। ব্যবহার বিধি না জেনে কোন বস্তু ব্যবহার করলে তা থেকে কল্যাণ লাভ করা যায় না।

এই কোরআন আল্লাহ মানব জাতির জন্য হেদায়াত হিসাবে প্রেরণ করেছেন। এই কোরআন থেকে হিদায়াত লাভ করতে হলেও মানুষকে হিদায়াত লাভের উপযোগী হতে হবে, তারপর সে এই কোরআন থেকে হিদায়াত লাভে সমর্থ হবে। এই কোরআন কোন ধরনের লোকদেরকে পথ নির্দেশ দিবে, তা স্বয়ং কোরআন বলছে–

تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ-هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ-الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ-

এগুলো কোরআনের ও এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত, পথনির্দেশ ও সুসংবাদ এমন মুমিনদের জন্য যারা নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং তারা এমন লোক যারা আখিরাতকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে। (সূরা নাম্‌ল-১-৩)

আল্লাহর কিতাব শুধুমাত্র সেসব লোকদেরই পথনির্দেশনা দেয় এবং আনন্দদায়ক পরিণামের সুসংবাদও একমাত্র সেসব মানুষকে দেয়, যেসব মানুষ ঈমান আনে। ঈমান আনার অর্থ হলো, তারা কোরআন ও নবী করীম (সাঃ) এর আহ্বান কবুল করেন। এক আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ, রব্ব, মা'বুদ বা উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই কোরআনকে আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিতাব হিসাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে তা মেনে নেয়। নবী করীম (সাঃ) কে শুধু নবী-রাসূল ও জীবনের অনুসরণের একমাত্র আদর্শ নেতা হিসাবে মেনে নেয়। সেই

সাথে সে এই বিশ্বাসও অন্তরে পোষণ করে যে, পৃথিবীর জীবন শেষে মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন রয়েছে, সেই জীবনে এই পৃথিবীর জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে এবং প্রতিদান পেতে হবে।

কোরআন থেকে হিদায়াত লাভ করতে হলে শুধু উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি দিলেই হিদায়াত পাওয়া যাবে না। নিজের জীবনে বাস্তবে এগুলোর অনুসরণ ও আনুগত্য করতে হবে। হিদায়াত লাভের জন্য উল্লেখিত দিকগুলোর অনুসরণ ও আনুগত্যের প্রথম লক্ষণই হলো, হিদায়াত কামনাকারী ব্যক্তি নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত দানের উপযুক্ত হলে যাকাত দান করবে। এই কাজ যারা করবে, আল্লাহর কোরআন তাদেরকেই হেদায়াত দান করবে বা সত্য সহজ সরল পথের সন্ধান দান করবে। জীবন পথের প্রতিটি বাঁকে তাদেরকে সত্য আর মিথ্যা এবং ন্যায় আর অন্যায়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দিবে। মানুষ যদি কোনভাবে ভুল পথের দিকে অগ্রসর হতে চায়, কোরআন তাকে সতর্ক করবে। তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দান করবে যে, সত্য সঠিক পথ অবলম্বন করার ফলাফল এই পৃথিবীতে মিষ্ট বা তিক্ত যা-ই হোক না কেন, পরিশেষে এর বিনিময়ে চিরন্তন সফলতা তারাই অর্জন করবে এবং তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে।

কোরআন থেকে হেদায়াত লাভের বিষয়টি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে স্পষ্ট করা যেতে পারে। রোগী যদি ডাক্তারের কাছ থেকে উপকৃত হতে আগ্রহী হয় তাহলে ডাক্তারকে নিজের চিকিৎসক হিসাবে গ্রহণ করে তার ব্যবস্থাপত্র (Prescription) অনুসারে রোগীকে চলতে হবে। তেমনি কেউ যদি কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে আগ্রহী হয়, তাকেও কোরআনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। আর মানুষ এই আনুগত্য যথার্থই করছে কিনা, তা নামাজ আদায় ও যাকাত দানের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যায়।

মানুষ যদি নামাজ আদায় না করে, সামর্থ থাকার পরও যাকাত আদায় না করে, তাহলে এ কথা স্পষ্ট বুঝতে হবে যে, সে ব্যক্তি কোরআন থেকে হেদায়াত চায় না। অর্থাৎ এমন ধরনের ব্যক্তি সে, দেশের শাসককে শাসক হিসাবে মেনে নিলেও শাসকের আদেশ মানতে মোটেও প্রস্তুত নয়। কোরআনকে কোরআন হিসাবে স্বীকৃতি সে দেয়, কিন্তু কোরআনের বিধান মানতে আদৌ প্রস্তুত নয়। এমন ব্যক্তি কখনো কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে সমর্থ হয় না।

পবিত্র কোরআন থেকে কোন শ্রেণীর লোক হেদায়াত লাভ করতে পারে এবং তাদেরকে কোন ধরনের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে, এ সম্পর্কে সূরা বাকারায় বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহ্ ছুব্হানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন–

ذَالِكَ الْكِتَابُ لاَرَيْبَ-فِيْهِ-هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ-

এটা আল্লাহর কিতাব, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা জীবন-যাপনের ব্যবস্থা সেই মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা বাকারা-২)

অর্থাৎ এই কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই মুত্তাকী হতে হবে। মুত্তাকী হবার শর্তপূরণ না হলে তার পক্ষে আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করা সম্ভব হবে না। মুত্তাকীদের পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ–

যারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে। আর আমি তাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে। আর যে কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং পূর্বে যেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, সেসবের প্রতি বিশ্বাস করে এবং পরকালের প্রতি তাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। (সূরা বাকারা-৩-৪)

এই আয়াতে মুত্তাকীদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। এসব গুণাবলী যাদের মধ্যে নেই, তারা আল্লাহর কিতাব থেকে পথ-নির্দেশ লাভ করতে সমর্থ হবে না। এই কিতাব থেকে পথনির্দেশনা লাভের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে বলেছেন, তার প্রথম গুণ হলো, ব্যক্তিকে অবশ্যই এই কোরআনের প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে এবং কোরআনের প্রতি আনুগত্য পরায়ণ হতে হবে। কোরআন যে জীবন বিধান দান করেছে, সেই বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়া একান্ত জরুরী।

এই পৃথিবীতে যারা একান্তই পশুর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করতে চায়, পশু-প্রাণীর মতো দায়িত্ব-কর্তব্যহীন জীবন-যাপন করতে আগ্রহী, পৃথিবী যে রঙে রঙিন, সেই রঙে রঙিন হতে চায়, নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ড–তা কল্যাণকর অথবা অকল্যাণ কর, এ সম্পর্কে গুরুত্ব দেয় না, জীবন পরিচালিত করার ক্ষেত্রে সৎ ও অসৎ পথের কোন তোয়াক্কা যারা করে না, মানুষ হিসাবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কোন চিন্তা করে না, এই পৃথিবীতে কে তাকে প্রেরণ করলো, কেন সে প্রেরিত হলো, সমস্ত সৃষ্টি কেন তার যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করছে, এসব সৃষ্টির পেছনে কোন গূঢ় রহস্য লুকায়িত রয়েছে ইত্যাদি বিষয় যাদের মন-মানসিকতাকে আলোড়িত করে না, তারা আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে পারে না।

পবিত্র কোরআনে মুত্তাকীদের অসংখ্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে সমস্ত গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করার অবকাশ নেই বিধায় আমরা এখানে এমন কতকগুলো একান্ত প্রয়োজনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করবো, যা অর্জন করতে সক্ষম না হলে আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

এই কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলে ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম পরহেযগার হতে হবে। 'পরহেয' শব্দটি উর্দু ও ফারসী ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর অর্থ হলো, 'বিরত থাকা'। আর 'পরহেযগার' শব্দের অর্থ হলো, 'যিনি বিরত থাকেন।' ইসলামী সংস্কৃতিতে

পরহেযগার তাকেই বলা হয়, যিনি আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা বৈধ করেছেন, হালাল করেছেন–তাই করেন আর যা অবৈধ ঘোষণা করেছেন, হারাম বলেছেন, তা থেকে বিরত থাকেন।

অর্থাৎ পরহযেগার ব্যক্তি হয় সচেতন। প্রতিটি পদক্ষেপে সে ব্যক্তি সত্যের এবং ন্যায়ের পথ অনুসরণ করে। কোনটি ভালো একং কোনটি মন্দ, কোনটি কল্যাণকর আর কোনটি ক্ষতিকর ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য করার মতো যোগ্যতা পরহেযগার ব্যক্তির মধ্যে থাকে। ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করার যোগ্যতা যেমন ব্যক্তির মধ্যে থাকতে হবে, তেমনি তার মধ্যে এই মানসিকতা থাকতে হবে যে, তিনি অন্যায় পথে পরিচালিত হবেন না। সত্যের অনুসন্ধান করে তিনি সেই সত্যের অনুসরণ করবেন। গোটা পৃথিবী কোন পথে পরিচালিত হচ্ছে, এ বিষয়ের প্রতি তিনি গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র সত্যের প্রতিই গুরুত্ব দিবেন। এক কথায় সত্যাশ্রয়ী মন-মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণই আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে সমর্থ হবেন এবং কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করার এটাই হলো প্রথম গুণ ও বৈশিষ্ট্য।

মুত্তাকী ব্যক্তির দ্বিতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, ব্যক্তিকে গায়েব তথা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে। আল্লাহর কোরআনে অদৃশ্য বলতে সেই সমস্ত বাস্তব সত্যকে বুঝায়, যা মানুষ তার নিজস্ব কোন শক্তির মাধ্যমে দেখতে পায় না বা তার কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই অনুভব করতে পারে না। অর্থাৎ যা মানুষের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়–অতিন্দ্রীয়, ধরা–ছোঁয়ার বাইরে, এসব শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে–গায়েবের প্রতি দৃঢ় আস্থা থাকতে হবে। স্বয়ং আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করতে হবে। তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। তিনি অসংখ্য ফেরেশ্তা সৃষ্টি করেছেন, এসব ফেরেশ্তা তাঁরই আদেশের আজ্ঞাবাহী এবং তাঁরা আল্লাহর আদেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি তাঁর ফেরেশ্তার মাধ্যমে ওহী প্রেরণ করেছেন, এসব ওহীর প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে। মানুষের ভালো-মন্দের পুরস্কার হিসাবে তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন, এসবের প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে। নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তাকদীদের প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। এ ধরনের অদৃশ্য বিষয়সমূহ যা কিছু রয়েছে, তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হতে হবে এবং এটাকেই বলা হয় গায়েবের প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান বিল গায়েব। কোন ধরনের শর্ত ব্যতিতই গায়েবের প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। মুত্তাকী ব্যক্তিগণ গায়েবের প্রতি বিশ্বাসী হন, আর যাদের গায়েবের প্রতি বিশ্বাস নেই, তারা এই কোরআন থেকে কোনভাবেই উপকার গ্রহণ করতে পারবে না বা হেদায়াত লাভ করতে সমর্থ হবে না।

মুত্তাকীদের তৃতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, ঈমান বিল গায়েবের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করে তা মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার পর সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। যে অদৃশ্য শক্তি মহান আল্লাহকে সে হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করলো এবং মৌখিকভাব স্বীকৃতি দিল, সেই আল্লাহর আইন-বিধানের প্রতি আনুগত্যের মাথা

তাকে নত করে দিতে হবে। আর আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রথম নির্দশন হলো নামাজ। ব্যক্তিকে নামাজ কায়েম করতে হবে। নামাজ হলো যাবতীয় কাজের মডেল এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি ও ন্যায়-অন্যায় বোধ জাগ্রত রাখার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

এক ব্যক্তি যদি যোহরের আজানের কিছুক্ষণ পূর্বে ইসলাম কবুল করে, তাহলে আজানের ধ্বনি তার কানে পৌছা মাত্র তার ওপরে সর্বপ্রথম ফরজ কাজ হিসাবে পালনীয় হয় নামাজ। নামাজ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, নামাজই হলো ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। অর্থাৎ যে নামাজ আদায় করলো সে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য করবে বলে প্রমাণ দিল। আর যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করলো না, সে এ কথারই প্রমাণ দিল যে, সে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য করবে না। অর্থাৎ সে কুফরীকেই পছন্দ করলো।

সুতরাং, কোরআন থেকে হেদায়াত গ্রহণ করতে হলে ব্যক্তিকে নামাজী হতে হবে এবং মুত্তাকী হওয়ার জন্য নামাজ আদায় অন্যতম শর্ত আর নামাজ আদায় বলতে যা বুঝায়–সেভাবেই নামাজ আদায় করতে হবে। অর্থাৎ নামাজ মানুষকে যা শিক্ষা দেয়, সে শিক্ষা অনুসারে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পরিচালিত করতে হবে। নামাজ আদায়ের তাগিদ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, নামাজ মানুষকে একমাত্র আল্লাহর গোলামে পরিণত করে। আল্লাহর গোলাম কাকে বলে এবং গোলামের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি, এ সম্পর্কে আমরা ইবাদাত শব্দের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুতরাং কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলে নামাজ আদায় করতে হবে এবং এই নামাজ একাকী আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমষ্টিগত পর্যায়ে আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। জামায়াত বদ্ধ নামাজের যে শিক্ষা, তা নামাজের বাইরের জীবনে অনুসরণ করতে হবে।

মুত্তাকীদের চতুর্থ গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তা তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহর পথে ব্যয় করে। মুত্তাকীদের পরিচয় দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন–

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ-اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ-الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ-وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ-

সেই পথে তীব্র গতিতে চলো, যা তোমাদের রব-এর ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গিয়েছে এবং যা সেই মুত্তাকী লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা সব সময়ই নিজেদের অর্থ-সম্পদ খরচ করে, দুরবস্থায়ই হোক আর সচ্ছল

অবস্থায়ই হোক, যারা ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্যান্য লোকদের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। এসব নেককার লোককেই আল্লাহ খুবই ভালোবাসেন। (সূরা ইমরাণ-১৩৩-১৩৪)

মুত্তাকী ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ণমনা বা কৃপণ হয় না। পৃথিবীর বুকে তারা ধন-দৌলত, অর্থ সম্পদের গোলামী করে না। মহান আল্লাহ্ তাকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, সে সম্পদ তার একার ভোগ করার জন্য এবং যেভাবে খুশী সেভাবে ভোগ করার জন্য তাকে দেয়া হয়নি, এই অনুভূতি তার মধ্যে সক্রিয় থাকে। তার এই ধন-সম্পদে অভাবী লোকদের অধিকার রয়েছে এবং সে অধিকার আদায়ে মুত্তাকী ব্যক্তি সচেতন থাকে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়, সে আন্দোলনে মুত্তাকী ব্যক্তি অকাতরে, উন্মুক্ত-অবারিত হস্তে অর্থ ব্যয় করে। অর্থ-সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে সে বৈধ-অবৈধতার সীমারেখার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে।

মুত্তাকী ব্যক্তি অভাবগ্রস্থ হলেও সামর্থানুসারে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যেমন অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তেমনি সচ্ছল অবস্থায় থাকলেও করে। অর্থাৎ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা মুত্তাকী ব্যক্তির স্বভাবে পরিণত হয়। মুত্তাকী ব্যক্তির গুণাবলী সম্পর্কে সূরা ইমরাণের উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের কথা বলতে গিয়ে এ কথাও বলা হয়েছে যে, তারা ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে। ক্রোধের পরিবর্তে তাদের চরিত্রে সৃষ্টি হয় বিনয়।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, মুত্তাকীরা হলো রাহ্মানের বান্দাহ্। আর রাহ্মানের বান্দাহ্গণ যমীনে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে। অন্যরা যদি কোন অপরাধ করে, সে অপরাধ তারা ক্ষমা করে দেয়। এসব হলো মুত্তাকী ব্যক্তিদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য এবং মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার প্রশস্ততা আকাশ ও যমীনের বিস্তৃতির সমান। আল্লাহ্ তা'য়ালা এই মুত্তাকী ব্যক্তিদের অত্যন্ত ভালোবাসেন। সুতরাং চরিত্রে এসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে হবে, তাহলে আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করা যাবে।

রাব্বুল আলামীনের কিতাব থেকে হেদায়াত লাভের পঞ্চম শর্ত হলো, কোরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বে আল্লাহ বিভিন্ন নবী-রাসূলদের প্রতি যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, ইতোপূর্বেও তিনি মানুষের জন্য হেদায়াত অবতীর্ণ করেছিলেন। মহান আল্লাহ্ বলেন–

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ–مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ–

তিনি তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এটা সত্যের বাণী নিয়ে এসেছে এবং পূর্বের সমস্ত কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করছে। ইতোপূর্বে তিনি মানুষের হেদায়াতের ও

জীবন ব্যবস্থা হিসাবে তওরাত ও ইনজীল অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনি মানদন্ড অবতীর্ণ করেছেন হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশকারী। (সূর ইমরাণ-২-৪)

অর্থাৎ মানুষের হেদায়াতের জন্য ইতিপূর্বে যেসব কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল, আল্লাহর এই কোরআন সেসব কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করছে। এই ঘোষণা এই অর্থে যে, তা ছিল আল্লাহর বাণী–স্বয়ং আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। আল্লাহর এই ঘোষণার অর্থ এটা নয় যে, বর্তমানে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের কাছে যেসব কিতাব রয়েছে, তা তারা আল্লাহর বাণী হিসাবে দাবি করছে এবং কোরআনও তাদের দাবির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে–বিষয়টি এমন নয়।

বরং এসব জাতি আল্লাহর কিতাবের বিকৃতি সাধন করেছে, পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে। এসব কিতাব যে বিকৃত করা হয়েছে, তার ভেতরে অসংখ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে, এর প্রমাণ স্বয়ং সেসব কিতাবই দিচ্ছে। আল্লাহর বাণী এবং মানুষের বাণীর মধ্যে প্রতিটি দিক থেকে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিরাজমান। বর্তমানে যে বাইবেল রয়েছে, তার ভাব ও ভাষা, বর্ণনা ভঙ্গী, উপস্থাপনা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি দিলেই স্পষ্ট অনুভব করা যায়, এসব কিতাব কিভাবে এবং কত দূর পর্যন্ত বিকৃত করা হয়েছে। নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে এসব কিতাবে কিভাবে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। তারা যেসব কথা আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করে থাকে, কোরআন যখন অবতীর্ণ হয়েছে–তখনই তাদের মনগড়া কথার তীব্র প্রতিবাদ করেছে। সুতরাং, কোরআন পূর্বে অবতীর্ণকৃত যেসব কিতাবের প্রতি মানুষকে ঈমান আনতে বলে, সেসব কিতাব অবিকৃত অবস্থায় পৃথিবীতে নেই।

সূরা বনী ইসরাঈলের ৫৫ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'আমিই দায়ুদকে যাবুর দিয়েছি।' এই যাবুর কিতাব সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ–اِنَّ فِىْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ–

আর যাবুর কিতাবে নসীহতের পর আমি লিখে দিয়েছি যে, যমীনের উত্তরাধীকারী আমার সৎ বান্দারা হবে। এতে এক মহাসংবাদ নিহিত রয়েছে আবিদ বান্দাদের জন্য। (সূরা আম্বিয়া)

অর্থাৎ কোরআন যেমন ঘোষণা করছে, যারা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব, বন্দেগী, গোলামী, পূজা-উপাসনা, আনুগত্য-ইবাদাত করবে, তারাই এই পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হবে, তেমনি এসব বিষয় পূর্বের কিতাবসমূহেও উল্লেখ ছিল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের প্রতি যেসব সহীফা ও কিতাব যেমন হযরত দায়ুদ (আঃ) এর প্রতি যাবুর, হযত মুছা (আঃ) এর প্রতি তওরাত এবং হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের প্রতি ইনজিল কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, এসবের প্রতি এ ধরনের

বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, এসব কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকেই মানুষের হেদায়াতের জন্য আগমন করেছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং যুগে প্রয়োজন অনুসারে ওহীর মাধ্যমে কোরআনের পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করতে হবে। মানব মন্ডলীর জন্য আল্লাহর কাছ থেকে কোন জীবন ব্যবস্থা বা বিধান অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা যারা অস্বীকার করে, নিজেরা কোন মতবাদ-মতাদর্শ রচনা করে তা আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয় অথবা আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিতাবে কিছুটা বিশ্বাস রাখে এবং সেই সাথে এ কথা বলে যে, 'আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে কিতাবকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকৃতি দিতেন, আমরা সেসব কিতাবকেই শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি' এ ধরনের কোন মানুষ কোরআন থেকে কখনো হেদায়াত লাভ করতে পারে না।

যেসব মানুষ নিজেদেরকে আল্লাহর বিধানের মুখাপেক্ষী মনে করে এ কথাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর বিধান ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিটি মানুষের কাছে অবতীর্ণ হয় না এবং এটা আল্লাহর নিয়ম নয়–বরং নবী-রাসূলদের ওপরেই তা অবতীর্ণ হয় ও তাঁদের মাধ্যমেই গোটা মানব জাতির কাছে তা পৌছে থাকে–আর এটাই আল্লাহর নিয়ম। এই বিশ্বাস যাদের আছে, তারাই কেবল কোরআন থেকে হেদায়াত লাভে সক্ষম হবে। সুতরাং মুত্তাকীদের এটাও একটি গুণ যে, তারা পূর্বে অবতীর্ণ করা কিতাবের প্রতি এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনের পূর্বেও মানব জাতির হেদায়াতের লক্ষ্যে কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন।

মুত্তাকীগণ আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং মুত্তাকী হওয়ার জন্য এটা ষষ্ঠ শর্ত। মানুষ এই পৃথিবীতে কোন দায়িত্বহীন জীব নয় এবং সে মনিবহীন কোন সত্তাও নয়। তাঁর একজন ইলাহ, মা'বুদ ও রব আছেন। সেই রব-এর নির্দেশ অনুসারেই তাকে এই পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করতে হয়। এই পৃথিবীতে সে যা কিছুই করবে, তার প্রতিটি কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব তাকে মহান আল্লাহর কাছে দিতে হবে। কারণ এই পৃথিবীই একমাত্র জগৎ নয়–বরং ইন্তেকালের পরে আরেকটি জগৎ বিদ্যমান।

বর্তমানের এই পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়, এটা সৃষ্টি হয়েছে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য। একদিন এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান এই জগতটি নিমিষে মহান আল্লাহর আদেশে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সমস্ত কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটবে। কোনদিন এবং কখন এ পৃথিবী ধ্বংস হবে, সে সংবাদ একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত আর কারো জানা নেই।

এই পৃথিবীর পরিসমাপ্তি ঘটার পরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরেকটি নতুন জগৎ সৃষ্টি করবেন, সে জগতের নাম আখিরাত। সেখানে পৃথিবীতে মানব আগমনের দিন থেকে শুরু করে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত যত সংখ্যক মানুষের আগমন ঘটেছিল, সমস্ত মানুষকে একই সময়ে পুনরায় সৃষ্টি করে একত্রিত করবেন। পৃথিবীতে এসব মানুষ যা কিছু করেছে, তার হিসাব তিনি গ্রহণ করবেন। সৎকাজ যারা করেছিল তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন

এবং অসৎকাজ যারা করেছিল, তাদের শাস্তির বিধান করবেন। এভাবে সমস্ত মানুষের কর্মের প্রতিফল সেদিন দেয়া হবে। মানুষ তার কর্মফল অনুসারে কেউ জান্নাত লাভ করবে আবার কেউ ভয়াবহ শাস্তির স্থান জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে।

এই পৃথিবীতে যারা সম্মান-মর্যাদা লাভ করেছে, বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছে, অগাধ ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে, প্রভূত শিক্ষা অর্জন করেছে, দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ লাভ করেছে অথবা সরকারী কোন সম্মানজনক পদে আসীন হয়েছে, দেশের কোন শিল্প-কারখানার সত্বাধিকারী হয়েছে, বিশ্বব্যাপী বড় ব্যবসায়ী-শিল্পপতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে, সাধারণ মানুষ এই অবস্থাকেই জীবনে সফলতা অর্জন করেছে বলে ধারণা করে। আর কোন মানুষ যদি উল্লেখিত কোন কিছুরই সুযোগ লাভ না করে, পৃথিবীতে সে চরম অভাবের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করে, এক কথায় কোন প্রাপ্তিই যদি এই পৃথিবীতে না ঘটে, তাহলে মানুষ সেই ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করে, লোকটি জীবনে কোন সফলতাই অর্জন করতে পারলো না।

প্রকৃত পক্ষে বর্তমান পৃথিবীতে সচ্ছলতা এবং অসচ্ছলতা মানুষের জীবনে সফলতা অর্জনের কোন মাপকাঠি নয়। মানব জীবনের প্রকৃত সফলতা হলো আখিরাতের ময়দানে আল্লাহর বিচারালয়ে যে ব্যক্তি সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে, সে ব্যক্তিই প্রকৃত সফলতা অর্জন করেছে বলে বিবেচিত হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিচারালয়ে গ্রেফতার হয়ে শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে, সেই ব্যক্তির গোটা জীবনই ব্যর্থ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ প্রকৃত জয়-পরাজয় ও সফলতা-ব্যর্থতা নিরূপণ হবে আখিরাতের ময়দানে।

মুত্তাকীগণ উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী এবং এসব বিষয়ের প্রতি যাদের বিশ্বাস রয়েছে, তারাই কেবল আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম। মুখে মুখে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, কোরআনের প্রতি বিশ্বাস, নবীদের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে বলে দাবি করলেই হেদায়াত লাভ করা যাবে না। বরং এসব বিশ্বাসের সমন্বয়ে চরিত্র সৃষ্টি করে ব্যক্তিকে মুত্তাকী বা পরহেযগার হতে হবে। এসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি অবশ্যই এই কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করবে।

আর যাদের চরিত্রে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত রয়েছে, তারা কোরআন থেকে হেদায়াত পাবে না। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করতে হলে ডাক্তারকে নিজের চিকিৎসক বলে স্বীকৃতি দিয়ে তার ব্যবস্থাপত্র অনুসারে চলতে হবে, তাহলে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যাবে।

তেমনি কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলে এটাকে আল্লাহর বাণী বলে স্বীকৃতি দিয়ে এর প্রতি ঈমান এনে আনুগত্য করতে হবে, আর আনুগত্যের প্রথম নিদর্শন হলো নামাজ আদায় এবং যাকাত ফরজ হলে তা আদায় করতে হবে। তারপর আনুগত্য পরায়ণ মন-মানসিকতা নিয়ে হেদায়াত লাভের জন্য কোরআনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। তখন

এ কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করা যাবে এবং ঈমান বৃদ্ধি লাভ করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ–

যারা ঈমান এনেছে, প্রত্যেক অবতীর্ণ সূরাই তাদের ঈমান সত্যই বৃদ্ধি করে দেয়। আর তারা এ কারণে খুবই আনন্দিত হয়। (সূরা তওবা-১২৪)

আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই মুত্তাকী হতে হবে। মুত্তাকীদের অনেকগুলো গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّكِعُوْنَ السَّجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ–

আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁর বন্দেগী পালনকারী, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য জমীনে পরিভ্রমণকারী, তাঁর সম্মুখে রুকু ও সিজদায় অবনত, ভালো কাজের আদেশদানকারী, খারাপ কাজে বাধাদানকারী এবং আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা রক্ষাকারী। (সূরা তওবা-১১২)

এই আয়াতে মুমিন-মুত্তাকী লোকদের চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। মুমিন-মুত্তাকী লোকগন মানব জাতির বাইরের কোন সৃষ্টি নয়–তারাও মানুষ, মানবীয় দুর্বলতা তাদের মধ্যেও বিদ্যমান। এই মানবিয় দুর্বলতার কারণে তাদের দ্বারা যখনই আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ সংঘটিত হয়, তৎক্ষণাত তারা আল্লাহর কথা স্মরণ করে তাঁর কাছে তওবা করতে থাকে। তারা একবার মাত্র তওবা করে না, বরং বারবার তওবা করে।

এ জন্যই বলা হয়েছে, তারা বারবার আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এরা আল্লাহর বন্দেগী, ইবাদাত তথা তাঁর আইন-বিধান অনুসরণকারী। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা আল্লাহর প্রশংসা করে। আল্লাহ তাকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, সে অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থেকে তারা আল্লাহর প্রশংসা করে থাকে। অভাব দরজায় এসে মুখ ব্যদন করে দাঁড়ালেও তারা কোন অভিযোগ করে না বরং আল্লাহরই প্রশংসা করে। আল্লাহর কাছে অভাব থেকে মুক্তি চায়। সচ্ছলতা এলেও তারা অতিমাত্রায় উচ্ছসিত না হয়ে আল্লাহর প্রশংসা করে।

মুমিন-মুত্তাকীগণ পৃথিবীতে ভ্রমণ করলেও তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ভ্রমণ করে। নিছক আনন্দ লাভের জন্য তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না অথবা কোন পীর-ওলীর মাজারে গিয়ে সাহায্য লাভের আশাতে ভ্রমণে বের হয় না। তারা একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করে। মুমিন-মুত্তাকী লোকগণ পবিত্র ও উন্নত ধরনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে

পৃথিবীতে ভ্রমণ করে এবং তাদের ভ্রমণের লক্ষ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এ কারণে তাদের ভ্রমণও আল্লাহর ইবাদাত হিসাবেই পরিগণিত হয়।

তারা ভ্রমণ করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদ করার জন্য, ইসলামের শত্রু অধ্যুষিত এলাকা থেকে হিজরাত করার জন্য, কোরআনের আদর্শ প্রচার ও প্রসারে লক্ষ্যে, মানুষের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে, ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্য, এই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে প্রস্ফুটিত আল্লাহর নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা যে রিয্ক দান করেছেন, তা অন্বেষণের জন্য।

মুত্তাকী-মুমিনগণ একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায় করেন প্রকাশ্যে ও গোপনে। নামাজের প্রতি তারা অবহেলা প্রদর্শন করেন না বা তাড়াহুড়া করে নামাজ আদায় করেন না। ধীর স্থিরভাবে নামাজ আদায় করেন। গভীর রাতে নির্জনে নিভৃতে তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে রুকু ও সেজদায় অবনত থাকেন।

এরা সৎকাজের তথা আল্লাহর বিধানের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানান। ক্ষমতা অনুযায়ী তারা মানব সমাজে সৎকাজের আদেশ দিয়ে থাকেন এবং অসৎকাজের প্রতি বাধা দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ যে জীবন বিধান দান করেছেন, সে বিধানের প্রতি সজাগ থেকে তারা জীবন পরিচালিত করে। নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কর্মকে আল্লাহর দেয়া সীমার মধ্যে সীমিত রাখে। এই সীমা অতিক্রম করে তারা স্বেচ্ছাচারিতা করে না। আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজের মনগড়া আইনের বা কোন মানুষের বানানো বিধানের অনুসরণ করে না।

আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা চেষ্টা-সাধনাকারী। আল্লাহর বিধান যারা লংঘন করে, এরা তাদের গতিরোধকারী। আল্লাহর বিধান বা নির্ধারিত সীমা রেখাকে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর রাখার ব্যাপারে তারা অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালনকারী। এই ধরনের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিগণই মুত্তাকী এবং এরাই কেবলমাত্র আল্লাহর নাজিল করা কিতাব থেকে হেদায়াত লাভ করতে পারে। যারা শুধুমাত্র ধার্মিক হিসাবে পরিচিতি লাভের আশায় বা নিছক ধর্ম পালনের জন্য নামাজ, রোজা, হজ্জ আদায় করে, অভাবী লোকজন একত্রিত করে যাকাত দানের প্রদর্শনী করে, নামাজের সময়টুকু ব্যতীত দিন ও রাতের অবশিষ্ট সময় মানুষের বানানো আদর্শ অনুসরণ করে, আল্লাহর কোরআনের হেদায়াত তাদের নছীবে হয় না।

আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করার জন্য যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করার কথা বলা হয়েছে, তা অর্জন করে যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে পারবে, তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন-

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ-وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

বস্তুত এই ধরনের লোকজনই তাদের রব-এর কাছ থেকে অবতীর্ণ জীবন ব্যবস্থার অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ লাভের অধিকারী। (সূরা বাকারা-৫)

মহাগ্রন্থ আল কোরআন গবেষণা করার মতো সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا–

তারা কি মনোযোগ সহকারে কোরআন নিয়ে চিন্তা- ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরগুলো তালা লাগানো রয়েছে? (আল কোরআন)

উপসংহারে আমরা বলতে চাই, কয়েক বছর পূর্বে একজন আরব মুসলিম স্কলার ডক্টর তারেক আল সুয়াইদান মহাগ্রন্থ আল কোরআনে ব্যবহৃত কতকগুলো শব্দের ওপর গবেষণা করে বিস্ময়কর পরিসংখ্যানগত উপাত্ত (Statistical Data) লাভ করেছেন : যা তিনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর গবেষণা লব্ধ বিষয়গুলো আমরা নিম্নে তুলে ধরছি। সমগ্র কোরআন মাজীদে–

الدنيا। 'ইহজগত' তথা দুনিয়া শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ১১৫ বার।

الاخرة। 'পরজগত' তথা আখিরাত শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ১১৫ বার।

الملئكة। 'মালায়িকা তথা ফিরিশতাগণ শব্দটি এসেছে ৮৮ বার।

الشيطان। 'শয়তান' শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ৮৮ বার।

الحياة। 'হায়াত' বা জীবন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ১৪৫ বার।

الموت। 'আল মাউত' বা মৃত্যু শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ১৪৫।

النفع। 'আন নাফ্'উ' বা উপকারী শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ৫০ বার।

الفساد। 'আল ফাসাদ' বা ক্ষতিকর শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে ৫০।

الناس। 'নাস' বা জনগণ শব্দটি এসেছে ৩৬৮ বার।

الرّسول। 'রাসূল' বা রাসূলগণ শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ৩৬৮।

الزكوة। 'যাকাত' শব্দটি এসেছে ৩২ বার।

البركة। 'বরকত' শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ৩২।

اللسان। 'আল লিছান' বা জিহ্বা শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ২৫ বার।

الموعظة। 'আল মাও'ইযাত' তথা উত্তম বাক্য শব্দটিও এসেছে ২৫।

الرجل।'আর রাজুল' বা পুরুষ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ২৪ বার।

المرأة। 'আল মারাআত' তথা নারী শব্দটিও এসেছে ২৪ বার।

الشهر। 'আশ্ শাহ্র' তথা মাস শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে ১২ বার।

اليوم। 'আল ইয়াওম' তথা দিন শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ৩৬৫ বার।

الامر। 'আল আমর' বা আদেশ শব্দটি এসেছে ১,০০০ বার।

النهى। 'আন্ নাহি' বা নিষেধ শব্দটিও এসেছে ১,০০০ বার।

الحلال। 'হালাল' বা বৈধ শব্দটি এসেছে ২৫০ বার।

حرام 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ২৫০ বার।

جنّت 'জান্নাত' দেয়া হবে এমন প্রতিশ্রুতিমূলক কথা এসেছে ১,০০০ বার।

جهنّم 'জাহান্নাম' সম্পর্কিত ভীতি প্রদর্শনমূলক কথাও এসেছে ১,০০০ বার।

সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে রহস্যময় গাণিতিক সুত্রে গ্রথিত এমন বিস্ময়কর কিতাব সমগ্র বিশ্বে আর একটিও নেই। মহান আল্লাহ কোরআনের বর্ণনা সম্পর্কে বলেন–

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا–

এরা কি কোরআন (ও তার সুত্র নিয়ে চিন্তা) গবেষণা করেনা? এ গ্রন্থটি যদি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে তাতে অবশ্যই তারা অনেক গড়মিল দেখতে পেতো। (সূরা আননিসা-৮২)

কোরআন বিশাল এক মু'জিজাহ্, এর বিস্ময়কারিতার কোনো শেষ নেই, এর ব্যাখ্যারও কোনো শেষ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا–

(হে নবী) আপনি (এদের) বলুন, আমার মালিকের (প্রশংসার) কথাগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্যে যদি সমুদ্র কালি হয়ে যায়, তাহলে আমার মালিকের জ্ঞানের কথা (লেখা) শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র শুকিয়ে যাবে, এমনকি যদি আমি তার মতো (আরো) সমুদ্রকে (লেখার কালি করে) সাহায্য করার জন্যে নিয়ে আসি (তবুও)। (সূরা কাহ্ফ- ১০৯)

اِنَّه لَقَوْلٌ فَصْلٌ، وَّ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ-

অবশ্যই এ (কোরআন) হচ্ছে (সত্য-মিথ্যার) পার্থক্যকারী (চূড়ান্ত কথা, তা অর্থহীন (কোনো কথাবার্তা) নয়। (সূরা তারিক- ১৩-১৪)

আরবী শব্দের যথার্থ অর্থ এবং একটি শব্দের অনেকগুলো অর্থ এবং যথার্থ স্থানে এর প্রয়োগ- জ্ঞানের অভাবজনিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পৃথিবীতে পবিত্র কোরআনের যে অনুবাদসমূহ হয়েছে, তা মাতৃভাষায় পাঠ করে অনেকেই ভ্রান্তির শিকার হন। এ কারণে কোরআনকে যথার্থ অর্থে বুঝতে হলে অবশ্যই আরবী ভাষায় পারদর্শী হতে হবে অথবা যিনি পারদর্শী তার সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। অথবা যথার্থ অনুবাদ এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে। তবে এ বিষয়টি মাথায় রেখে কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে যে, এ কোরআন কোনো বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। এটি হিদায়াতের গ্রন্থ, মানব জাতির জীবন বিধান এবং মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের বর্ণনা সম্বলিত কিতাব।

কোরআন আল্লাহর বাণী কিনা এ বিষয়ে যারা সন্দেহ পোষন করেন, তাদেরকে অনুরোধ করবো আধুনিক বিজ্ঞানের পাশাপাশি পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করুন অথবা কোরআন ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্বলিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করুন। তবে এ বিষয়টি স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে, কোরআনের সত্যতা বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই করতে যাবার মতো বোকামী যেনো কেউ না করেন। বরং বিজ্ঞানের সত্যতাকে অবশ্যই কোরআন দিয়ে যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান যা কিছু বলছে, তা অন্ধের মতো বিশ্বাস করা যাবে না।

কিছু সংখ্যক মানুষ বিজ্ঞানের থিউরীর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখেন এবং বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে আলেম-ওলামাদের ঘায়েল করার ঘৃণ্য মানসিকতা পোষণ করেন। তাদের জ্ঞান দৃষ্টি উন্মোচন করার লক্ষ্যেই আমি আমার লেখা '**পবিত্র কোরআনের মু'জিজা**' বা **The Scientific Miracles in the Holy Qur'an** নামক গ্রন্থে কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞানের সামান্য কয়েকটি দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আমার আলোচনায় ভুল-ভ্রান্তি থাকতেই পারে, কারো দৃষ্টিতে তেমন ভুল ধরা পড়লে তার সঠিক তথ্য আমাকে জানাতে অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ। উক্ত গ্রন্থে আমার আলোচনায় একজন মানুষও যদি আল কোরআনের পথ অনুসরণের তাগিদ অনুভব করে, তাহলে এটা হবে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য এক অতুলনীয় পুরস্কার। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করুন- আমীন।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী